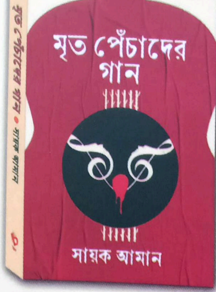
মৃত পেঁচাদের গান







সায়ক আমান



এই মুহূর্তে আপনার হাতে ধরা আছে 'মৃত প্যাঁচাদের গান'। হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে আপনি ভাবছেন বইটা নেবেন কিনা, কিংবা পড়বেন কিনা। কী আছে এই বইতে? আসুন দেখে নিই। আপনার জীবনের মতোই, এই বইতেও রয়েছে গল্প। সে গল্প কখনো আপনাকে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কোনো প্রাচীন মন্দিরে চাপা পড়ে থাকা অভিশাপের মুখোমুখি। কখনো হয়তো আপনার দেখা হয়ে যাবে কপিলাবস্তুর সেই বিপথগামী রাজপুত্রের সঙ্গে। কখনো বা কিউপিডের তীর হয়ে আক্রমণ করে বসবে আপনাকে। হঠাৎ আপনি আবিষ্কার করতে পারেন, মানুষ নয়, প্রাণী নয়, জীবন নয় আপনার সমস্ত ভালোবাসা কেবল একটি ধারণাকে লক্ষ্য করে।

সারারাত জেগে জেগে, কী যেন ছিল, সে আর নেই ভেবে কাটানোর পর, ভোরের প্রথম আলো ফোটার মুহূর্তে এই বই হাতে নিয়ে আপনি বসতেই পারেন। যা হারিয়েছেন তা হয়তো পাবেন না, তবে বলা কী যায় হয়তো নিজেকেই খুঁজে পেয়ে যাবেন কোনো অসতর্ক মুহূর্তে।

এইটুকু হিসেবই চিরায়ত হয়ে থাকুক 'মৃত প্যাঁচাদের গান'-এ।

মৃত পেঁচাদের গান

সায়ক আমান

দীপ প্রকাশন

২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

দীপ

MRITO PENCHADER GAN

by Sayak Amon

ISBN 978-81-19068-964-8

Phone 033-2241-2538 ◆ 98310 52249

website www.deepprakashan.com

email deepprakashan@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২৩

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

প্রকাশক শংকর মণ্ডল
২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক কল্পনা অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০ ০১৫

মূল্য ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

কালীমন্দিরের যখ

(এক)

সন্ধে একটু গাঢ় হতেই পুরনো কালীমন্দিরের সামনের ভাঙা চাতালে লোক জড়ো হতে শুরু করেছিল, এখন চাতাল থেকে একটু দূরে জনা পঁচিশেকের একটা ভিড় তৈরি হয়েছে। আনন্দের উপর দায়িত্ব পড়েছে তাদের সামলানোর। থেকে থেকে তার ধমক কানে আসছে।

আজ সকালে মন্দিরের চারপাশ থেকে ঘাস কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে জায়গাটা। তারপর থেকেই গ্রামের লোকজন কাউকে আসতে দেওয়া হয়নি কাছাকাছি। মন্দিরের বিরাট দরজা থেকে মিটারদুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে পুরোহিত শ্যামাপদ চক্রবর্তী, সুবর্ণ লাহিড়ী আর দশাসই চেহারার ভবেন। ভবেনের হাতে একটা সার্কুলার স। এই যন্ত্রটা দিয়ে একটু পরেই দরজার লোহার সিল কাটা হবে।

'পঞ্চাশ বছর খোলা হয়নি দরজাটা, তাই না?' পাশে দাঁড়ানো কলির কাঁধে একটা হাত রেখে বলে পায়েল।

'যতদূর শুনেছি শেষ খোলা হয়েছিল সিক্সটি ফাইভে, মানে দাঁড়াচ্ছে চুয়ান্ন বছর।' ল্যাঙ বাড়িয়ে মন্দিরের দরজার দিকে তাকায় কলি।

'তোর কী মনে হয়, ভিতরে কী আছে?'

'অশ্বডিম্ব আছে, সামান্য একটু গোলমরিচ আর নুন দিয়ে জমে যাবে।'

'এই দুশো বছরে যখ অশ্বডিম্ব ফেলে রাখেনি তোর জন্য।' পায়েলের মুখে হাসি খেলে যায়।

'তুই ওইটা বিশ্বাস করছিস! যখের ব্যাপারটা?'

পায়েল আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় চাতাল ছাড়িয়ে উদগ্রীব হয়ে থাকা জনতার দিকে এগিয়ে আসেন সুবর্ণ লাহিড়ী, একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলেন, 'আপনারা আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছেন এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। তবে এ কথাও ঠিক যে ঘটনা আপনারা দেখতে চলেছেন তা দেখার সৌভাগ্য হওয়াটাও বড় কম কথা নয়...'

আর একটু জনতার মাঝে ঢুকে এসে আবার বলতে থাকেন তিনি, 'আপনারা জানেন এই কালীমন্দির কেবল নামেই মন্দির। এর ভিতরে কোনও বিগ্রহ নেই। কথিত আছে, আজ থেকে দুশো বছর আগে এ বাড়ির মালিক, অর্থাৎ সুবীর চৌধুরীর পূর্বপুরুষ জমিদার মাধবচন্দ্র মারা যাবার আগে তার সমস্ত সম্পত্তি এই মন্দিরের ভিতরে গচ্ছিত রেখে মন্দিরটি সিল করে দেন।

সেকালের বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রামেরই একটি বছর পনেরোর ছেলেকে তুলে এনে তাকে জীবন্ত এই মন্দিরের ভিতরে ধনসম্পত্তির সঙ্গেই আটকে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এইভাবে বদ্ধ ঘরে মৃত্যুর পর ছেলেটি যক্ষ হয়ে ওই ধনসম্পত্তির দেখভাল করবে। গুজব রটে ছেলেটি নাকি ছিল সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার।

তারপর দেড়শো বছর ধরে মন্দিরটি তার সমস্ত লুকানো সম্পত্তি নিয়ে এভাবেই পড়েছিল। পঞ্চাশ বছর আগে চৌধুরীদের জমিদারি ক্রমশ অর্থাভাবে শেষ হয়ে আসতে থাকে। উপায়ন্তর না দেখে তারা দেড়শো বছর ধরে বন্ধ থাকা মন্দিরটি সম্পত্তি উদ্ধারের আশায় খুলতে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মন্দিরের ভিতরে কিছুই পাওয়া যায় না। সম্ভবত গ্রামের মানুষের চোখে জমিদারির গুরুত্ব অটুট রাখতে এই অলৌকিক গিমিকটি রচনা করে গেছিলেন মাধবচন্দ্র। কিন্তু মন্দির খোলার পর থেকেই গ্রামে অদ্ভুত এক রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ায় সে সময়ে আবার যাগযজ্ঞ করে লোহার সিল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দিরটি।

এক সপ্তাহ আগে, একদিন রাতে মন্দিরের দিক থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ কানে আসে আমাদের চৌধুরী বাড়ির কিছু সদস্যের। প্রথমে আমরা গুরুত্ব

দিইনি, কিন্তু সকালে উঠে ভবেন আবিষ্কার করে যে মন্দিরের ঠিক বাইরে পড়ে আছে একটা মরা বিড়ালের দেহ। দেখে মনে হয় যেন তার সমস্ত শরীর থেকে রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই মন্দিরের দিক থেকে একটি মানবশিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে, অগত্যা আমরা পঞ্চাশ বছর ধরে বন্ধ হয়ে থাকা এই ঘরটি খোলার সিদ্ধান্ত নিই... আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এর সিল কেটে দরজা খুলে ফেলব আমরা...'

'তোরা এভাবে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিস কেন? সামনে গিয়ে দাঁড়া।' পিছনে তাকিয়ে বাবাকে দেখতে পায় কলি। তাকে দেখতে পেয়ে আনন্দ এগিয়ে আসে, 'এই তো সুবীরদা এসে গেছেন, ভবেন, শুরু করো।'

বনবন করে একটা যান্ত্রিক শব্দ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। চারটে হ্যারিকেন আর দুটো টর্চের আলোয় ভরে উঠেছে মন্দিরের দরজার সামনেটা। দরজাটা অন্তত দেড়মিটার চওড়া। লম্বায় সাত ফুট।

এবার তার দুটো পাল্লার মাঝে সিলের উপরে গিয়ে বসছে সার্কুলার স। কাটতে থাকা লোহার শব্দে ভরে উঠেছে জায়গাটা।

কলির কাঁধে একটা হাত রাখে পায়েল, 'দুশো বছর পরে যখের আবার কান্নাকাটির ধুম পড়ল কেন বলতো?'

'যখ না হাতি, পাড়ার ছেলে-ছোকরারা মাজাকি নিচ্ছে আর আমার বাপ-কাকারাও জুজু দেখছে... সুপারস্টিশান এদের মিডল নেম....'

'It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out' বিড়বিড় করে পায়েল।

'সেটা কী?'

'বাইবেল। আয় আমার সঙ্গে...!'

পায়েল আর কলি এগিয়ে যায় মন্দিরের দিকে। দরজা থেকে মিটার দশেক দুরে জনাকুড়ি উৎসুক জনতা উদগ্রীব চোখে তাকিয়ে আছে দরজার সিলের দিকে। মন্দিরের ভিতরে কিছুই নেই সবার জানা, অথচ চোখ ফেরাতে পারছে না কেউ। দরজার সামনে দাঁড়ানো চারটে মানুষের চোখও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিলের দিকে। এই পঞ্চাশ বছরে একবারও খোলা হয়নি ওটা।

কান ফাটানো একটা শব্দ করে খুলে পড়ে কেটে যাওয়া প্রায় দু'ইঞ্চি মোটা ধাতব পাতটা। চাতালে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে মানুষই এক পা পিছিয়ে আসে।

ভবেন দু'হাতে ঠেলা দেয় দরজার দুটো পাল্লায়। পঞ্চাশ বছরের ঘুম ভেঙে সুদীর্ঘ একটা শব্দ করে খুলে যায় দরজাটা। ভিতরের প্রাচীন অন্ধকারের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়। ওপাশে কিছুই দেখা যায় না।

'টর্চটা...' পেছন ফিরে আনন্দের দিকে টর্চ চাইলেন সুবীর চৌধুরী, 'তোমার কাছেই তো ছিল টর্চটা!'

আনন্দ থতমত খায়, 'আমি কার হাতে যেন দিলাম...'

ভিড়ের মধ্যে খোঁজাখুঁজি পড়ল। মিনিট খানেকের মধ্যে টর্চ হাজির হল সুবীর চৌধুরীর হাতে।

'এখুনি ঢুকবেন না, ভিতরের হাওয়াটা বেরিয়ে যাক আগে।' ভিড়ের মধ্যে থেকে নির্দেশ ভেসে আসে।

পায়েল আর কলি চাতালের একেবারে ধার অবধি এগিয়ে আসে। পঁচিশজন মানুষ মিনিট তিনেক নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। পুরোহিত শ্যামাপদ কিছু একটা মন্ত্র জপছিলেন এতক্ষণ। এবার মন্ত্র থামিয়ে একপা একপা করে এগিয়ে যান তিনি। তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ লাহিড়ী, সুবীর চৌধুরী, আর ভবেন।

পায়েল আর কলি এগিয়ে এসেছে দরজার কাছাকাছি। উঁকি মেরে ভিতরে কিছুটা সিমেন্টের মেঝে ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না তারা। আচমকা একটা সম্মিলিত চিৎকার ভেসে আসে ভিতর থেকে। পরক্ষণেই লাহিড়ীর গলা শোনা যায়, 'ডাক্তার, একবার এদিকে এসো ডাক্তার...'

লাহিড়ীর গলার স্বরে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে ডাক্তার উপল দেবনাথ ছুটে যান দরজার ভিতরে, সেই সঙ্গে জনতার একাংশ। পায়েল দৌড়ে ভিতরে ঢুকে আসে।

অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে মাটির উপরে পড়ে আছে একটা বছর পনেরোর বাচ্চা ছেলে, তার গলার নলিটা উপড়ানো। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত মুখ আর মেঝে। পায়েল মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আতঙ্কে চোখ বন্ধ হয়ে যায় তার।

'অন্তত কয়েকঘণ্টা আগে মারা গেছে।' দেহটা পরীক্ষা করে বলেন ডাক্তার উপল দেবনাথ।

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?' চিৎকার করে ওঠেন সুবর্ণ লাহিড়ী।

একটু আগের মন্ত্রটা আবার পড়তে শুরু করেছেন শ্যামাপদ। কলি ভয়ার্ত চোখে তাকায় পায়েলের দিকে, 'মন্দিরটাতো পঞ্চাশ বছর খোলা হয়নি। তাহলে এই ছেলেটা এখানে...'

মনে মনে অস্ফুটে কিছু একটা বলছে পায়েল, কলি কান পেতে শুনতে পায়, 'It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out...'

(দুই)

'ছেলেটাকে আইডেন্টিফাই করা যায়নি?' সুবীর চৌধুরী আরামকেদারায় পিঠ রেখে চিন্তায় ডুবে ছিলেন। এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'না। আমরা চেষ্টা করছি, খোঁজখবর চলছে। মিনহোয়াইল....'

চৌধুরীবাড়ির দোতলায় ঘের বারান্দায় জমা হয়েছে জনাদশেক লোক। পুলিশ বাড়ির সবাইকেই জেরা করেছে এতক্ষণে। ইন্সপেক্টর গোস্বামী কাল সারারাত দলবল নিয়ে মন্দিরের চারপাশটা চষে ফেলেছেন। তার মুখচোখ অবসন্ন। দেখে বোঝা যায় এ ধাঁধার উত্তর খুঁজে পাওয়া দূরের কথা, মনে মনে আরও গুলিয়ে গেছে সবটা। নিজের বুক পকেটে রাখা খুদে ভয়েজ রেকর্ডারটা দেখে নেন তিনি, ঠান্ডা মাথায় ভাবতে গেলে জিনিসটা কাজে লাগে।

সামনের রেলিংয়ে রাখা জলের গ্লাস থেকে কিছুটা জল গলায় ঢেলে তিনি বললেন, 'দেখুন খুন যখন হয়েছে তখন খুনিও একজন আছে। এবং একথাও স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে প্রায় অসম্ভব একটা খুন করে আমাদের তাক লাগিয়েছে দিয়েছে সে, ভালো কথা....'

একটু দূরে বসা সুবর্ণ লাহিড়ীর দিকে তাকান ইন্সপেক্টর, 'কাল সন্ধ্যায় ঠিক ক'টা নাগাদ আপনারা দরজাটা খোলেন?'

'সন্ধে সাড়ে আটটা।'

'সন্ধেবেলা কেন? মানে এসব কাজ দিনের বেলায় তো ভালো হয়।'

'সময়টা পাঁজি দেখে শ্যামাদাই বলেছিলেন। অথচ দেখুন কী ঘটে গেল।'

'শ্যামাদা?' ভুরু কোঁচকান গোস্বামী।

'আমাদের কুলপুরোহিত। সকাল থেকে পুজোআচ্চা নিয়ে আছেন, উঠতে চাইছেন না। ওঁর মতে এটা খুন নয়, অপদেবতার রোষ!'

'হুম, আপনারা চারজন প্রথমে ভিতরে ঢোকেন?'

'হ্যাঁ, আমি শ্যামাদা, সুবীর, আর ভবেন।'

ভবেন একটু দূরে মাটির উপরে বসেছিল। সে ঘাড় নাড়ায়।

'ঢোকার পর কী দেখলেন?'

'প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি তেমন। শ্যামাদাই আগে দেখেছিলেন। মাটির উপরে মনে হল একটা দেহ পড়ে আছে। আমরা চারজনেই প্রথমে ভয় পেয়ে যাই। বিশেষ করে দেহটা একটা বাচ্চা ছেলের বলে...' বাকি কথাটা বলতে ইতস্তত করেন লাহিড়ী।

'হুম... যক্ষের ব্যাপারটা আমিও শুনেছি... তারপর কী হল?'

'আমরা চারজনেই চিৎকার করে উঠি। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখি ছেলেটা মাটিতে পড়ে আছে, চতুর্দিক রক্তে ভেসে গেছে। আমি মৃতদেহ আগেও দেখেছি কিন্তু ওরকম গলার নলি উপড়ে খুন... ছেলেটা খুন হয়েছে বুঝতে পেরে আমিই ডাক্তারকে ডাকি।'

'ডাক্তার...' বাকিদের মধ্যে থেকে উপল ঘাড় নাড়ায়, 'আমি। ভিতরে ঢোকার সময় আমি ভেবেছিলাম ঘরের ভিতরে গিয়ে কেউ হয়তো উত্তেজনায় অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে গেছে। একটা ডেডবডি পড়ে থাকবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'ডেডবডি যে বুঝলেন কী করে? মানে দেহটা যে মৃত...'

'গলার নলিটা যেভাবে উপড়ানো ছিল তাতে মানুষের বেঁচে থাকার কথা নয়। রাইগার মরটিস সেট ইন করেছিল। রক্তটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছিল। বুঝলাম অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগে মারা গেছে ছেলেটা।'

'বেশ, তারপর?'

‘লোকে বলছিল পুলিশ আসা অবধি বডিটা ওভাবেই ফেলে রাখতে কিন্তু শ্যামাদা সায় দেননি, একরকম জোর করেই বডিটা সরিয়ে ফেলতে বলেন।’

‘কেন?’

‘জায়গাটা একসময়ে কালীমন্দির ছিল। আর যখের ব্যাপারটাও লোকজনের মুখে মুখে ঘোরে। শুভ-অশুভ বিচার করেই বোধহয় উনি...!’

‘আচ্ছা, আপনি বলতে থাকুন!’

‘আমি আর ভবেন মিলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে গিয়ে ধরাধরি করে বডিটা এ বাড়ির একতলায় ঠাকুরদালানে এনে রাখি। তারপর থেকে পুলিশ আসা অবধি ওখানেই পড়ে ছিল।’

‘পুলিশ কখন আসে?’

সুবীর চৌধুরী উত্তর দেন, ‘ওই ধরুন রাত সাড়ে দশটা নাগাদ। এর মধ্যে আমরা তামাশা দেখতে আসা লোকজনকে সরিয়ে দিই।’

ইন্সপেক্টর গোস্বামী এবার সুবীর চৌধুরীর দিকে ঘোরেন, ‘এ-বাড়ির মালিক তো আপনিই। ছেলেটিকে দেখেননি আগে?’

‘নাঃ।’

‘মন্দির খোলার আইডিয়াটা আপনার?’

নাকের ডগা থেকে চশমাটা টেনে এনে চোখের কাছাকাছি বসিয়ে নেন চৌধুরী, ‘মন্দিরটা খোলার ইচ্ছা কারোরই ছিল না। আমার বাবার আমলে একবার খোলা হয়েছিল ঘরটা, সেসময়ে আমি এখানে ছিলাম না। কিন্তু মারা যাবার আগে বাবা কড়া নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন ঘরটা যেন কোনও পরিস্থিতিতেই না খোলা হয়। কিন্তু...’ পরের কথাটা শেষ করার আগেই থেমে যান চৌধুরী।

লাহিড়ী বলেন, ‘শ্যামাদা বললেন মন্দিরে নাকি অপদেবতা এসে বাসা বেঁধেছে, উনি পুজোআচ্চা করে সেই দেবতা তাড়াবেন।’

বড়সড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গোস্বামী, ‘কবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দরজা খোলা হবে?’

‘দিন তিনেক আগে।’

‘খোলা হবে সেকথা তখন থেকেই সবাই জানত?’

'আমরা অত কানে ধরে জানাতে যাইনি কাউকে, তবে খবর রটে যায়।'

ঘের বারান্দার নিচে ঠাকুর দালানটা এখন ফাঁকা পড়ে আছে। গোটা বাড়ির পেটের ভিতর ছোটছোট ঘরগুলো থেকে গুঞ্জনের শব্দ ভেসে আছে। সেটা শুনতে শুনতে প্রসঙ্গ বদলান গোস্বামী, 'আপনাদের নতুন কোনও গেস্ট এসেছে এর মধ্যে? নতুন কোনও সদস্য?'

সুবীর মুখ তোলেন, 'নতুন বলতে আমার মেয়ে, ও কলকাতায় থাকে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে এক বান্ধবীকে নিয়ে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকেন ইন্সপেক্টর, কিছু একটা ভাবনায় ডুবে যান, শেষে মুখ তুলে বলেন, 'কাল রাত থেকে আমরা মন্দিরের চারপাশটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। ভেবেছিলাম কোথাও একটা ফাটল কি ভাঙাচোরা একটা খাঁজ থাকবে, বাট নাথিং। একটা ফুটো পর্যন্ত নেই। এমন অদ্ভুত, অলৌকিক খুন আমি এর আগে দেখিনি। আপনারা কেউ ধারণা দিতে পারেন কিছু?'

মিনিটখানেকের একটা নীরবতা গ্রাস করল বারান্দাটাকে। আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়লেন গোস্বামী, উঠতে উঠতে বললেন, 'বেশ আজ চলি, আপাতত আমাদের কাজ ছেলেটার আইডেন্টিফিকেশন। এর মধ্যে আপনাদের কারও আমাকে কিছু জানানোর থাকলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। সাবধানে থাকবেন সবাই, অযথা ভয় পাবেন না। আপনাদের ঠাকুর দালানটা একটু দেখতে চাই... কেউ একজন....'

'হ্যাঁ আমি যাচ্ছি।' সুবর্ণ লাহিড়ী উঠে পড়েন। গোস্বামীকে নিয়ে একতলায় নেমে আসেন তিনি। এখানে ছোট একটা প্যাসেজ। সেটা ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলেই ছোট দালানটা চোখে পড়ে। কাল রাতে পুলিশ আসা অবধি এখানেই রাখা ছিল মৃতদেহটা।

'সুবীরবাবু ছাড়া আপনারা সবাই এখানে ভাড়াটে, তাই তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি পৈতৃক সূত্রে পান বাড়িটা। ওনার পূর্বপুরুষ শুনেছি এ অঞ্চলের জমিদার ছিল।'

‘বাবা! এটাই তাহলে জমিদারবাড়ি? কিন্তু প্রাসাদ-প্রাসাদ ফিলটা পাচ্ছি না যে।’

‘পাবেনও না, মূল যে জমিদারবাড়ি ছিল সেটা গ্রামের অনেক ভিতরে। এ বাড়িটা সুবীরবাবুর দাদু নিজের টাকাপয়সা দিয়ে তৈরি করেন। বয়স মেরে কেটে একশোর বেশি হবে না। তাও সেকালের আর্কিটেকচার বলে জমিদারবাড়ির একটা আদল দেওয়ার চেষ্টা আছে। মানে ঘোড়ারও তো টাট্টু হয়, এ বাড়িটাও সেইরকম...’

‘সব মিলিয়ে কতজন থাকেন এখানে?’ দালানের ভিতরে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করেন গোস্বামী।

‘এই ধরুন সুবীর ছাড়া আমি আর আমার স্ত্রী, আমার এক ছেলে সে কলকাতায় থাকে, ন-মাসে ছ-মাসে আসে, তাছাড়া ডাক্তার দেবনাথ, শ্যামাদা, আনন্দ আর ভবেন। ভবেন একা হাতে গোটা বাড়িটার কাজকর্ম সামলায়। ওকে সুবীরদাই রেখেছেন। আনন্দ...’

দালানের একেবারে মাঝামাঝি একটু কালচে রক্তের দাগ দেখতে পেলেন গোস্বামী। ফরেনসিকে পাঠানো হয়েছে ছেলেটির দেহ। তাদের বয়ান অনুযায়ী ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে গলার নলিটা। ছেলেটির পেটে কোনও খাবার-দাবার পাওয়া যায়নি। বোঝা যায় অন্তত একদিন অভুক্ত ছিল সে। শরীরে তেমন স্ট্রাগলের চিহ্ন নেই। খুনটা হয়েছে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।

কথাগুলোতে আর আগ্রহ পেলেন না গোস্বামী, প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন, ‘কাল বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে কী করছিলেন মনে আছে?’

একটু চিন্তিত দেখায় লাহিড়ীকে, ভেবেচিন্তে বলেন, ‘তাস খেলে ফিরি ধরুন ওই তিনটে নাগাদই হবে, তারপর একটু জিরিয়ে চান-টান করে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আমার আবার ওই বিকেলে একটু না ঘুমালে...’

‘তারপর আর বেরননি বাড়ি থেকে?’

‘আজ্ঞে না, পাড়ার ছেলেরা এসে ডাকাডাকি করতে একেবারে সাতটা নাগাদ মন্দিরের সামনেটায় যাই।’

দালানের একপাশে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়েন গোস্বামী, সিঁড়ি দিয়ে ভবেনকে নেমে আসতে দেখা যায়, তার হাতে একটা ছোট প্লেট, তার উপরে দু-কাপ চা রাখা আছে। প্লেটটা গোস্বামীর দিকে বাড়িয়ে দেয় সে। তারপর সুবর্ণ লাহিড়ীর দিকে।

ভবেন চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেন গোস্বামী, 'ডেডবডিটা তো এখান অবধি তুমিই বয়ে নিয়ে আস? তাই না?'

'আমি আর ডাক্তারবাবু, ওনার চেম্বারে একটা স্ট্রেচার থাকে, উনি আমাকে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসতে বলেন। সবাই খুব ভয় পেয়েছিল, কেউ বডিতে হাত দিতে চাইছিল না। আমরা দু-জনেই ধরাধরি করে স্ট্রেচারে করে তুলে এখানে নিয়ে এসে শুইয়ে দিই... ওইটুকু ছেলের অত রক্ত, আমার গাটা কেমন করছিল, একটা চাদর এনে চাপা দিয়ে দিই... তারপর থেকে ওইভাবেই ছিল স্যার...'

'হুম...' চায়ে চুমুক দিয়ে মাথার উপরে খোলা আকাশের দিকে তাকান গোস্বামী। চোখ দুটো বুজে আসে। এখনও অবধি কয়েকটা প্রশ্ন খড়্গের মতো ঝুলছে মাথার উপরে।

ছেলেটা কে?

তাকে খুন করা হল কেন?

তার দেহটা খুনি যেকোনও মাঠের উপরে বা পুকুরে ফেলে আসতে পারত, তার বদলে একটা বন্ধ ঘরের ভিতরে রাখতে গেল কেন? আর রাখলই বা কেমন করে?

এবং যে রাখল, সে কে?

প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়েই দালান ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন গোস্বামী। এবং বেরোতেই একটা বছর বাইশের মেয়েকে চোখে পড়ল তার। মেয়েটার গায়ে একটা অ্যাকোয়া ব্লু রঙের স্ট্রাইপড টি-শার্ট আর জিনস। মাথার চুল এই মুহূর্তে খোলা। লক্ষ করলেন হাতে একটা সিগারেট জ্বলছে মেয়েটার। রোয়াকের একপ্রান্তে পিঠ রেখে বসে কিছু একটা ভেবে চলেছে যেন।

ইচ্ছা করেই মাটির উপরে পা দিয়ে আওয়াজ করলেন গোস্বামী, মেয়েটা থতমত খেয়ে ট্যাপ করে ফেলল সিগারেটটা, গোস্বামীর দিকে ফিরে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, ইন্সপেক্টর হাতের ইশারা করে অভয় দিলেন তাকে, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওটা বের করে নিন, হাতে ছ্যাঁকা লেগে যাবে।'

লাজুক হাসে পায়েল, 'আসলে রাতে ঘুম হয়নি ভালো, সকাল থেকে ব্যথা করছে মাথাটা।'

'ঘুম হয়নি কেন?'

সিগারেটটা বের করে ইতস্তত করেই একটা টান দেয় পায়েল, 'কাল রাতে ওই গলাকাটা বডিটা দেখার পর থেকেই একটু নেমে আছি।'

'নেমে?'

'মানে ওই ভয়-ভয় লাগছে আর কী...!'

'ওঃ, আপনিই নতুন অতিথি এখানে?'

পায়েল উপরে নিচে ঘাড় নাড়ে।

'কবে এসেছেন?'

'দু-দিন আগে। আসলে কলেজ ছুটি তো...!'

পায়েলের চোখে একবার চোখ বুলিয়ে নেন গোস্বামী। মুখ তুলে একটু গম্ভীর গলায় বলেন, 'কাল রাতে দরজা খোলার আগে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছিল আপনার? মানে কারও অদ্ভুত আচরণ?'

সিগারেট থেকে ছাই ফেলে পায়েল, কব্জির উল্টোদিক দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে বলে, 'গোটা ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক, এইসব যখ-টখের গল্প অ্যানাদার লেভেল অফ ওপিয়াম..'

'সেটা বাদ দিয়ে আর কিছু?'

'তখন ওই রক্তারক্তি দেখে একটু ভেবলে গেছিলাম, কিন্তু পরে একটা জিনিস মনে হল, জানেন?'

'কী জিনিস?'

'যে ছেলেটা খুন হয়েছে সে এই গরমেও ফুলহাতা জামা পরেছিল কেন বলুন তো?'

গোস্বামী ঠোঁটের ফাঁকে হাসে, 'হুঁ, ওটা আমরাও খেয়াল করেছি। আর কিছু?'

কী যেন ভেবে একটু থেমে যায় পায়েল, তারপর আচমকাই সিগারেটটা ফেলে রোয়াক ছেড়ে উঠে পড়ে বলে, 'আপনি একটু আসবেন আমার সঙ্গে? একটা জিনিস দেখানোর আছে।'

এই প্রথম একটু থতমত খান ইন্সপেক্টর। কলেজ পড়ুয়া মেয়ে সাধারণত পুলিশ দেখলে একটু ঘাবড়ে যায়। ভেবেছিলেন মেয়েটা কোনওরকমে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে দায় সারবে। সময় নিয়ে বলেন, 'বেশ, চলুন।'

বাড়ি থেকে মন্দিরটা বেশ কিছুটা দূরে। মাঝে অনেকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে এদিকটায় আসতে হয়। মন্দির থেকে খানিকটা আগে একটা পুকুরের সীমারেখা শুরু হচ্ছে। পুকুরের ধার থেকেই ছোট গাছপালার একটা জঙ্গল। পুকুর আর জঙ্গলের মাঝে মিটারদেড়েক চওড়া মাটির রাস্তা ধরে হাঁটলে মন্দিরটা দেখা যায়।

এখন সেটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা দু-জনে। মন্দিরের সামনে একসময় সিমেন্টের একটা চাতাল ছিল। এখন তার প্রায় পুরোটাই উঠে গেছে। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো কালীমন্দিরটা। এখন তার দরজা খোলা।

উর্দিধারী কয়েকজন লোক ঘুরে দেখছে জায়গাটা। বাড়ির লোকজনকে আপাতত আসতে দেওয়া হচ্ছে না এদিকটায়। পায়েলের সঙ্গে গোস্বামীকে দেখে আর বাধা দিল না তারা।

মাটির দিকে নির্দেশ করে পায়েল, 'আমি কাল সকালেও দেখেছি মন্দিরটাকে ঘিরে হাঁটু অবধি ঝোপঝাড় ছিল, সকালেই লোক লাগিয়ে সাফ করা হয়েছে।'

চারদিকটা দেখতে থাকে সে। কয়েক জায়গায় এখন মাটির উপর পুলিশের খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন, সেদিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনারা কি ভেবেছেন খুনি মাটির তলায় সুড়ঙ্গ কেটে ভিতরে পৌঁছেছে?'

'এই খুনটা আমাদের ভাবনাচিন্তার বাইরে ম্যাডাম। কোনও স্টোনই আনটার্নড রাখা হচ্ছে না।'

‘তা পেলেন কিছু? সুড়ঙ্গ? হিডেন প্যাসেজ? স্লাইডিং প্যানেল?’

‘নাঃ, কিচ্ছু না। সব নিরেট সিমেন্ট, আর কিচ্ছু নেই।’

‘হুম...’

মন্দিরের দরজার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যায় পায়েল, গোস্বামী জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি বলছিলেন অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখেছেন।’

‘একটা না, দুটো। তার মধ্যে প্রথমটা আমার পুরোপুরি মনে পড়ছে না।’

‘মনে পড়ছে না মানে?’

পায়েল কপালে হাত ঘষতে ঘষতে বলে, ‘কাল রাতে ডেডবডিটা আবিষ্কার হওয়ার ঠিক আগে কিছু একটা ভাবনা মাথায় আসে আমার। পায়ের ছাপ নিয়ে কিছু একটা অসঙ্গতি...’

‘কেমন অসঙ্গতি?’

‘সেটাই আর এখন মনে পড়ছে না...’ পায়েলের গলায় আফসোস ঝরে পড়ে, ‘আসলে ডেডবডিটা দেখে মাথাটা এমন বসে গেল যে তার পর থেকেই সব গুলিয়ে গেছে। রাতে যখন শুতে যাই তখন আবার খেয়াল হয় ব্যাপারটা। কিন্তু ওই পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না...’

পা চালিয়ে মন্দিরের দরজার ভিতরে ঢুকে আসে ওরা। এখন দিনের আলোয় গোটা ঘরটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ঘরের দু-কোণে দুটো হ্যারিকেনও জ্বালা রয়েছে। তার আলো এসে পড়েছে চারদিকের দেওয়ালে।

বাইরে থেকে যতটা মনে হয় ঘরটা তার তুলনায় বেশ বড়। চারকোনা, কোথাও কোনও আসবাব বা জঞ্জালের স্তূপ কিছু নেই। মেঝেটা সিমেন্টের। তার উপরে লাল রং করা। ঘরের একদিকের দেওয়ালের গায়ে অল্প একটু চাঙড় উঠে গেছে। বোঝা যায় সেখানে কয়েকশো বছর আগে বিগ্রহ ছিল।

পায়েলকে তার উপর হাত বোলাতে দেখে গোস্বামী চাপা হাসি হেসে বলেন, ‘ওটার সঙ্গে বাকি দেওয়ালের পার্থক্য নেই কিছু। দরজা সিল করা থাকলে এ ঘরে চামচিকে অবধি ঢুকতে পারবে না। একটা গোটা মানুষ তো দূরের কথা।’

‘এ ঘরে একটা নয়, দুটো মানুষ ঢুকেছিল।’ পিছন ফিরে উঠে দাঁড়ায়

পায়েল, 'খুনটা যদি বাইরে হয়ে থাকে তাহলে ডেডবডি নিজে নিজে ঘরে ঢুকতে পারে না। কেউ তাকে নিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং তাকে রেখে বেরিয়ে যায়। আর যদি ভিতরে খুন হয় তাহলে দুটো মানুষ কোনওভাবে এই ঘরে ঢুকেছিল। যাদের মধ্যে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।'

'খুন ঘরের ভিতরেই হয়েছে।' দৃঢ় গলায় বলেন ইন্সপেক্টর গোস্বামী, 'বডি ঘরের প্রায় মাঝামাঝি পড়েছিল। গলা কেটে যাকে খুন করা হয়েছে তাকে নিয়ে বেশি নড়াচড়া করতে গেলে মাটিতে রক্তের দাগ পড়বে, অথচ ছেলেটার গলার আশপাশে ছাড়া অন্য জায়গায় রক্ত ছিল না। সে যাই হোক, প্রশ্নটা রয়েই যায়। যে ঘর আজ পঞ্চাশ বছর হল খোলা হয়নি সেখানে দুটো মানুষ এসে ঢুকল কী করে?'

পায়েল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে ঝগড়াঝাঁটির শব্দ ভেসে আসতে দু-জনেই তড়িঘড়ি বাইরে বেরিয়ে এল।

পুরোহিত শ্যামাপদকে চোখে পড়ল। মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে চাইছেন তিনি! পুলিশের লোক বাধা দেওয়ায় রুষ্ট হয়েছেন।

'কী হয়েছে এখানে?' গোস্বামী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'উনি বলছেন ঘরের ভিতর কীসব পুজো-টুজো করবেন।' হাবিলদার বিরক্ত গলায় বলে ওঠে।

'আমি তো বলছি, আপনারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি একটু ফুল বেলপাতা দিয়েই চলে যাব। মানুষের রক্ত পড়েছে ঘরটায়...!'

'ওনাকে যেতে দাও...' হাবিলদারকে নির্দেশ দিলেন গোস্বামী, তারপর শ্যামাপদর দিকে ফিরে বললেন, 'আজ বিকেলে আমি আসব একবার। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে। সময় হবে তো?'

ঘাড় নাড়েন শ্যামাপদ। তারপর এগিয়ে যান মন্দিরের ভিতরে। একটু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন ভদ্রলোক। ইন্সপেক্টর গলা তুলে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি পড়ে গেছিলেন কোথাও?'

প্রশ্নটা কানে যায় না তার। খোঁড়াতে খোঁড়াতেই মন্দিরের ভিতরে ঢুকে যান।

গোস্বামী পায়েলের দিকে ফিরে বলেন, 'আর দ্বিতীয়টা?'

'কিসের দ্বিতীয়?' শ্যামাপদর পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল পায়েল।

'ওই যে বললেন, দুটো অস্বাভাবিক ব্যাপার চোখে পড়েছে আপনার। প্রথমটা তো পায়ের ছাপ, দ্বিতীয়টা?'

'মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ।' চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে পায়েল।

'কার?'

'সবার...' থেমে থেমে উচ্চারণ করে পায়েল, 'এত সহজ একটা ব্যাপার সবার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছিল অথচ কেউ খেয়াল করল না! এটা অস্বাভাবিক নয়?'

'কী ব্যাপার?'

টুং-টুং করে পায়েলের ফোনটা বেজে ওঠে। সেটা ধরতে ধরতে বলে, 'আপাতত মনে করুন আমি কিছু বলিনি, বিকেলে আবার আসবেন তো, তখন কথা হবে, এখন আসি।'

তাড়াহুড়ো করে পিছনের পথে পা বাড়ায় পায়েল। গোস্বামী মনে মনে একটা ব্যাপার বুঝতে পারেন। এ মেয়ের জীবনে এই প্রথম খুন নয়। এর আগেও সে রক্ত দেখেছে। হয়তো অন্য কোথাও...

(তিন)

দুটো নাগাদ স্নান করে বেরিয়ে কলির মনে হল বাড়িটা সকালের থেকে একটু শান্ত হয়েছে। পুলিশের দৌরাত্ম্য খানিক কমেছে। সারা সকাল যে গুনগুন আওয়াজটা ভেসে আসছিল ঘরগুলো থেকে সেটা আপাতত থেমে গেছে। চুল আঁচড়ে ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখতে পেল সে। বিছানার একপ্রান্তে পিঠ এলিয়ে সকালের কাগজটা নিয়ে কিছু একটা পড়ছেন মন দিয়ে। কলি ঘরে এসে ঢুকতে কাগজটা মুড়ে পাশে রেখে দিলেন তিনি, মুখ নামিয়ে বললেন, 'খবরটা ছোট করে বেরিয়েছে। ডিটেলে লেখার সময় পায়নি।'

'কই দেখি...' কাগজটা তুলে খবরটা খুঁজে নিয়ে পড়তে থাকে কলি, গ্রাম আর বাড়ির নামটা বেরিয়েছে। যদিও খবরটা এমন চকের গুঁড়োর মতো করে লেখা যে কারও চোখ আটকাবে না।

'তোর কথা ভেবেই খারাপ লাগছে।' থমথমে গলায় বলেন সুবীর চৌধুরী।

'আমার আবার কী হল?'

'এই নিয়ে যদি বেশি মাতামাতি হয় কলেজে গিয়ে তোর মুখ দেখানো দুষ্কর হবে, এই বাড়িতে একটা খুন হয়ে গেছে....'

'তোমার কোনও আইডিয়া নেই বাড়িতে একটা খুন হওয়া কতটা গ্ল্যামারাস, তার উপরে এমনি খুন নয়, লকড রুম মিস্ট্রি!'

'সেটা আবার কী?'

'মানে ওই যেধরনের খুনে বোঝা যায় না খুনটা কীভাবে হয়েছে।

একটু বিরক্তই হন সুবীর, কাগজটা আবার তুলে নিয়ে সামনের পাতার বড় খবরে চোখ রেখে বলেন, 'সে যে মিস্ট্রিই হোক, এসবের মধ্যে মাথা গলাতে যাস না। আর একা একা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো একদম না।'

কলি ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরতে যাচ্ছিল। কী মনে পড়তে থেমে যায়, 'আচ্ছা বাবা, আমাদের পুরনো ফোটো অ্যালবামগুলো কোথায় আছে বলো তো?'

'তোর মায়ের ঘরের ড্রয়ারে আছে। কী হবে?'

'পায়েলকে আমার ছোটবেলার ছবি দেখাতাম।'

'ওঃ, ড্রয়ারে চাবি দেওয়া নেই। নিয়ে যা। হারিয়ে ফেলিস না কিন্তু, আমার কাছে নেগেটিভ নেই, বহু পুরনো ছবি সব।'

ছুটে মায়ের ঘরে গিয়ে ড্রয়ারটা খুলে ধরে কলি। মায়ের ঘরটা এ বাড়ির বেশ ভিতরের দিকে। কলির যখন ন-বছর বয়স তখন মা মারা যায়। সেই থেকে ঘরটা এমন সাজিয়ে গুছিয়েই রাখা থাকে। দেওয়াল জুড়ে মহিলার একটা বুক অবধি ছবি টাঙানো আছে। সেটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনটে অ্যালবাম বের করে নেয় কলি।

মোটা চামড়ায় বাঁধানো শক্তপোক্ত অ্যালবাম। ফিতে দিয়ে প্লাস করে বাঁধা। একসাথে ওজন কেজিপাঁচেকের কম নয়। সেগুলো হাতে ধরে গেস্টরুমের দিকে হাঁটা দেয় কলি।

বিছানার উপরে বসে জানলা দিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছিল পায়েল। এতটাই মগ্ন হয়েছিল যে কলি ভারী অ্যালবামটা বিছানার উপরে রাখতেও শব্দটা কানে যায় না তার। একটু খটকা লাগে কলির। এত মন দিয়ে কী দেখছে মেয়েটা। সে কাছে গিয়ে পায়েলের পিঠে একটা টোকা দেয়, 'কী দেখছিস রে?'

পিছন ফিরে একগাল হাসে পায়েল, খোলা জানলাটা নির্দেশ করে বলে, 'এখান থেকে আগে কালীমন্দিরটা দেখা যেত। এখন আর দেখা যায় না, দেখ...'

জানলা দিয়ে তাকিয়ে কলি বুঝতে পারে ব্যাপারটা। গেস্টরুমের জানলা থেকে সোজা তাকালে মন্দিরের চুড়োটা চোখে পড়ে বটে কিন্তু বাকিটা ঢাকা পড়ে যায় দুটো পাশাপাশি গজিয়ে ওঠা সবেদা গাছের ডালপালায়।

'তুই আমাকে একটু বলতে পারবি এ বাড়ির কোন কোন ঘর থেকে কালীমন্দিরটা স্পষ্ট দেখা যায়?'

কলি অল্প হাসে, 'আমিও তোর মতো এখানে নতুন।' একটু থেমে বলে, মায়ের ঘর থেকে দেখা যায়।'

'মায়ের...' কথাটা বলতে ইতস্তত করে পায়েল।

'হ্যাঁ, আগের মতো সাজিয়ে রাখা আছে, ঘরটায় খুব একটা কেউ যায় না।'

'কাল সকাল থেকে গেছিলি ঘরটায়?'

'হ্যাঁ... একবার গেছিলাম, জানলাটা বন্ধ ছিল।'

'খোলার চেষ্টা করিসনি?'

'করেছিলাম...' ভেবে বলে কলি, 'কিন্তু খোলেনি।'

'কেন?'

'বুঝিসই তো, পুরনো কাঠের জানলা। খুব একটা খোলাটোলা হয় না। কলকব্জা কোথাও আটকে গেছে হয়তো।'

'হুম...' কিছু একটা ভাবনার মধ্যে ডুবে যায় পায়েল। ভুরু দুটো অসম্ভব রকম কুঁচকে আছে তার। জানলা দিয়ে আসা আলো তার মুখ আর চুলের

একপাশে এসে পড়েছে। নরম চামড়ার উপর একটা সোনালি আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে তারা।

'অ্যালবাম দেখতে চেয়েছিলি, এই যে...' টেবিলের উপরে রাখা অ্যালবামগুলো পায়েলের সামনে এগিয়ে দেয় কলি।

মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে অ্যালবামগুলোর দিকে মন দেয় পায়েল, মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, 'ক্রোনোলজিক্যালি আছে তো?'

'হ্যাঁ। একদম প্রথম ছবিটা হাতে আঁকা, দেড়শো বছর আগের...'

কয়েকটা পাতা উল্টে থেমে যায় পায়েল, বলে, 'পঞ্চাশ বছর আগে যখন কালীমন্দিরটা খোলা হয় তখন কোনও ছবি তোলা হয়নি? মানে সেসময়ে তো বেশ বড় একটা ইভেন্ট হবার কথা। ট্রেজার হান্ট বলে কথা।'

'নাইন্টিন সিক্সটি ফাইভ...' কলি দ্বিতীয় অ্যালবামটা তুলে নিয়ে বিশেষ একটা জায়গা খুলে এগিয়ে দেয় পায়েলের দিকে, 'এই যে, পেয়েছি... পঞ্চাশ বছর আগের কালীমন্দির।

অ্যালবামের খোলা পাতাটা রোদে ধরে ভালো করে দেখতে থাকে পায়েল! ছবিটা তোলা হয়েছে মন্দিরের সামনে থেকে। এই পঞ্চাশ বছরে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তবে জায়গাটায় ঝোপঝাড়ের পরিমাণ আর একটু কম। কয়েকটা পাথর বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, মন্দিরের একেবারে মাথায় একটা পতাকা উড়ছে। কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছে পায়েল। তার চোখের মণিদুটো অস্থির হয়ে উঠেছে।

'তোর কিছু গোলমাল চোখে পড়ছে?' কলির দিকে ফিরে অসহায় হয়ে প্রশ্ন করে সে।

'কীসের গোলমাল?' বিছানা ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে থাকে পায়েল। একটা চাপা অস্থিরতা এসে গ্রাস করছে তাকে, একটানা বলে যেতে থাকে সে, 'ইয়েস, গোলমাল, পঞ্চাশ বছর আগের এই মন্দিরটার সঙ্গে আমাদের কালকে রাতে দেখা মন্দিরটার একটা বিরাট বড় পার্থক্য আছে। কী সেটা?'

'আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তবে মন্দিরের মাথায় পতাকাটা নেই।' ছবিটা দেখতে দেখতে বলে কলি।

পিঠের উপরে ছড়িয়ে থাকা চুলগুলোকে বেঁধে নেয় পায়েল, ‘নাঃ, ডেডবডিটা দেখার পর থেকে মাথাটা কাজ করছে না একদম। চল একটু বেরোই।’

‘কোথায় যাবি এই দুপুরে? তাছাড়া বাবা একা কোথাও যেতে বারণ করেছে।’

‘একা কোথায়? আমি আছি তো।’

কলি মুখ বেঁকায়, ‘আহা, তোর ওজন ছেচল্লিশ আমার চুয়াল্লিশ, দু-জনে মিলে একটা মানুষের সমানই হয়।’

‘আচ্ছা বেশ, বাইরে যাব না। বাড়ির ভিতরটাই তো একটু ঘুরে দেখা যায়....’

আর আপত্তি করে না কলি। দু-জনে মিলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

কলিদের বাড়িটা তিনতলা। তবে প্রস্থে বেশ বড়সড়। তিনটে তলা মিলে মোট বারোটা ঘর। বাইরে থেকে দেখলে পুরনো দিনের বনেদি বাড়ি বলে মনে হয়। দুর্গাপুজো হয় এখানে। এখন অবশ্য শরৎ নয়, তাও ফাঁকা ঠাকুরদালানটায় চোখ যেতে পায়েলের মনের ভিতর ঢাকের বোল বেজে উঠল।

‘এ বাড়ির ভাড়াটেরা সবাই পুরনো, তাই না?’ দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করে পায়েল।

‘আমি তো জন্ম থেকেই দেখে আসছি। পুরোহিতমশাই বিয়ে-টিয়ে করেননি, উনি থাকেন দোতলায়। ওনার পাশের রুমেই ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন লাহিড়ী আঙ্কেল। গ্রামে জমিজমা আছে, সেসবই দেখাশোনা করেন, ধুরন্ধর লোক। ডাক্তারকাকার ঘর আর চেম্বার দুটোই একতলায়। গ্রামে জনাতিনেক ডাক্তার আছে, তার মধ্যে কাকার নামডাকই বেশি। আলাদা একটা চেম্বার খুলবেন বলছিলেন একবার তারপর কিছু কারণে আর খোলা হয়নি। আনন্দদা এখানেই একটা কারখানায় কাজ করে, বিয়ে হবে বলে শুনেছিলাম একসময়, তারপর কেন করেনি জানি না।’

‘এরা সবাই ভাড়াটে?’

'পুরোহিতমশাই নন। ওনার পূর্বপুরুষ নাকি এ বাড়ির কুলপুরোহিত ছিলেন। বাড়ির পুজোআচ্চার ব্যাপারটা উনিই সামলান। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই, তাছাড়া এই বয়সে যাবেনই বা কোথায়, বাবা ওর থেকে টাকা নেন না।'

'বেশ, তিনজন হল, আর?'

'আর ভবেনদা...' কী যেন ভেবে একটু উদাস হয় কলি, 'ভবেনের ব্যাপারটা নিয়ে একটু সমস্যা আছে বুঝলি। ছোট থেকে শুনে আসছি ও নাকি পুরোহিত মশাইয়ের বিধবা বোনের ছেলে। ওনার সঙ্গেই একবার এ বাড়িতে চলে আসে, আর ফেরত যায়নি, বাবা ওকে কাজে লাগিয়ে দেন। বড় হয়ে বুঝেছি অন্য কিছু ব্যাপার আছে।' চোখ টিপে বলে, 'ফ্যামিলি সিক্রেট আর কী...'

সামনে তাকিয়ে ওরা থেমে যায়। ওরা যে প্যাসেজটা দিয়ে হাঁটছে তার ঠিক উল্টোমুখ থেকে হেঁটে আসছে আনন্দ। ওদের দেখতে পেয়ে একটা মিহি হাসি খেলে যায় তার মুখে, কলি হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

আনন্দ কাঁধ ঝাঁকায়, 'আর বলো কেন, বড় মায়ের ঘরের জানলাটা কিছুতেই খুলছে না, বড়দা বললেন কাঠমিস্ত্রি ডেকে আনতে?'

'তার মানে কাল তুই ছাড়া আরও কেউ খোলার চেষ্টা করেছিল ওটা।' বিড়বিড় করে বলে পায়েল, তারপর গলা তুলে বলে, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব?'

'কী চেষ্টা করবে?' আনন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'জানলাটা খোলার।'

'না না, ও জানলা ঠেলাঠেলি করেও খোলেনি কাল। মানুষের হাতের কম্ম নয়।'

'একবার চেষ্টা করতে দোষ কী, ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দে তো কলি।'

মিনিটখানেক পর বাইরের বারান্দা পেরিয়ে কলির মায়ের ঘরে এসে পড়ে ওরা তিনজনে! সুবীর চৌধুরী এখন তার চেয়ারে বসে নেই। কাগজটা টেবিলের উপরেই রাখা আছে।

আনন্দই আগে এসে দাঁড়ায় জানলাটার সামনে। শক্ত হাতে দু-বার ধাক্কা

মারে জানলার পাল্লায়, মচমচ করে আওয়াজ হয় বটে, কিন্তু খোলে না, ‘দেখ, এ একেবারে জ্যাম হয়ে গেছে।’

মাথার চুল থেকে একটা ক্লিপ খুলে নেয় পায়েল। তারপর মেঝের উপর হাঁটু রেখে বসে চোখ রাখে জানলার নিচের সরু ফাঁক হয়ে থাকা প্যানেলে। ক্লিপটা সেখানে ঢুকিয়ে খানিক খোঁচাখুঁচি করে। তারপর আচমকাই সজোরে একটা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলে জানলাটা। আনন্দ আর কলি হতবাক হয়ে তাকায় তার দিকে। সে হেসে বলে, ‘একটা কাঠপিঁপড়ের মতো ছোট ইটের টুকরো আটকে ছিল ফ্রেমের নিচে, তাই খুলছিল না।’

আনন্দর গলায় কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে, যাক, সকালের খাটনিটা বেঁচে গেল আমার। কাঠমিস্ত্রির বাড়ি সেই মেলা দূর...

‘আচ্ছা আনন্দদা, তুমি যখের ব্যাপারটা বিশ্বাস করো?’

পায়েলের আচমকা প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না আনন্দ, সে একটু থতমত খেয়ে বলে ‘ঠিক করি না। তবে...’

‘তবে কী?’

পরের কথাগুলো বলতে গিয়ে আনন্দের গলা বেশ কয়েকবার কেঁপে যায়, ‘এই দিনতিনেক আগে কারখানা থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল, বারোটা কি একটা হবে। পুকুরের পাশের রাস্তাটা দিয়ে আসতে গিয়ে দেখি একটা বুনোলতার ঝোপ একটু নড়ছে, হাওয়ায় নয়, ঠিক যেন, মানুষে নাড়াচ্ছে।’

‘সেতো চোখের ভুলও হতে পারে।’

‘উঁহু...’ আনন্দ ভেবে বলে, ‘একদিন হলে হত, পরপর দু-দিন একই কাণ্ড হয়। আমি ঝোপের দিকে এগোলেই নড়া থেমে যায়। ঠিক যেন আমাকে আসতে দেখে কেউ সরে গেল ওখান থেকে। যখ কি না জানি না, কিন্তু কিছু একটা আছে এখানে।’

‘স্পুকি...’ বিড়বিড় করে বলে পায়েল।

‘তোমরা একটু সাবধানে থেকো দিদি।’ থমথমে গলায় কথাগুলো বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আনন্দ। কলি একটু চাপা গলায় বলে, ‘আনন্দদা

যা বলছে একেবারে খোলা মনে বিশ্বাস করিস না, ছেলেটার মনটা ভালো কিন্তু ওর একটা হিস্ট্রি আছে।'

'কেমন হিস্ট্রি?'

'ছোটবেলায় অভাবের সংসার ছিল, চোখের সামনে নিজের মাকে খুন হতে দেখে, তারপর থেকে নাকি হ্যালুসিনেট করত খুব। স্ক্রিতজোফ্রেনিয়া টাইপের হয়ে গেছিল। তবে সেটা যে এখনও আছে তা জানতাম না।'

'হুম...' কিছু একটা চিন্তায় ডুবে গেছে পায়েল।

কলি জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কালীমন্দিরটা, সে পায়েলের মুখের দিকে চায়, 'তুই কী করে জানলি পাল্লাটায় ইটের টুকরো আটকে গেছে?'

পায়েল মাথা নাড়ে, 'জানতাম না, এটুকু শুধু জানতাম এই জানলাটা কেউ ভিতর থেকে জ্যাম করে দিয়েছে, নিজে থেকে হয়নি।'

'কিন্তু কালীমন্দিরে তো যে কেউ যখন খুশি যেতে পারে, বাড়ির একটা জানলা ঢেকে কী লাভ হবে?'

বাইরেটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায় পায়েল, খোলা জানলা দিয়ে ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলে, 'পৃথিবীতে যত সমস্যা আছে তার প্রায় সবকটাই একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমাধান হয়ে যায়। কালকের ঘটনায় সেই দৃষ্টিকোণটা হল এই জানলাটা। খুনি সেটাকেই আটকে দিতে চেয়েছিল।'

বিস্ময়ের ভাবটা কেটে একটা হতাশা এসে জমা হয় কলির মুখে, 'এখন আর জানলা দিয়ে তাকিয়ে কী লাভ, আর তো কিছু বোঝা যাবে না।'

পায়েল মুখ তুলে একটা চাপা হাসি হাসে, 'কে বলেছে? এই জানলাটা থেকে একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।'

'কী ব্যাপার?'

'এ খুনটা করেছে এই বাড়ির কেউ। টু বি মোর প্রিসাইস, এমন কেউ যে মাঝে মধ্যেই এই ঘরে আসে।'

আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে আসে কলির মুখে, গায়ে একটা শিরশিরানি হাওয়া

এসে লাগে তার। সেটা লক্ষ করে তার কাঁধে একটা হাত রাখে পায়েল, 'লিসেন বাডি, ভয়ের কিছু নেই। আমরা জানি খুনটা বাড়ির কেউ করেছে। কিন্তু পুলিশ জানে না। ওদের চোখে জাস্ট একটা বন্ধ ঘরের ভিতরে একটা মার্ডার হয়েছে, যেটা দুর্ভাগ্যবশত এই বাড়ির পাশে। বাড়ির লোকজনকে বেশি ঘাঁটাবে না ওরা। কিন্তু কাল বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে কে কোথায় ছিল সেটা জানতে চাইবে, কে কী বলল সেটা খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারবি?'

কলি মাথা নাড়ে, 'একটু কাঠখড় পোড়াতে হবে। তাও পারব।'

'বেশ, আর ওই সময়ের মধ্যে কারা কারা মন্দিরের দিকে গেছিল সেটাও জানা দরকার।'

'ওটা চাপ হবে না। ভবেনদা বাইরেই বসে ছিল। জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।'

'আর একটা কথা।'

'কী?'

'পুরোহিত মশাই আজ সকাল থেকে খোঁড়াচ্ছেন, একটু জিজ্ঞেস করিস তো কী হয়েছে পায়ে?'

(চার)

'তিনটে থেকে চারটে?' ডাক্তার উপল দেবনাথকে একটু বিভ্রান্ত দেখায়, সামলে নিয়ে বলেন, 'মনে হয় রোগী দেখছিলাম।'

সামনে রাখা সাদা পাতার উপরে একটা আঁক কাটেন গোস্বামী, গালে হাত ঘষতে ঘষতে বলেন, 'একবারও ওঠেননি মাঝখানে?'

কয়েক সেকেন্ড সময় নেন ডাক্তার, 'বাথরুমে গেছিলাম দু-তিনবার, সেটা যদি ধরেন...'

'কত সময় লেগেছিল?'

উপল দেবনাথের গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফোটে, 'টয়লেট করতে গেছিলাম স্যার। ওই যতক্ষণ লাগে। দু-তিন মিনিট।'

'বেশ, কাল কতজন রোগী দেখেন মোট?'

'আমার চেম্বার ওই ধরুন বারোটা থেকে ন-টা অবধি খোলা থাকে। কাল মন্দিরের দরজা খোলার ব্যাপারটা ছিল বলে আটটায় বন্ধ করে দিই। তার মধ্যে না হলেও জনা পঞ্চাশেক দেখেছি।'

'তারপর?'

'তারপর উঠে ভবেনের সঙ্গে কালীমন্দিরের দিকে যাই।'

একটু সময় নিয়ে পরের প্রশ্নটা করেন গোস্বামী, 'তিনটে থেকে চারটের মধ্যে যেসব রোগী আপনার চেম্বারে এসেছিলেন তাঁদের নাম আছে আপনার কাছে।'

'ভবেনের কাছে থাকবে স্যার। রেজিস্ট্রি খাতা ওই সামলায়।'

চেয়ারের ভিতরে আরও কিছুটা ঢুকে বসেন গোস্বামী, হাতদুটোকে ভাঁজ করে থুতনির সামনে নিয়ে আসেন, 'ডেডবডিটা দেখার পর কিছু অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি?'

এই প্রথম একটু উদ্বিগ্ন দেখায় ডাক্তারকে, তার গলকণ্ঠটা একবার ওঠানামা করে, চারপাশটা ভালো করে দেখে নিয়ে বলেন, 'ছেলেটাকে ওইভাবে রেখে কেউ আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল।'

'মানে?' গোস্বামীর ভুরুটা কুঁচকে যায়।

ডাক্তার আরও গলা নামিয়ে বলেন, 'শ্যামাদার মুখে গল্প শুনেছি বাইরের কেউ যখের ধন খুঁজতে এলে যখেরা তাকে গলা কেটে খুন করে দেহটা ইংরেজি ক্রসের মতো ছড়িয়ে রাখে। মানে দুটো হাত আর দুটো পা দু-দিকে ছড়িয়ে। ওটাই নাকি ওদের ওয়ার্নিং—এখানে এসো না, এলে এই অবস্থা হবে। আমরা সবাই ছোট থেকে এসব গল্প শুনে আসছি। তাই ছেলেটাকে ওই বিশেষ ভঙ্গিতে দেখেই প্রথমে ভয় পেয়ে যাই।'

'আপনাদের ভয় আর শক ফ্যাক্টরটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছে খুনি? তাই তো?' বিড়বিড় করে বলেন গোস্বামী। কয়েক সেকেন্ড সেইভাবেই চুপ করে বসে থাকেন। মাথা তুলে বলেন, 'বেশ, আপাতত আর কিছু জানার নেই। পরে দরকার পড়লে আবার বিরক্ত করব না হয়।'

ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে গুম মেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন গোস্বামী। এতক্ষণে বিকেল নামতে চলেছে। একটা গোটা দিন পার হয়ে যাচ্ছে প্রায়। অথচ পুলিশ রুটিন প্রোটোকলের বাইরে একপাও এগোতে পারেনি। কোনওভাবে যদি ধরেও নেওয়া যায় ছেলেটা মাধবচন্দ্রের লুকানো ধনসম্পত্তির গল্প শুনে ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল, তাহলেও বাইরে সিল করা দরজা দিয়ে সে ঢুকল কেমন করে? এবং আর একটা আস্ত মানুষ সেই ঘরে ঢুকে তাকে খুন করেই বা চলে গেল কী করে? তবে কি কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের দরজা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেছে? কিন্তু তাই বা কী করে হয়। পুলিশের তদন্তকারী টিম নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে ওই সিল পঞ্চাশ বছরে খোলা হয়নি। মন্দিরের কোথাও কোনও হিডেন প্যাসেজ নেই। তাহলে?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কিছুটা হেঁটে এসে আবার মন্দিরের দিকে তাকান গোস্বামী। পুকুরপাড়টা চোখে পড়ে তাঁর। পুকুরের ঘাটে একটা লোক বসে আছে। তাকে ঘিরে দু-দিকে দুটো অল্পবয়সি মেয়ে। কাছে এগিয়ে লোকটাকে চিনতে পারেন, পুরোহিত শ্যামাপদ চক্রবর্তী। সতর্ক চোখে ফাতনার দিকে চেয়ে আছেন শ্যামাপদ, ইন্সপেক্টরকে এগিয়ে আসতে দেখে পাশের একটা মেয়ে হালকা খোঁচা দেয় তাকে। অন্য মেয়েটি তার চেনা। সে স্মিত হাসে। গোস্বামী শ্যামাপদর পাশটায় বসতে বসতে বলেন,

'সকালে দেখলাম আপনি খোঁড়াচ্ছিলেন, পড়ে গেছেন কোথাও?'

'ওই রোয়াক থেকে নামতে গিয়ে পা হড়কে...'

'ডাক্তার দেখিয়ে নিন, কোথা থেকে কী হয়ে যায়।'

মিহি হাসেন শ্যামাপদ! মুখ দিয়ে অর্থহীন শব্দ করেন একটা। মাঝে মাঝে কয়েকটা বড়সড় মাছ পুকুরের জলে ঘাই মেরে যাচ্ছে। জলের কলকল শব্দ ভেসে আসছে, সেই সঙ্গে একটা ঠান্ডা জোলো হাওয়া। মাথাটা একটু শান্ত হয় গোস্বামীর।

'কাল বিকেলে কোথায় ছিলেন আপনি?'

শ্যামাপদর ছিপের ফাতনা নড়ে উঠল একবার, টান মারলেন না, 'ঠাকুর ঘরে, পুজো করছিলাম।' জলের দিকে তাকিয়েই তিনি বলেন!

'মাঝে ওঠেননি একবারও?'

দু-দিকে মাথা নাড়েন শ্যামাপদ, 'পুজো করতে করতে উঠি না আমি। ওতে দেবতা রুষ্ট হন।'

'পুজো শেষ হয় কখন?'

'সাড়ে সাতটায়।'

'তারপর মন্দিরের কাছে চলে যান?'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'আনন্দ আমার সঙ্গে ছিল।'

'আপনি যখন সেখানে পৌঁছন তখন কারা কারা ছিল সেখানে মনে আছে?'

এবার একটু সময় নেন শ্যামাপদ, 'লাহিড়ী ছিল বলে মনে পড়ছে। ডাক্তার আর ভবেন তখনও আসেনি।' কলির দিকে দেখিয়ে বলেন, 'ওর বাবার সঙ্গেও দেখা হয়, তবে সেটা একটু পরে।'

'ডেডবডিটা মনে হয় আপনিই প্রথমে দেখতে পান।'

ছিপে একটা সটান টান মারেন শ্যামাপদ, নাঃ মাছ নেই। ফাতনাটা নড়েওনি, বোঝা যায় কিছু একটা কারণে উত্তেজিত হয়েছেন তিনি, এই প্রথম গোস্বামীর দিকে ঘুরে বসে ঝাঁঝালো স্বরে বলতে থাকেন, 'সুবীরকে আমি আগেই বলেছিলাম, কৃষ্ণাদ্বাদশীতে যজ্ঞ করে অপদেবতার দোষ খণ্ডন করতে। তাতে মন্দিরটা খুলতেও হত না। কে শোনে কার কথা? এ বাড়িতে কিছুদিন হল অধর্ম হয়ে চলেছে। আমি জানতাম দরজা খুললে কিছু না কিছু অনিষ্ট ঘটবেই।'

'অধর্ম! কীরকম অধর্ম?' প্রথম মুখ খোলে পায়েল।

নিজের রাগটা একটু শান্ত করার চেষ্টা করেন শ্যামাপদ, 'আজ এক সপ্তা হল আমার গোপালের গয়না চুরি হয়ে যাচ্ছে।'

'সেকি! সেগুলো তো প্রায় দেড়শো বছর আগেরকার!' কলি অবাক হয়ে যায়।

'সে গয়না আমি সব ব্যাঙ্কের লকারে ফেলে রেখেছি প্রায় বছর পাঁচেক।

যে গয়না ঠাকুরের গলায় পরা ছিল সেগুলো সোনার নয়। তার দামও বেশি নয়, তাও... ঠাকুরের গলা থেকে গয়না চুরি! ছিছিছি...

'কখন হয় চুরিগুলো?' আবার প্রশ্ন করে পায়েল। কিছু একটা কারণে তার ভুরু দুটো ভয়ানক কুঁচকে আছে। 'রাতে... আমি বরাবর বারোটার মধ্যে দরজা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তিনদিন সকালে উঠে দেখেছি গোপালের গয়না নেই।'

'দরজা বন্ধ থাকলে চোর ঢোকে কোথা দিয়ে?' কলি প্রশ্ন করে।

দু-দিকে মাথা নাড়েন শ্যামাপদ, 'জানি না। দরজা একবার বন্ধ করে দিলে আর বাইরে থেকে খোলা যাবে না। জানলা খুলে শুই বটে কিন্তু জানলায় তো গ্রিল দেওয়া। গ্রিলের ফাঁক ইঞ্চি চারেকের বেশি হবে না। তার মধ্যে দিয়ে ঢোকা জ্যান্ত মানুষের কম্ম নয়।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল পায়েল, এমনসময় ওদের ঠিক পিছন দিকে ঝোপের মধ্যে থেকে একটা খসখস শব্দ ভেসে আসে। যেন একটা চারপেয়ে প্রাণী গাছের আড়ালে লুকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওদের কথা শুনছিল। এবার অসাধানতায় শুকনো ডালের উপরে পা পড়েছে তার। ওরা তিনজনেই পিছন ফিরে তাকায়।

গোস্বামীর মনে হয় একটা জমাট অন্ধকার গাছের ভিতর থেকে দ্রুত সরে গেল ভিতরের দিকে। ঝোপের উপরে পায়ের শব্দ হল, মুহূর্তে মিলিয়ে এল শব্দটা।

'কে, কে ওখানে?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই দ্রুত সেই দিকটা লক্ষ্য করে দৌড় দিলেন গোস্বামী, তার পিছু নিল পায়েল আর কলি। এই দিকটায় গাছের গুঁড়িগুলো বেশ চওড়া, কিছুদূর গিয়ে আরও ঘন হয়েছে গাছের সার। তার মধ্যে দিয়ে কিছুটা ছুটে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়লেন ইন্সপেক্টর গোস্বামী। হাঁটুর উপরে দুটো হাত রেখে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে লাগলেন তিনি। পায়েল আর কলি চারদিকটা দেখার চেষ্টা করল, নাঃ আর দৌড়ে লাভ নেই। কীসের পিছনে দৌড়াচ্ছে সেটাই জানা নেই, গাছের ফাঁক দিয়ে কেবল মাত্র পাতলা একটা অন্ধকারকে মিলিয়ে যেতে দেখেছে ওরা।

ইন্সপেক্টর গোস্বামীর ফোনটা বেজে উঠেছে, হাঁপাতে হাঁপাতেই সেটা

বের করে কানে চেপে ধরলেন, এপাশ থেকে একদিকের বয়ান শোনা গেল শুধু

—বলো সুজন...

—রিয়েলি!

—হোয়াট অ্যাবাউট হিজ প্যারেন্টস...?

চারদিকটা ভালো করে ঘুরে দেখছিল পায়েল। সবুজ ঘাস আর তার উপরে বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা গাছের ডাল সরিয়ে সে যেন কিছু খুঁজছে। কলি তার কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'খুঁজছিস কিছু?'

'গন্ধ পাচ্ছিস একটা?' পায়েলের চোখ অস্থির হয়ে উঠেছে।

'কীসের গন্ধ?'

'কেরোসিনের।'

দু-বার নাক টানে কলি। হ্যাঁ, খুব ক্ষীণ একটা গন্ধ আসছে। সেটা কেরোসিনের হতেই পারে! হঠাৎ পাশে তাকিয়ে পায়েলকে দেখতে পায় না সে। নিচে তাকাতেই অবাক হয়ে যায়। মাটির উপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী যেন হাতে নিয়ে দেখছে মেয়েটা। কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে নাকি?

উঁকি মেরে কলি দেখে পায়েলের হাতে কালচে রঙের ধুলো জাতীয় কিছু।

ভালো করে দেখে সে বুঝতে পারে জিনিসটা আর কিছু নয়, ছাই।

পায়েল ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়, 'এখানে কিছু একটা জিনিস পুড়িয়েছিল কেউ, তারপর পোড়া ছাইটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। গোটা জায়গাটা জুড়ে উড়ন্ত ছাই পড়ে আছে। দিস ইজ গেটিং স্পুকি।'

ফোনটা এতক্ষণে আবার পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছেন গোস্বামী। তিনি মেয়েদুটোর দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'তোমরা বাড়ি ফেরো তাড়াতাড়ি। বাকিদের ইন্টেরোগেট করার ছিল, হবে না। তাড়াতাড়ি থানায় যেতে হবে।

'কিছু হয়েছে স্যার?' পায়েল জিজ্ঞেস করে।

'ছেলেটাকে আইডেন্টিফাই করা গেছে। সামনেই একটা বস্তিতে থাকত। মাথায় একটু ছিট ছিল, রাতবিরেতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বনেবাদাড়ে পড়ে থাকত। দিন দুয়েক আগে এরকমই রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মিসিং। বাড়ির লোক ডায়েরি করেনি।'

'মাথায় ছিট ছিল, তাই বোধহয় গরমকালেও ফুলহাতা জামা পরে ঘুরে বেড়াত...' বিড়বিড় করে পায়েল।

কথাগুলো বলতে বলতে ইন্সপেক্টরের গলার স্বর নেমে আসে, কিছুটা স্বগতোক্তির মতোই বলেন, 'এমন অদ্ভুত খুন জীবনে দেখিনি আমি। কোনও মোটিভ নেই, কোনও লিড নেই, সবার স্পষ্ট এলিবাই আছে, এমনকী খুনটা করা অবধি সম্ভব নয়... অথচ খুনটা হয়ে গেল...'

'সবার এলিবাই আছে কী করে বুঝলেন?'

কপাল থেকে ঘাম মোছেন গোস্বামী, 'একটু আগে ভবেন বলে ছেলেটা জানিয়েছে দুপুরের পর থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাউকে বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখেনি সে। লাহিড়ীবাবু দুপুরে তাস খেলতে গেছিলেন, তিনটের আগেই বাড়ি ফেরেন, তারপর স্নানখাওয়া করে সাড়ে চারটে নাগাদ ঘুমোতে চলে যান, একাধিক সাক্ষী আছে ডাক্তারবাবু রোগী দেখছিলেন গোটা সময়টা। মাঝে মিনিট দুয়েকের জন্য বাথরুমে গেছিলেন। রোগীদের অবশ্য জিজ্ঞেস করা হয়নি, আর ঠাকুরমশাই তো বললেন পুজোয় বসেছিলেন।'

'আমার বাবা?' কলি জিজ্ঞেস করে।

গোস্বামীর মুখে একটা আলগা হাসি খেলে যায়, কলির মাথায় একটা হাত রেখে তিনি বলেন, 'সেটা তুমি জিজ্ঞেস করে নিও না হয়। আমি খবর নিয়ে নিয়েছি। তবে আমার মনে হয় না সাধারণ কেউ এর সঙ্গে যুক্ত আছে বলে...'

'আচ্ছা যে ছেলেটা খুন হয়েছে তার বাড়ির লোক কী বলছে?'

'বাপ-মা থাকলে তো বলবে। অনাথ বাচ্চা। কাকার কাছে থাকত। গ্রামে খেলা-টেলা দেখিয়ে বেড়াত। ছোটখাটো হাত সাফাইয়ের খেল। একবার কোনও এক সার্কাস দলের সঙ্গে পালিয়েছিল। সেখান থেকেই শিখেছিল সেসব খেলা...'

'এমন একটা ছেলেকে কার মারার দরকার পড়ল?' নিজের মনেই বিড়বিড় করে পায়েল।

ফেরার পথ ধরেন ইন্সপেক্টর। তার পিছন পিছন পায়েল আর কলিও

বেরিয়ে আসে। শ্যামাপদ এর মধ্যে উঠে গেছেন। পুকুরের ধারে তাঁর ছিপটা গাঁথা আছে। সেটা পিছনে রেখে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে কলি বলে, আমার তো মনে হয় না খুনিকে ধরা যাবে বলে। খুন তো নয়, যেন স্টেজের উপর ম্যাজিক দেখছি...'

'হুম... কিছু একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছে পায়েল।

'শুধু স্টেজের পিছনের গ্রিনরুমে কে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না।'

কথাটা বলে কয়েক পা এগিয়ে গেছিল কলি। পিছন ফিরে দেখে পায়েল থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে, 'দাঁড়িয়ে গেলি কেন রে?'

'কী বললি তুই, আবার বল... থমথমে গলায় বলে পায়েল। একটা দুর্দান্ত ঝড় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তার গলায় আটকে গেছে।

'কী আবার বললাম,' একটু ভেবে নেয় কলি, 'বললাম গ্রিনরুমে কে আছে সেটাই বোঝা যাচ্ছে না... আরে আমি লিটারেচারের স্টুডেন্ট, একটু অ্যালিগোরি...'

'অ্যান্ড দ্যাট অ্যালিগোরি জাস্ট সল্‌ভড দিস ক্রাইম।' এগিয়ে এসে কলির কাঁধটা খামচে ধরে পায়েল। তার চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কিছু উচ্চারণ করে চলেছে সে, 'পায়ের ছাপ, ওই ছবিটা... সব মিলে যাচ্ছে.. ওঃ গড... কী ভীষণ চালাক!'

'মানে! কে চালাক?'

'যে লোকটা খুন করেছে...' মুখ নামিয়ে বলে পায়েল।

'তুই জানিস কে খুন করেছে?' কলি আঁতকে ওঠে।

'জানি।'

'কে?'

'ম্যাজিশিয়ান...' একটা মিহি হাসি হেসে বাড়ির দিকে এগোতে থাকে পায়েল।

(পাঁচ)

'রাসেল সিলভার সিন্ড্রোম।' ছাদে হাঁটতে হাঁটতে বললেন ডাক্তার উপল দেবনাথ, জন্মগত রোগ, হাত-পায়ের বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না। শরীর সাংঘাতিক রোগা হয় এদের। তুমি যার কথা বলছ সে সম্ভবত এই রোগে ভুগছে। এ অঞ্চলে কারও ও রোগটা আছে বলে শুনিনি আমি। অবশ্য আরও দু-তিনজন ডাক্তার আছে, তবে তাদের কাছে গিয়ে লাভ নেই কিছু।'

ভোরে উঠে ছাদে পায়চারি করাটা ডাক্তারের বহুদিনের অভ্যাস। দোতলায় সুবীর চৌধুরীর ঘর থেকে পুরনো বাংলা গানের সুর ভেসে আসছে। প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখনও বাড়িটাকে ঘিরে কুয়াশার চাদর কাটেনি।

'কেন লাভ নেই?'

'রাসেল সিলভার সিন্ড্রোম কেন হয় সেটাই এখনও বোঝা সম্ভব হয়নি, ভারি রেয়ার আর গোলমেলে রোগ।'

এই প্রসঙ্গটাতেই আসতে চাইছিল পায়েল, 'সিক্সটি ফাইভে দরজা খোলার পর যে রোগটা ছড়িয়ে পড়ে সেটার মতো?'

হাঁটা থামিয়ে এবার রেলিয়ের উপরে বসে পড়েন ডাক্তার। বলেন, 'দেখ পঞ্চান্ন বছর আগে ঘরটা যখন খোলা হয় তখন আমাদের বেশিরভাগের জন্মই হয়নি, যাদের হয়েছিল তারাও বছর দশেকের তখন। ফলে ঘরটা খোলার সময় তাদের ধারে কাছে আসতে দেওয়া হয়নি। তখন ঘর খুলে কী পাওয়া গেছিল সেটা আজ কেউ জানে না, লোকে বলে ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকা যখ দরজা খোলায় কুপিত হয়। ফলে বাইরে বেরিয়ে এসে অবাধে লোক মারতে থাকে। এই যখের ব্যাপারটা বুলশিট হলেও সে সময়ে লোক যে মারা যাচ্ছিল সেটা হিস্টরিক্যাল ফ্যাক্ট। আমার যতদূর মনে হয় ঘরের ভিতর কোনও ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি হয়েছিল। যারা ঘরে ঢোকে তারা সম্ভবত তাতে আক্রান্ত হয়েই... খানিকটা সেই তুতেন খামেনের সমাধির মতো...'

পায়েল কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে উদাস হয়ে, তারপর বলে, 'গ্যাস? আচ্ছা

এমন তো হতে পারে—দুশো বছর আগে একটি শিশু অজানা কোনও রোগে আক্রান্ত হয়, ধরে নিন ইউরোপে টিউবারকুলোসিসের মতো এখানে এই রোগটাকে নিয়েও কিছু কুসংস্কার চালু ছিল। ছেলেটিকে শয়তান-টয়তান কিছু একটা বলে এই ঘরের ভিতরে আটকে দেওয়া হয়। সে বদ্ধঘরে মারা যায়, এমনকী হতে পারে যে তার শরীরের জীবাণুটা দেড়শো বছর পরেও জীবিত ছিল?'

বেশ জোরে হেসে ওঠেন ডাক্তার, 'সুপারফিশিয়াল, থিয়োরিটিক্যালি সম্ভব হলেও বাস্তবে হতে পারে না। শরীর ডিকম্পোজ হচ্ছে মানে কোটি কোটি ব্যাকটিরিয়া জমা হয়েছে সেখানে। তার দেড়শো বছর পরে একটা বিশেষ ব্যাকটিরিয়ার জেগে ওঠা শুধুমাত্র সায়েন্স ফিকশনেই সম্ভব। তবে যে রোগই হোক না কেন, মানুষ পিঁপড়ে না হয়ে গেলে কারও পক্ষে ও মন্দিরের দরজা না খুলে ভিতরে ঢোকা সম্ভব না।'

'মন্দির না, আমি ভাবছি পুরোহিতমশাইয়ের জানলার কথা। কাল বিকেলে জঙ্গলের ভিতর ছেলেটাকে এক পলকের জন্যে দেখেছিলাম, ছুটে পালিয়ে গেল। ছেলেটার যা চেহারা মনে হল গয়না চুরির ব্যাপারটা সে ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব না।' পায়েল চিন্তিত মুখে বলে।

আচমকাই হাঁটা থামিয়ে দেন ডাক্তার, দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসেন পায়েলের দিকে, বলেন, 'শ্যামাদা গয়না চুরির ব্যাপারটা আমাকেও বলেছিলেন কিন্তু, তখন অতটা কান দিইনি... জানলা-দরজা খুলেই শুই আমি... কাল রাতে...

'কী হয়েছে কাল রাতে?'

'আমার ফোনটা চুরি গেছে...' ডাক্তারকে বিমর্ষ দেখায়, 'দরকারি জিনিসপত্র ছিল ওতে।'

'সেকি! ঘরের ভিতর থেকে?'

'হ্যাঁ, কাল দুপুরে টেবিলের উপরে রেখে স্নানে ঢুকেছিলাম... তখনই...'

'কল করলে কী বলছে?'

'সুইচড অফ, যে নিয়েছে সে কি আর খোলা রাখবে?'

তাকে আশ্বাস দেয় পায়েল, 'চিন্তা করবেন না। ছেলেটার রোগটা যখন

আইডেন্টিফাই করা গেছে তখন ফোনটা উদ্ধার হয়ে যাবে, অবশ্য এতদিনে যদি না বেচে দিয়ে থাকে....'

ফোনের হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় বেশ উদ্বিগ্ন দেখায় ডাক্তারকে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে চলে যান। পায়েলও ধীরে ধীরে নিচে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

এখানে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালে গ্রামের বেশ কিছুটা অংশ চোখে পড়ে। কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া গরুর গাড়ি, বট গাছের নেমে আসা ঝুরিতে টায়ার বেঁধে দোল খাওয়া ছেলেমেয়ের দোল, উবু হয়ে বসে রোদ পোহানো বুড়ো, ভারি সরল জীবন। এদের জীবনে কুয়াশা কেবল ভোরটুকুর জন্যই স্থির হয়, একটু রোদ উঠলেই আবার ঝকঝক করে চারিদিক। পায়েলের মাথার ভিতরেই কুয়াশা কেটে গিয়েছে। পিছনে কলিদের ঘর থেকে ভেসে আসা গানের সুরে তার মনটা হালকা হয় যায়।

দরজা খোলার শব্দে পিছনে ফিরে সে দেখে সুবীর চৌধুরী দাঁড়িয়ে আছেন, তাকে দেখে একগাল হাসি খেলে যায় ভদ্রলোকের মুখে, 'এই বয়সে ভোরে ওঠার অভ্যাসটা আছে, বাঃ বাঃ...'

পায়েল হাসে, 'না কাকু, আমি আটটার আগে বিছানা ছাড়ি না, আজ উঠেছিলাম কুয়াশা দেখব বলে। গ্রামের কুয়াশা আমার খুব ভালো লাগে।'

'বেশ, তা এখন তো কুয়াশা নেই আর, এসো, ঘরে এসো।'

পায়েল ঘরে এসে ঢুকতে গানটা বন্ধ করে দেন চৌধুরী, পায়েল একটা চেয়ার খুঁজে নিয়ে বসতে বসতে বলে, 'বেশ তো চলছিল, বন্ধ করলেন কেন?'

'তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েরা তো এই গান শোনে না। তাই ভাবলাম... ভালো কথা, কাল আমাদের এখানে বড় হাট বসবে, ভবেনকে বলে দেব ও তোমাদের ঘুরে আসার ব্যবস্থা করে দেবে।'

পায়েল করুণ হাসি হাসে, 'আমি কাল সকালে চলে যাচ্ছি কাকু, ট্রেন আছে।'

'সেকি!' বিমর্ষ দেখায় চৌধুরীকে, 'তোমাকে তো ভালো করে আপ্যায়নই করা হল না, আসলে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল.... '

‘পরের ছুটিতে আবার আসব না হয়। ইন্সপেক্টর গোস্বামীর নম্বর আছে আপনার কাছে?’

শেষ প্রশ্নটার জন্যে তৈরি ছিলেন না চৌধুরী। তিনি একটু থতমত খেয়ে বলে, ‘হ্যাঁ আছে, কিন্তু তুমি কী করবে?’

‘একটু দিন না, ক-টা কথা বলার আছে।’ অনুরোধের স্বরেই কথাটা বলেছে পায়েল, তাও প্রচ্ছন্ন একটা দাবি মিশে ছিল তাতে। নিজের ফোনে গোস্বামীর নম্বরটা ডায়াল করে এগিয়ে দেন চৌধুরী। পায়েল হাসিমুখ ফোনটা নিয়ে ভিতরের ঘরের দিকে পা বাড়ায়, ওপাশ থেকে রিং হতে থাকে।

কলির মায়ের ঘরে এসে দাঁড়ায় পায়েল। কালীমন্দিরের দিকের জানলাটা বন্ধ ছিল, সেটা খুলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে গলার আওয়াজ শোনা যায়

—হ্যাঁ চৌধুরীদা, বলুন!

—বাচ্চা ছেলে, হাইট সাড়ে চারফুটের কাছাকাছি, ঘন কালো গায়ের রং, ভয়ানক রকম পাতলা শরীর, সম্ভবত রাসেল সিল্‌ভার সিন্ড্রোম নামের কোনও রোগে ভুগছে, এই গ্রামেই থাকে, খুঁজে বের করুন প্লিজ।

—কে বলছেন আপনি?

ইন্সপেক্টরের গলায় স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ,

—আমার নাম পায়েল রায়চৌধুরী। ছেলেটিকে না পাওয়া গেলে আজ সন্ধের আগেই আর একটা খুন করবে সে।

—মানে আপনি বলেছেন সেই খুন করেছে?

—প্লিজ হারি....

(ছয়)

রাত ঘন হয়ে আসছে। আনন্দ আর কলি বাইরের বাগানে দোলনাটার সামনে একটা চেয়ার পেতে বসেছিল। খানিক পরে সদর দরজা খুলে পায়েল বেরিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করতে করতে বলে, ‘তোদের এই বাড়িটা শালা পুরো বোর্ডিং স্কুলের মতো।

এতগুলো ঘর, একটাতেও হুড়কো লাগিয়ে একটা সিগারেট খাওয়ার উপায় নেই।'

কলি পায়েলকে চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে দোলনায় গিয়ে বসে অল্প অল্প দুলতে শুরু করে। মিঠে হাওয়া ভেসে আসছে দূর থেকে। পায়েলের সিগারেটের ধোঁয়া সেই হাওয়ায় মিশে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

আনন্দ মুখ নিচু করে বসেছিল চেয়ারে। মুখ না তুলেই বলে, 'এ বাড়ির আর কিছুই আগের মতো নেই। চোখের সামনে লোকগুলো কেমন পাল্টে গেল।'

'কাউকে সন্দেহ হয় তোমার?' কলিই প্রশ্ন করে।

'এলেন কোথা থেকে আমার ভজা গোয়েন্দা...' মুখ বাঁকায় পায়েল। তারপর সিগারেটটা আনন্দর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'বিড়ির জাস্ট উপরের স্টেজ, চলবে তো?'

আনন্দ হেসে সিগারেটটা ঠোঁটে লাগায়, তারপর বড় করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'বাচ্চাটার হদিশ পাওয়া গেছে শুনলাম। বড় কাকা বলছিলেন...'

'হু, দেখেছিলে তুমি আগে?'

'তা ওই বারকয়েক। আমাদের বাড়ি এসেছিল খেলা দেখাতে। তাছাড়া ছেলেটা ভালো পাখি ধরতে পারত। তরতর করে গাছে উঠে যেত... আর গলা দিয়ে নানারকম প্রাণীর ডাক...'

'ইন্টারেস্টিং, ধরে নেওয়া যায় মন্দিরের দিক থেকে যে ভূতপ্রেতের ডাকগুলো আসত সেগুলো এই ভদ্রলোকেরই কীর্তি। এখন হয় ও নিজেই ভয় দেখানোর জন্য এসব করত নাহয় কেউ লোভ দেখিয়ে ভাড়া করেছিল। আচ্ছা, মন্দিরটা খোলায় কার লাভ হতে পারে?'

আনন্দ হাসে, 'মন্দিরে যে কিছু নেই সে সবাই জানত। কার আর কী লাভ হতে পারে...'

'মানে নিছক ভয় দেখানো। কিন্তু ভয় দেখাতে গিয়ে বেচারা নিজেই শেষে যখের হাতে...' হঠাৎ কী ভেবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে পায়েল, তারপর বলে, 'চলো, একবার মন্দিরটা দেখে আসি...'

'এখন! এই রাতের বেলায়!' কলি আঁতকে ওঠে।

'আ রে আমার বীর মারাঠা, দিনের বেলা যক্ষ তো তোমায় হামি দিতে আসবে না।'

'কিন্তু এখন গিয়ে লাভ কী? সেদিনই তো গেলাম সবাই মিলে...'

'দ্যাটস দ্যা পয়েন্ট। একাকিত্ব মানুষকে ভাবার সুযোগ দেয়। আনন্দদা, তুমি এসো তো। ও এখানেই দুলুক...'

আনন্দ আপত্তি করে না। ওরা তিনজনেই সরু রাস্তাটা ধরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসে। আজ জায়গাটা আশ্চর্যরকম নিস্তব্ধ লাগছে। আকাশের গায়ে ঝলমলে চাঁদ উঠেছে। তার নরম রূপালি আলো মন্দিরের এবড়োখেবড়ো সিমেন্টের উপর যেন তরলের মতো শুয়ে আছে। তিনজোড়া পায়ের আওয়াজ শোনা যায় মাটির উপর।

মন্দিরের দরজার দিকে এগোয় না পায়েল। বরঞ্চ দরজার সামনে পৌঁছে পেছন ফিরে বাড়িটার দিকে চেয়ে থাকে। একসময় চোখ খুলে আনন্দের দিকে চেয়ে বলে, 'সেদিন তুমি এখানেই দাঁড়িয়েছিলে, তাই না আনন্দদা?'

আনন্দ একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ ওখানটাতেই তো মনে হচ্ছে...'

'আমি আর কলি দাঁড়িয়েছিলাম ওই দূরটায়, তাই তো? মন্দিরের একদম সোজাসুজি পেছনে চাঁদ উঠেছিল...' শেষ কথাগুলো বিড়বিড় করে বলে পায়েল।

'দরজা খোলার পর কী হয়?'

'কী আবার? সবাই মিলে ভিতরে ঢোকে...'

'উঁহু, তার আগে একটা ছোট ঘটনা ঘটেছিল। কারও খেয়াল নেই মনে হয়।'

'কী?'

'হ্যাঁ মনে পড়েছে...' কলি বলে ওঠে, 'টর্চ হারিয়ে গেছিল। আনন্দদার হাতে টর্চ ছিল কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিল...'

'হ্যাঁ, আসলে...' আনন্দ মনে করার চেষ্টা করে, 'মনে হয় কেউ টর্চটা পেছন থেকে নিয়ে নিয়েছিল আমার হাত থেকে। অত দৌড়াদৌড়ির মধ্যে সামান্য

একটা টর্চ কে নিচ্ছে আমি আর গা করিনি...'

'তক্ষুনি পাওয়াও যায় টর্চটা...'

'হুম...' পায়েলের ভুরু দুটো আবার কুঁচকে গেছে, 'মানে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলোর অভাবটা দরকার ছিল কারও...'

'কিন্তু তাতে লাভ কী? দরজার সামনে আলো ছিল। অতগুলো লোক দাঁড়িয়েছিল দরজায়, বাইরে থেকে কেউ ভিতরে ঢোকেনি...'

'অন্য আলোর সঙ্গে টর্চের আলোর একটা পার্থক্য আছে...' কেমন যেন থমথমে গলায় বলে পায়েল।

'তুই কী করতে চাইছিস বল তো?' কলি জিজ্ঞেস করে।

'ম্যাজিকটা কী করে দেখানো হল সেটাই ভাবছি...' ঠোঁটের উপর আঙুল রাখে পায়েল। কথাটা বলেই দোতলার একটা ঘরের জানলার দিকে আঙুল তুলে দেখায় পায়েল, 'এমন একটা ম্যাজিক যেটা তোর মায়ের ঘরের জানলা থেকে কেউ দেখলেই ফাঁস হয়ে যেত। অর্থাৎ ম্যাজিকটা ছিল কেবল মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার জন্য... মানে... কলি তুই জ্যামিতিতে চোতা সাপ্লাই করতিস না? তোর কী মনে হচ্ছে...'

'কী মনে হবে আবার... এটুকু মনে হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে...'

'অ্যাঙ্গেল?' কী যেন ভেবে একটু থতমত খায় পায়েল। ওর দু-চোখে অদ্ভুত একটা ঝিলিক খেলে যায়।

'তুই কি কিছু...' কলি প্রশ্নটা করতে পারে না। তার আগেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে অদ্ভুত একটা ইশারা করে ওকে চুপ করতে বলে পায়েল। তারপর নিচু গলায় বলে, 'মন্দিরের ভিতর থেকে একটা শব্দ এল না? শুনলি?'

'শব্দ! কীসের শব্দ?' কলি অবাক হয়ে তাকায়।

'কে যেন ডাকছে আমাদের... একটা বাচ্চা ছেলে...' পায়েলের গলাটা অদ্ভুতরকম শীতল আর থমথমে শোনায়।

'এই বাজে ইয়ার্কি মারছিস তুই...'

'কই আমি তো কোনও শব্দ...' আনন্দ বলতে গিয়েও থেমে যায়। পায়েল ওর মোবাইলটা হাতে তুলে নিয়েছে। তার ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলে আলোটা

ফেলেছে মন্দিরের দরজার ভিতরে। ভিতরে কিছুই চোখে পড়ছে না। আলোটা সামনে ধরেই পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় সে। একসময়ে ভিতরের অন্ধকারে হারিয়ে যায় তার শরীর।

কয়েক সেকেন্ড দম বন্ধ করে চেয়ে থাকে ওরা। পরমুহূর্তে ভিতর থেকে ভেসে আসা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ওদের পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে দেয়।

দ্রুত কলি ছুটে যেতে চায় সেদিকে। কিন্তু আনন্দ তাকে থামিয়ে দেয়। এতক্ষণে বাড়ির ভিতর থেকে উপল আর সুবীরবাবু বেরিয়ে এসেছেন। ডাক্তার এক ছুটে মন্দিরের সামনে এসে পড়েন, 'কী হয়েছে আনন্দ? কীসের চিৎকার?'

'ওই দিদি ভিতরে গেলেন, বললেন কার যেন ডাক শুনতে পারছেন...'

'এসো আমার সঙ্গে...'

আনন্দের সঙ্গে ডাক্তার দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢোকে। ঢুকতেই দেখে মেঝের উপরে পড়ে আছে পায়েল। তার শরীরটা অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে। ডানহাতে তখনও ধরা আছে মোবাইলটা। তার ফ্ল্যাশলাইট থেকে বেরিয়ে আসা আলোতেই উদ্ভাসিত হয়ে আছে মন্দিরের গর্ভগৃহ।

'ফিট হয়ে গেছে, সম্ভবত ভয় পেয়ে...' এগিয়ে গিয়ে পায়েলের একটা হাতের কবজির কাছটা চেপে ধরে ডাক্তার। অন্য হাতটা ধরে আনন্দ। মেয়েটার নাড়ি বোঝার চেষ্টা করে উপল। অস্বাভাবিকরকম বেড়ে গেছে নাড়ির গতি।

'বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলো...' আনন্দের দিকে চেয়ে নির্দেশ দেয় ডাক্তার। কিন্তু তার দরকার পড়ে না। তার আগেই পায়েলের মুখের রং ফিরতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে। তারপর উঠে দাঁড়ায়।

'সেদিন কিছুটা এইভাবেই পড়েছিল বডিটা, তাই না?'

একটু হকচকিয়ে যান ডাক্তার উপল দেবনাথ, 'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তার মানে...'

'আপনি আর ভবেন দু-জনে ঠিক এইভাবেই তুলে নিয়ে যান বডিটা?'

'তুমি ভিতরে কী দেখেছিলে দিদি?' আনন্দ থমথমে গলায় জিজ্ঞেস করে।

'একটা ছেলে...'

এতক্ষণে কলিও ঘরের ভিতরে ঢুকে এসেছে। শেষ কথাটা তার কানেও গেছে, চাপা গলায় প্রশ্ন করে সে, 'কিন্তু এ ঘরে কোনও ছেলে তো নেই...'

'জানি, চলে গেছে...'

মেঝে থেকে উঠে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়ায় পায়েল। তার হাবভাব ভারি অদ্ভুত লাগে কলির। এর আগে কোনওদিন পায়েলকে এমন বিচিত্র আচরণ করতে দেখেনি সে।

'মনে হয় আদৌ কিছু দেখেনি...' বিড়বিড় করে বলে আনন্দ।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে... তাহলে কেন খামোখা...'

বাইরে এসে পায়েলের হাঁটার গতি আরও বেড়ে যায়। কলি দ্রুত পায়ে এগিয়ে ধরে ফেলে তাকে। তারপর শক্ত গলায় প্রশ্ন করে, 'তুই সত্যি দেখেছিলি ছেলেটাকে?

'হ্যাঁ...' হাঁটতে হাঁটতেই উত্তর দেয় পায়েল।

'কী বলল সে তোকে?'

'কে খুন করেছে, আর কেন খুন করেছে...'

সাত

দুপুর শেষ হয়ে আসছে এতক্ষণে। চৌধুরীবাড়ির ঠাকুরদালানে এসে জড়ো হয়েছে বাড়ির বাসিন্দারা। সেই সঙ্গে পুলিশের একটা ছোটখাটো দল দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। বাড়ির সদর দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের একটা এসইউভি। তার ভিতরে কিছু আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

পাশাপাশি বেঞ্চগুলোর বড়টাতে বসেছেন সুবীর চৌধুরী, ডাক্তার দেবনাথ আর আনন্দ, তার ঠিক পাশে ছোট বেঞ্চে সুবর্ণ লাহিড়ী ও শ্যামাপদ চক্রবর্তী। এদের থেকে খানিক দূরে একটা চেয়ারে বসেছে ভবেন। ঘনঘন কপালের ঘাম মুছছে সে!

দালানের একেবারে মাঝামাঝি হাঁটুদুটো মাটির উপরে রেখে বসেছিল পায়েল, তার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে কলি। একটু আগে কিছু একটা বলছিলেন

ইন্সপেক্টর গোস্বামী। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দলটাকে নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাঁকে। পায়েল পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'খুনি কি গাড়িতে আছে?' আনন্দ এসইউভির দিকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে লাহিড়ীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তুমিও যেখানে আমিও সেখানে!'

'ছোকরার মুখটা দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'ছুকরিও হতে পারে...' গম্ভীর গলায় বলেন ডাক্তার দেবনাথ।

ঘড়ির দিকে তাকালেন চক্রবর্তী। কিছু বললেন না।

কিছুটা হেঁটে এদের সামনে এগিয়ে এল পায়েল, কবজির উল্টোদিক দিয়ে নাকটা ঘষে নিয়ে বলল, 'সেকেন্ড ইয়ারে আমাদের কলেজে ভলতেয়ার পড়ানো হয়েছিল, তো সেটা পড়তে গিয়ে একটা কথা ভারি মনে লেগেছিল আমার—

'It is forbidden to kill— therefore all murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets.

মানে সব খুনিরাই শাস্তি পাবে, এক যদি না সে একসঙ্গে বহু মানুষকে খুন করে, আর দুই, খুনের শব্দকে শিঙে ফোঁকার আওয়াজে ঢেকে ফেলতে পারে। গত পরশু এ বাড়িতে যে খুনটা হয়ে গেছে তাতে খুনি এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।'

'কই আমরা তো তেমন আওয়াজ শুনতে পাইনি কিছু।' সুবীর চৌধুরী বলে ওঠেন।

পায়েল হাসে, 'ওটা তো অ্যালিগোরি, মানে খুনি কোনও একটা পদ্ধতিতে আপনার আমার চোখের সামনে একটা ইলিউশন তৈরি করেছে। আমরা ভাবছি আমরা খুনটাই দেখছি, অথচ খুনের বদলে দেখছি একটা ম্যাজিক-স্টেজ শো।'

একটু আগে দালান জুড়ে একটা গুঞ্জন উঠেছিল, এবার সেটা থেমে গেল, পায়েল বলে চলল, 'যেকোনও ভালো ম্যাজিশিয়ান প্রথমেই দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চান, যাতে সে তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে সতর্ক না হতে

পারে, কখনও সেটা মিউজিক, কখনও সুন্দরী নারী, এক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল একটি শিশুর গলাকাটা দেহ। বলা বাহুল্য মন্দির খুলে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর আপনাদের কারও মাথাই ঠান্ডা থাকার কথা নয়, খুনি ঠিক এইটাই চেয়েছিল। ম্যাজিকের ফার্স্ট রুল, ডিস্ট্র্যাকশন। পঞ্চাশ বছর পরে খোলা একটা ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত বাচ্চার মৃতদেহ এত বেশি করে আতঙ্কিত করল আপনাদের যে একেবারে অপ্রয়োজনীয় কয়েকটা অসঙ্গতির কথা মাথাতেই ছিল না আপনাদের...

যেমন এক, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েনি। কয়েক সেকেন্ড থম হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই। তার মধ্যেই অন্য কেউ ঢুকে পড়তে পারে ঘরে...'

'ধুর...' আনন্দ বিরক্ত গলায় বলে ওঠে, 'তা কী করে ঢুকবে? ঘরে না ঢুকলেও অন্তত জনা পঞ্চাশেক লোক দরজার সামনেই দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল... যথেষ্ট আলোও ছিল...'

'আলো ছিল বাইরে। মন্দিরের দরজার ভিতরে কোনও আলো ছিল না তখন। থাকার সম্ভাবনা ছিল যদিও, তাও বিশেষ একটা কারণে থাকেনি। দরজা খোলার পরেই সবাই খেয়াল করে আনন্দদার হাতে টর্চ নেই। সম্ভবত মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য টর্চটা ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়েছিল কেউ। কিন্তু কেন? তিরিশ সেকেন্ডের এই উইন্ডোটায় মন্দিরের ভিতরে জমাট অন্ধকারটা কি সাহায্য করছিল খুনিকে? কী ঘটছিল সেখানে?'

পায়েল কপাল থেকে চুল সরিয়ে মৃদু হাসে, 'আচ্ছা, সে কথায় পরে আসছি... আগে আমরা সবাই সেদিন যেটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম সেটার দিকেই তাকাই... বাচ্চার রক্তাক্ত মৃতদেহ... শক ফ্যাক্টর...

একে পঞ্চাশ বছর পরে খোলা যক্ষের ঘর, তার উপরে রক্ত, তার উপরে বাচ্চা। ট্রিপল শক, বলা বাহুল্য যে কারও নার্ভ ঠান্ডা করে দেবে... ম্যাজিকের প্রথম ধাপ।'

পিছিয়ে আসে পায়েল, নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলতে থাকে, 'আসুন আমরা ফিরে যাই সেই ম্যাজিকের রাতে, যেদিন পঞ্চাশ বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া

একটি ঘর খুলে আমরা আবিষ্কার করি কয়েক ঘণ্টা আগে মৃত একটি শিশুর দেহ, অসম্ভব, তাই না?

সেদিন রাতে দুটো জিনিসে খটকা লাগে আমার। প্রথম, পায়ের ছাপ। আপনারা খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন মন্দিরের চারপাশটা অল্প ঢালু, বর্ষাকালে চাতালে পড়া জল গড়িয়ে গিয়ে মন্দিরের আশপাশে জড়ো হয়। তারমানে ঘাস কাটার পর মন্দিরের লাগোয়া মাটি অন্য অংশের মাটির চেয়ে বেশি নরম হবার কথা। অথচ সেদিন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর যে পায়ের ছাপগুলো পড়েছিল সেগুলো দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি গ্রামবাসীদের পায়ের ছাপের থেকে কম গভীরতার, কেন?

দ্বিতীয় খটকাটা ভারি সহজ, আপনারা যে কেন সেটা ভাবেননি সেটাই প্রশ্ন, যে মৃতদেহটা আমরা দেখি তার গলা কেটে খুন করা হয়েছিল। রক্ত তার বুকে এমনকী পেটে লেগে থাকার কথা, কিন্তু তার গোটা মুখে রক্ত লেগে থাকবে কেন? তরলের ধর্ম উপর দিকে ওঠা নয়। তাহলে? খুনি ছেলেটিকে খুন করার পর তার মুখেও রক্ত মাখিয়েছিল? কী লাভ তাতে?

লাভ একটাই, কেউ তার মুখ আড়াল করতে চেয়েছিল। কিন্তু কেন? মৃতদেহ ফরেনসিকে যাবে, মুখ আড়াল করে কী লাভ হবে খুনির? একটু ভাবতেই উত্তর মাথায় আসে আমার। ফরেনসিকে যাবার আগেই মৃতদেহ বদলে দিতে চায় খুনি। সে শুধু দরজা খোলার পর কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দর্শককে বোঝাতে চেয়েছিল যে মৃতদেহ কয়েক ঘণ্টা ধরে ওই ঘরেই পড়ে আছে। এরপর কোনও এক সময়ে মৃতদেহ বদলে দেয় সে...'

'তাই যদি হয়...' একটু চিন্তা করে বলে আনন্দ, 'সেই মৃতদেহটাকেই বা সে ঘরে ঢোকাল কী করে?'

পায়েলের মুখে একটা চেরা হাসি ফুটে ওঠে, 'যদি বলি মৃতদেহ ওই ঘরে একবারও ঢোকেনি? যে ঢুকেছিল এবং যাকে আপনারা স্ট্রেচারে করে দালানে এনে শুইয়ে দেন সে জীবিত মানুষ..'

'কিন্তু তা কী করে হয়?' ইন্সপেক্টর মুখ খোলেন এবার, 'যতই অভিনয় করুক না কেন, শরীরে রাইগার মরটিস কী করে...'

আচমকা ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে আসে পায়েল, তার গলার ভিতর থেকে যেন আগুন উঠে আসতে চাইছে, 'কে বলেছিল দেহে রাইগার মরটিস সেট ইন করেছে? একমাত্র কে স্পর্শ করে তাকে? কে তাকে দালান অবধি স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসে? একমাত্র কার কাছে সুযোগ ছিল মৃতদেহ পাল্টে দেওয়ার?'

'ডাক্তার উপল দেবনাথ...' শব্দটা বেরিয়ে আসে গোস্বামীর মুখ দিয়ে।

পায়েল আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সামনে এগিয়ে আসে, তিনি এতক্ষণে মুখ নিচু করে বসেছেন। হাত দুটো হাঁটুর উপরে স্থির।

'বাকি ঘটনা আপনিও বলতে পারেন, বলবেন নাকি ডাক্তারবাবু?'

'কিন্তু ডাক্তার তো একা ছিলেন না বডির সঙ্গে, ভবেন ছিল তো।'

'ডাক্তার জানতেন মৃতদেহ আবিষ্কারের পর পুরোহিত, বৃদ্ধ, মাসলম্যানকে সরিয়ে তিনিই হর্তাকর্তা হয়ে উঠবেন। বাকি কাজ তাঁর নির্দেশেই হবে। হয়ও তাই... যাক গে, দ্বিতীয় অসঙ্গতি। আপনারা সবাই ভাবছিলেন বডি কখনও একা ছিল না। অন্তত দু-জন সারাক্ষণ গার্ড দিয়েছে তাকে, তাই তো? এটা শুনুন মন দিয়ে...'

পকেট থেকে ইন্সপেক্টরের ভয়েজ রেকর্ডারটা বের করে একটা বিশেষ অংশ চালিয়ে দেয় পায়েল, ভবেনের গলা ভেসে আসে, 'আমরা দু-জনেই ধরাধরি করে স্ট্রেচারে করে তুলে এখানে নিয়ে এসে শুইয়ে দিই... ওইটুকু ছেলের অত রক্ত, আমার গাটা কেমন করছিল, একটা চাদর এনে চাপা দিয়ে দিই... তারপর থেকে ওইভাবেই ছিল স্যার...'

'খেয়াল করুন, ভবেন মিনিট খানেকের জন্য হলেও যে মৃতদেহের সামনে ছিল না তা এই রেকর্ডিংয়ের মধ্যেই বলা আছে। সে সময়ে ঠাকুর দালানে কাউকে ভিড় করতে বারণ করেছিলেন ডাক্তার। তাছাড়া সবাই মন্দিরের কাছে ভিড় করায় দালানের আলোও জ্বলছিল না। মাত্র দু-মিনিটের উইন্ডো। আমার ধারণা চাদর আনতে যাওয়ার আইডিয়াটা ডাক্তারই ঢোকান ওর মাথার ভিতরে... ভবেনের চাদর আনতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসে, সে দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে ডাক্তারের ঘরে। ঘরের দরজার কাছে

পড়ে থাকা সত্যিকারের মৃতদেহ কোলে করে তুলে এনে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেন ডাক্তার, দু-মিনিট পরে ভবেন ফিরে এসে চাদর চাপা দেওয়ার সময় বুঝতেও পারে না এরমাঝে মৃতদেহ বদলে গেছে।'

কয়েক সেকেন্ডের একটা নীরবতা গ্রাস করে দালানটাকে। পায়েল আবার বলতে থাকে, 'এবার আসি এই নাটকের মঞ্চসজ্জায়, মানে খুনের দিন সকালের পর থেকে। আচ্ছা...' পকেট থেকে একটা ছবি বের করে টেবিলের উপরে রাখে পায়েল, তারপর বলতে থাকে, 'দেখুন তো এই ছবিটার সঙ্গে আপনাদের সেদিন রাতে দেখা মন্দিরের দরজার কোন তফাত আছে কি না?'

খুব একটা উৎসাহ দেখায় না কেউ, কলি এগিয়ে এসে ছবিটা হাতে নেয়। বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকেও কিছু বুঝতে পারে না সে। তারপর দরজার দিকে চোখ পড়তেই উত্তরটা খেলে যায় চোখের সামনে, 'আগে দেখে চোখে পড়েনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ছবিটায় দরজাটা একটু বড় দেখাচ্ছে।'

'এক্সাক্টলি, সেদিন রাতে দরজাটা যে স্বাভাবিকের তুলনায় ছোট লাগছে সেটা আপনারা কেউ বুঝতে পারেননি। কারণ দরজার তলার দিকটা এই পঞ্চাশ বছরে আপনারা যতবারই দেখেছেন ততবারই বেড়ে ওঠা ঘাসে ঢাকা ছিল। অসঙ্গতিটা চোখে পড়ার কথা নয়।

দরজার তলার সঙ্গে কিছু একটা কারসাজি যে আছে সেটা আমি বুঝতে পারি একটা ঘটনা থেকে, ঠাকুরমশাই, খুনের পরদিন একেবারে কাকভোরে পুলিশের চোখ এড়িয়ে আপনি মন্দিরে ঢুকতে যান। সম্ভবত মাধবচন্দ্রের সম্পত্তির লোভ বা নিছক কৌতূহল টেনে আনে আপনাকে, তখনই পা মচকে যায়, তাই তো?

শ্যামাপদ চক্রবর্তী মাথা নাড়েন, কথা ফোটে না তাঁর মুখে।

'পা মচকে যাওয়ার কারণ খুব সহজ। আগের দিন রাতে ঘরে ঢোকার সময় উনি জানতেন না ঘরের মেঝে চৌকাঠ থেকে কতটা নিচুতে। উনি সাবধানে পা রাখেন। ওনার অবচেতন মনের হিসেবে ধরা হয়ে যায় যে ঘরের মেঝে চৌকাঠ থেকে অন্তত ছ-ইঞ্চি নিচে। কিন্তু পরদিন সকালে ঘরের

মেঝে কোন অলৌকিক উপায় পাঁচ ইঞ্চি উপরে উঠে এসেছে, উনি ভুলভাবে পা রাখতে যান ও স্বাভাবিকভাবে পা মচকে যায়।'

কিন্তু তা কী করে হয়? ঘরের মেঝে উপরে উঠে আসতে পারে না। আমি বুঝতে পারি রাতে মন্দিরের দরজার ঠিক সামনেটায় এমন কিছু রাখা ছিল যেটা সকালের আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়। পায়ের ছাপের কথাটা মাথায় আসে আমার, বুঝতে পারি সে রাতে মন্দিরের দরজার সামনের জমিটা ছিল ফেক, সম্ভবত একটা বিশেষ ভাবে তৈরি শক্তিশালী প্লাইউড, আকার অনেকটা ইংরেজি সাত নম্বরটাকে শুইয়ে দিলে যেমন হয় সেইরকম। যার উপরে মাটি ও কাটা ঘাসপাতার প্রলেপ লাগানো ছিল, খেলার মাঠে পাতা অ্যাস্ট্রোটার্ফের মতো। কাল রাতে আবার মন্দিরের সামনে গিয়ে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয় আমার কাছে। একটা শব্দ মাথায় আসে আমার, অ্যাঙ্গেল।

মাটির সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম কোণে শোয়ানো সেভেন আকৃতির প্লাইউড পাতা থাকলে মাটিটা যে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠেছে সেটা প্লাইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ বুঝতে পারবে না। বোঝা যাবে কেবল অনেকটা উপর থেকে। ছায়ার পার্থক্য থেকে।

ফলে প্লাইটা রাখা হয়েছিল ঢালের মতো করে, ঢালের উঁচু দিকটা দরজার ঠিক সামনেটায় উন্মুক্ত হয়, সরু দিকটা মাটির সঙ্গে মেশে। মন্দিরের সামনে বৈদ্যুতিক আলো নেই, ছিল ক-টা হ্যারিকেন আর টর্চ, আলো-আধাঁরিতে কারও খটকা লাগে না। কই নিয়ে আসুন....'

পুলিশের দুটো লোক এসইউভি থেকে একটা বছর বারোর ছেলেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় সকলে। একটা মানুষের শরীর এত পাতলা হতে পারে! ঘন আবলুশ কাঠের মতো গায়ের রং।

সে এগিয়ে আসতেই পায়েল তাকে দেখিয়ে বলে, 'আপনারা বোধহয় বুঝতে পারছেন কেন সেদিন মৃতদেহকে ফুলহাতা জামা পরাতে হয়েছিল। যে ছেলেটি সত্যি খুন হয়েছে তার তুলনায় এই ছেলেটি প্রায় কয়েক গুণ রোগা। রক্ত দিয়ে মুখের আদল ঢেকে দিলেও সরু সরু হাত-পা ঢাকবে কী করে? তাই ফুলহাতা জামা... ফুলপ্যান্ট!'

ছেলেটিকে টেনে এনে দালানের এককোণে দাঁড় করানো হয়। সে সবার দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নেয়। পায়েল তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার বলতে থাকে, 'সেদিন দরজার সামনের সেই স্লোপটার নিচে এই ছেলেটিই লুকিয়ে ছিল। বলা বাহুল্য ওর চেহারাটা ইঞ্চি পাঁচেকের খোপের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া আশ্চর্য না।

এবার মনে করুন সেদিনের কথা, ভবেনদা দরজা খুলে পাল্লা সরিয়ে ফেলার ঠিক পরে ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ চিৎকার করে বলেন কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে ভিতরে ঢুকতে। আপনারা দরজা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েন। টর্চ না পাওয়া ভিতরে আলোও ফেলা যায় না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার।

কিন্তু এই কয়েক সেকেন্ডেই ম্যাজিকের আসল ট্রিকটা ঘটে যায়। আপনাদের পায়ের ঠিক নিচে প্লাইউডের তলায় লুকিয়ে থাকা ছেলেটির সামনেও তখন দরজা খুলে গেছে। ও খোপের ভিতর থেকে নেমে আসে মেঝেতে। তারপর গুঁড়ি মেরে গিয়ে ঘরের ঠিক মাঝবরাবর শুয়ে পড়ে। গলা আর মুখের মেকআপটা দেওয়াই ছিল। দু-মিনিট পরে আপনারা ঘরে ঢুকে ভূত দেখেন, চিৎকার করে ডাক্তারকে ডাকেন। ডাক্তার জানতেন রক্ত দেখে আগে তাঁকেই ডাক দেবেন আপনারা। তিনি এসে রাইগার মরটিস ও আরও হাবিজাবি কিছু বলে একটি জীবন্ত শরীরকে মৃত ঘোষণা করেন।'

'কিন্তু ও তক্তার নিচে ঢুকল কখন?'

'সম্ভবত বিকেলের একটু পরে, তখনও লোক আসা শুরু হয়নি, ফাঁকাই পড়ে ছিল চত্বরটা। প্লাইউডটা মন্দিরের পিছনেই রাখা ছিল হয়তো। ওকে থার্ড পারসন কেউ সাহায্যও করে থাকতে পারে।'

'তাহলে আসল খুনটা হয় কোথায়?'

'এই বাড়িতেই।' পায়েল ডাক্তারের দিকে ফেরে, 'যে ছেলেটি খুন হয়েছে তাকে .আগের দিন রাতে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়িতে ধরে আনেন ডাক্তার। সারাদিন অজ্ঞান হয়ে ডাক্তারের ঘরেই পড়েছিল সে। তিনটে থেকে চারটের মধ্যে রোগী দেখতে দেখতে দু-বার ওঠেন তিনি। ধারালো স্কাল্পেল দিয়ে

অচৈতন্য শিশুর নলি কাটতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। খুনটা করে ফিরে এসে তিনি আবার রোগী দেখতে থাকেন। আর ওদিকে মন্দিরের সামনে ম্যাজিকের স্টেজ সাজাতে থাকে এই ছেলেটি।

সকাল থেকে আর একটা কাজ করেছিলেন ডাক্তার। লেট মিসেস চৌধুরীর ঘরে গিয়ে জানলাটা জ্যাম করে রেখে এসেছিলেন। কারণ মন্দিরের দরজার সামনের মাটি হঠাৎ স্লোপ হয়ে উপরে উঠেছে সেটা মাটিতে দাঁড়িয়ে বোঝা না গেলেও ওই অ্যাঙ্গেল থেকে সহজেই ধরা পড়ে।

সেদিন মৃতদেহ উদ্ধারের পরে মন্দিরের সামনে থেকে লোকজন সরে যেতেই ছেলেটি কোন এক ফাঁকে ফিরে এসে প্লাইয়ের স্লোপ সরিয়ে নেয়, জঙ্গলের কোথাও টেনে নিয়ে গিয়ে সেটাকে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে ফেলে, ছাইটা বাতাসে উড়িয়ে দেয়।'

'কিন্তু ছেলেটার কী লাভ এতে?' সুবীর চৌধুরী প্রথম মুখ খোলেন।

পায়েল কাঁধ ঝাঁকায়, 'বলা মুশকিল, রাতে ঠাকুরমশায়ের ঘরে চুরি করতে গিয়ে ডাক্তারের হাতে ধরা পড়ে সে। তার পাতলা চেহারার সুবিধাটা বুঝতে পেরেই ডাক্তারের মাথায় আসে আইডিয়াটা, কিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জানি না। টাকাপয়সা মেবি, ওর রোগটা সারিয়ে দেবার লোভও দেখিয়ে থাকতে পারেন।

কাল বিকেলে কলি আমাকে বলে এই সমস্ত ব্যাপারটা একটা নাটকের মতো, যার গ্রিনরুমে কে আছে আমরা জানি না। এই গ্রিনরুম শব্দটা শুনেই খুনের একমাত্র সম্ভাবনাটা মাথায় আসে, অনেক সময় ম্যাজিশিয়ানরা যে গ্রিনরুম ব্যবহার করেন সেটা থাকে স্টেজের নিচে। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ছিল।

আমি এটা বুঝতে পারি যে সেই গ্রিনরুমে লুকিয়ে থাকার জন্য অসম্ভব রকম পাতলা শরীরের প্রয়োজন। মাথায় আসে, ঠাকুরমশায়ের জানলার ফাঁক গলে গয়না চুরি করে কেউ। আমি বুঝতে পারি এমন কেউ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে ভয়ানক রোগা। কাল বিকেলে জঙ্গলের ভিতরে আমি কিছুই দেখতে পাইনি। আজ ভোরে মিথ্যে করেই ডাক্তারকে বলি একটা কিম্ভুত

রোগা চেহারার ছেলেকে দেখেছিলাম আমি। ডাক্তারের মুখে ভয় ফুটে ওঠে। উনি ছেলেটিকে বাড়ির ধারেকাছেও আসতে বারণ করেছিলেন। আপনারা ওকে আগেভাবে খুঁজে বের না করলে ওকেও খুন করতেন ডাক্তার।

ভালো কথা...!'

আবার ডাক্তারের দিকে এগিয়ে যায় পায়েল, 'আপনার ফোনটা কিন্তু ও চুরি করেনি, করেছে অন্য একজন। সেও উপস্থিত আছে এখানে...'

'কে?' কলি প্রশ্ন করে।

'আমি।' পকেট থেকে ডাক্তারের ফোনটা বের করে দেখায় পায়েল।

'কিন্তু কেন?'

'কেন? এই প্রশ্নটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কাল রাত অবধি উত্তর ছিল না আমার কাছে। মোটিভ কুয়াশার মতো ঢাকা পড়েছিল।

জানি না কেন প্রথম থেকেই ডাক্তারের উপর সন্দেহ হয় আমার। একমাত্র উনিই মৃতদেহের সঙ্গে কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও একা ছিলেন। পরশু রাতে ডাক্তারের ঘর থেকে ওর ফোনটা নিয়ে আসি আমি, একটা সন্দেহ কাজ করছিল আমার মাথায়, কাল সকালে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করি, ডাক্তার বলছেন দেড়শো বছর পরে ব্যাক্টিরিয়ার জেগে ওঠা বিজ্ঞানের ভাষায় অসম্ভব। অথচ কালীমন্দিরে পঞ্চাশ বছর আগে দরজা খোলার সময় ঠিক সেই ব্যাপারটাই ঘটেছিল, এদিকে ডাক্তারের একটুও অবাক লাগেনি তাতে?

আমি সিদ্ধান্তে আসি অবাক ডাক্তারের অনেকদিন আগেই লেগেছে, এবং সম্ভবত সেই কারণেই নিজের চেম্বার করার বদলে এখানে ভাড়া থাকেন তিনি। মাধবচন্দ্রের ধনদৌলত নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল না। গ্রাম্য জমিদার, কত সোনাদানাই বা রেখে যাবেন? ডাক্তার জানতেন ওই কালীমন্দিরের ভিতরে লুকিয়ে আছে তার থেকে অনেক বড় রত্নভাণ্ডার, এমন কোনও ব্যাকটিরিয়া যে জল বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়েকশো বছর হাইবারনেশনে থাকতে পারে।'

কিন্তু তাই বলে একটা বাচ্চাকে খুন করবেন কেন ডাক্তার? আরও বেশি টাকার লোভ দেখালেই তো হত। এই হিসেবটা কিছুতেই মিলছিল না আমার কাছে। ফলে ডাক্তারের ফোনটা চুরি করতে হয় আমাকে। সেটা করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি, কিন্তু মুশকিল হয় ডাক্তারের ফোন পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড। খুলব কী করে? ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি খাটাই আমি।

কাল রাতে মন্দিরের ভিতর থেকে আমার চিৎকার শুনে ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে আসেন। ডাক্তার আর আনন্দদা আমাকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে আসেন। আমার ফিট ছাড়াতে আমার হাতের আঙুল চেপে ধরেন ডাক্তার। ঠিক এই জিনিসটার অপেক্ষাই করছিলাম আমি। পাসওয়ার্ড ছাড়া ডাক্তারের ফোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েও খোলা যায়। আমার হাতের উপরেই ডাক্তারের হাত। আঙুলগুলো নড়াচড়ার ফাঁকে ঠিক জায়গায় ঠেলে দিতেই ফোন আনলকড...'

'তার মানে ওই ফোনটা...'

'না, কাল রাতে যে ফোনে ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছিলাম সেটা আসলে ডাক্তারের ফোন। শুধু ব্যাক কভারটা পালটে নিয়েছিলাম। আমার হাতে ধরা ফোনটা যে আসলে ওঁর নিজেরই চুরি যাওয়া ফোন সেটা ডাক্তার স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি...'

'কিন্তু ফ্ল্যাশলাইটটা তুই...'

'ফোনে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালাতে গেলে পাসওয়ার্ড জানতে হয় না...'

এবার পকেট থেকে নিজের ফোনটা বের করে টেবিলের উপরে রাখে পায়েল, কয়েকটা ছবি ফুটে ওঠে পাশাপাশি, 'এগুলো সব ডাক্তারের ফোন থেকে পাওয়া। ছেলেটিকে দিনের পর দিন শারীরিকভাবে নিগ্রহ করতেন ডাক্তার। এই ছবিগুলো ওঁর নিজেরই তোলা... সে সামান্য কিছু খাবার কিংবা টাকাপয়সার লোভে আপত্তি করত না। শেষে একদিন সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারপর অগত্যা...'

ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নিঃশ্বাসের শব্দ সমস্ত ঘরে শোনা যায় এখন।

ইন্সপেক্টরের দিকে ফোনটা এগিয়ে দেয় পায়েল, এই ফোনের মেলবক্স ঘাঁটলে দেখতে পাবেন বিদেশবাসী এক বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে নিয়মিত কথা হত তাঁর। শুধুমাত্র মন্দিরের হদিশ দিলে ডাক্তারের ভাগ্যে কিছুই জুটবে না, তিনি গবেষণা করে ব্যাকটিরিয়ার সম্পূর্ণ তথ্য নিয়ে থিসিস লিখতে চান। কিন্তু ঘর না খুলে সেটা সম্ভব নয়... অগত্যা...'

সুবীর চৌধুরীর দিকে তাকায় পায়েল, 'আপনারা ঘরটা খোলার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন কাকু? মন্দির থেকে ভেসে আসা গোঙানির আওয়াজ আর মরা বেড়ালের রক্তশূন্য শরীর, তাই তো? সেইসব কারসাজি এই ছেলেটিকে দিয়েই করাতেন ডাক্তার, নিজে হাতে সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টানতে শিখিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সে খানিক বোকাসোকা বলে ভুল বোঝাতে পারবেন তাকে, ডাক্তার তাকে বোঝান যে বাড়ির লোককে ভয় দেখানোর জন্যেই কাজটা করছেন তিনি। কিন্তু দু-দিন পরে ছেলেটি বুঝতে পারে ডাক্তারের অন্য কিছু উদ্দেশ্য আছে, যেটা নিছক ভয় দেখানোর মতো নিরীহ নয়। সে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করতে থাকে ডাক্তারকে। শেষে বাড়ির লোককে বলে দেওয়ার ভয় দেখায়। বলাই বাহুল্য সেটা হলে ডাক্তারের সামাজিক সম্মান আর হাইবারনেটিং ব্যাকটিরিয়া দুটোই হাতছাড়া হবে... অতএব তাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, কিন্তু খুনটা হবে কী করে?

ডাক্তার রোগী দেখে রাত করে ফিরতেন, ছেলেটি পুকুরের সামনে জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকত, ডাক্তারকে হেঁটে আসতে দেখলে বুনোলতার ঝোপ নাড়িয়ে সংকেত দিত যে সে এসেছে, দু-দিন সে আনন্দদাকে ডাক্তার ভেবে ভুল করে...

যাই হোক, ডাক্তার বোঝেন রাতে ফেরার পথে জঙ্গলের সামনের রাস্তাতেই ছেলেটিকে একমাত্র খুন করতে পারেন তিনি, কিন্তু সেটা করতে গেলে খুব সহজেই ধরা পড়ে যাবেন, লাশ নিয়ে বেশিদূর যেতে গেলে কারও দেখে নেওয়ার সম্ভাবনা, আবার লাশ বাড়ির সামনে ফেলে রাখলে তিনি শেষ ফিরেছেন বলে তাঁর উপরেই সন্দেহ গিয়ে পড়বে। মাথা খাটিয়ে একটা উপায় বের করলেন তিনি, এমন একটা অ্যালিবাই তৈরি করলেন যাতে শুধু

তিনি কেন এ বাড়ির কারও উপরেই সন্দেহ পড়বে না, বাড়ি খানাতল্লাশিও হবে না।

খুনের আগের দিন রাতে তাকে অজ্ঞান করে ঘরে নিয়ে আসেন ডাক্তার... বাকি ঘটনা আপনারা জানেন.....'

দালানের ভিতরের ভারী বাতাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে এবার। ডাক্তারের দিকে ফিরে তাকিয়েছে সবাই। তিনি যেন মুখ নিচু করে অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পুলিশের দলটার মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে তাঁর কাঁধে একটা হাত রাখেন।

পায়েল রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে একটা বোতল তুলে নিয়ে কিছুটা জল খায়, বোঝা যায় এতক্ষণ কথা বলে গলা শুকিয়ে গেছে তার। জলটা শেষ করে গোস্বামীর কাছে এগিয়ে আসে সে, মুখ নামিয়ে চাপা স্বরে বলে, 'বাচ্চা ছেলেটাকে দু'ঘা দিলেই গড়গড় করে স্বীকার করে নেবে, তবে যা চেহারা তিন ঘা দিলে খাল্লাস হয়ে যেতে পারে। আমার শুধু একটাই রিকোয়েস্ট আছে স্যার।'

'কী?' সরু হাসি হেসে বলেন গোস্বামী।

'আমাকে কোর্টে টানাটানি করবেন না প্লিজ, বাবা জানতে পারলে ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে।'

(আট)

মাটির রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে স্কুটিটা দাঁড় করাল পায়েল। পিচের রাস্তা শুরু হয়েছে। একটা ছোট বাসস্ট্যান্ড। এখানেই স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বাস আসবে। পায়েল আর কলি দু-জনেই স্কুটি থেকে নেমে বাসস্টান্ডের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল।

পায়েলের ব্যাগটা কলির কাঁধে ছিল, সেটা মাটিতে নামিয়ে বলল, 'সবার প্রশ্নের উত্তর দিলি। তাও আমার মাথা থেকে একটা প্রশ্ন যাচ্ছে না।'

'কী প্রশ্ন?'

ডাক্তারকাকা ছোট থেকে আছেন এখানে। কারও খারাপ করেছেন বলে শুনিনি, কারও কারও বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। সেই মানুষটার একটা বাচ্চা ছেলের নলি কাটতে গিয়ে হাত কাঁপল না?'

পায়েল হাতে ধরা সিগারেটে একটা টান দেয়, ভাবুক গলায় বলে, মনে হয় আমাদের সবার ভিতরেই একটা নিষ্পাপ শিশু থাকে, নিজেদের লোভ আর অ্যাম্বিশনের পিছনে ছুটতে গিয়ে সেই শিশুটাকে ঘরে বন্ধ করে মেরে ফেলি আমরা, তারপর সে যখ হয়ে সেই লোভ আর অ্যাম্বিশনগুলোকে আটকাতে থাকে শুধু...'

বাঁকা হাসে কলি, 'মানে বলছিস, তোর ভিতরেও নিষ্পাপ শিশু আছে?'

'নিষ্পাপ শিশু ইজ মাই মিডল নেম... তবে এই সেমেস্টারের শেষে শিশুটা যখ হতে চলেছে...'

'কেন?'

'পড়াশোনার যা হাল, চোতা ছাড়া গতি নেই।'

দু-জনেই হেসে ওঠে। রাস্তার অপর প্রান্তে বাসের হর্ন শোনা যায়। পায়েলের বাস আসছে। মাটিতে পড়ে থাকা ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে এগিয়ে যায়, 'গুড বাই বাড়ি, ক-দিন পরেই কলেজে দেখা হচ্ছে, আসতা লা ভিসতা..!'

বাসের হর্নের শব্দে কলির কথা চাপা পড়ে যায়, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একটা ছোট লাফে বাসে উঠে পড়ে পায়েল।

*** শেষ ***

জাতিস্মর

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সাম্য। পিঠের ব্যাগটা অন্তত কুড়ি কেজির কম হবে না। সকাল থেকে প্রায় না খাওয়া। গত দু-দিন শরীরের উপর ধকল কম যায়নি। তার উপর এই রাতবিরেতে গোটা শহর জুড়ে ছোটাছুটি।

হরিদ্বার শহরের রাস্তায় লোকজন কমে এসেছে। রাত প্রায় এগারোটা। দু-ধারে মিষ্টি আর খাবার-দাবারের দোকানগুলো শাটার নামাচ্ছে একে একে। আলো নিভে অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে শহরটা। সেগুলো ওর উৎসাহের আলোটাকেও যেন নিভিয়ে দিচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে ফোন বেজে উঠতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে একটু দম নিয়ে সেটা রিসিভ করে সাম্য। ওপাশ থেকে বাবার রুগ্ন গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, 'কী রে কোথায় তুই? শুনলাম দাদাদের সঙ্গে খেতে যাসনি?'

'না, আমার একটু কাজ আছে আসলে, আমি পরে খেয়ে নেব...'

'সেকি! কী যেন বাঙালি হোটেল পেয়েছে বলল, তোকে বলেছিল তুই খাসনি!'

'আমাকে আসলে... কিছু কেনাকাটা করতে হবে। ট্রেনে উঠে কিছু খেয়ে নেব...'

'সারাটা দিন না খেয়ে আছিস, এখন খাওয়া ফেলে আবার কী কিনতে হবে তোকে?'

'একটা কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি। কখন থেকে খুঁজছি, কোথাও পাচ্ছি না...'

ওপাশের মানুষটা একটু অবাক হয়, ‘বাবা! তোর আবার ধর্মে-কর্মে মতি হল কবে থেকে? যাক গে, কিনে নিয়ে তাড়াতাড়ি আয়। বারোটা কুড়িতে ট্রেন কিন্তু...’

ফোনটা রেখে একটু চিন্তিত হলেন ভদ্রলোক। মাসখানেক হল ছেলেটার জীবনে কিছুই ঠিক যাচ্ছে না। তিনমাস আগে ওর মা মারা গেল। সে শোক ভুলতে না ভুলতেই বাবার অসুখ ধরা পড়ল। একা হাতেই প্রায় সামলাতে হচ্ছে সংসারটা। একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করত, ক-দিন না যাওয়ায় সেখান থেকেও ছাঁটাই হয়েছে।

আপাতত ক-টা টিউশনি করে সংসার চালাচ্ছে বটে, কিন্তু তেমন করেই বা ক-দিন। পরপর এতগুলো আঘাতেই বোধহয় ছেলেটার মাথায় একটু গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। মাসখানেক হল স্বভাবটাও কেমন পাগলাটে হয়ে গেছে। এই যেমন হরিদ্বারে নেমেই হঠাৎ খাওয়া ফেলে কেন যে বুদ্ধমূর্তি কিনতে ছুটেছে কে জানে।

ছেলেকে একরকম জোর করেই পাহাড়ে ঘুরতে পাঠিয়েছেন। মা মারা যাওয়ার শোকটা তো অল্প কিছু নয়। অন্তত কিছুদিন আশপাশটা বদলে গেলে মন ভালো হলেও হতে পারে। তাই দিন কয়েকের জন্য নিজের খরচেই ডিসেম্বরের শেষে মাসতুতো দাদাদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথে হরিদ্বার থেকে ট্রেন ধরার কথা।

ফোন রেখেই আবার দৌড়াতে থাকে সাম্য। আর চল্লিশটা মিনিট, তারপরই একটা নতুন বছর শুরু হবে। বছরের শেষ একটা ঘণ্টা নিজের শহর থেকে বহু দূরে কাটবে।

চারপাশের দোকানগুলোতে খুঁজতে থাকে ও। হঠাৎ মোড়ের শেষে একটা ছোট দোকানে চোখ আটকে যায়। হ্যাঁ, ওই তো চোখে পড়েছে একটা দোকান। নানান দেব-দেবীর মূর্তি রাখা আছে সাজিয়ে। ও ব্যাগটা ভালো করে পিঠে চাপিয়ে সেদিক লক্ষ্য করে দৌড় দেয়।

দোকানদার বন্ধই করতে যাচ্ছিল দোকানটা। ওকে হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যাগ নিয়ে ছুটে আসতে দেখে থেমে যায়, ‘ক্যা চাহিয়ে বাবু?’

'আপকে পাস বুদ্ধ কা মূর্তি হ্যায়, কালা পাত্থারওয়ালা?'

'হ্যাঁ না, লেকিন কালা পাত্থর তো...'

'কালো পাথরই লাগবে... প্লিজ দেখুন না একটু, আর কোনও দোকান খোলা নেই...'

দোকানদার একটুক্ষণ থম মেরে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। যেন কী একটা পড়ার চেষ্টা করছে লোকটা। কয়েক সেকেন্ড সেইভাবে তাকিয়ে থেকে আবার হাসল সে, তারপর একটা কাঠের সেলফ থেকে কাপড়ে মোড়া একটা ফুট খানেক উঁচু মূর্তি বের করতে করতে বলল, 'আপ ইয়ে লে জাইয়ে...'

কাপড়টা সরাতেই সাম্যের মনটা খুশি হয়ে গেল। ঠিক এরকম একটা মূর্তিই সে চাইছিল। পদ্মাসনে বসে আছেন ধ্যানী বুদ্ধ। কাঁধ থেকে নেমে এসেছে একটা লাল উত্তরীয়। ঠোঁট এতটুকু কাঁপেনি, তাও মনে হচ্ছে মুখের কোণে স্মিত হাসি লেগে রয়েছে। গোটাটাই কালো পাথরের। নিরেট, মখমলের মতো মসৃণ।

'ইয়ে সাড়ে তিন হাজার মে আ জায়েগা...'

দ্রুত পকেট থেকে টাকাটা বের করে এগিয়ে দেয় সাম্য। তারপর আর অপেক্ষা না করে পা বাড়ায় দোকানের বাইরে। পেছন থেকে দোকানদার কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, মৃদু কানে আসে সাম্যের, 'লেকিন ইস মূর্তিকে সামনে...'

অত শোনার সময় নেই সাম্যের। পেটে চনচনে খিদে। তাছাড়া একটা ফোনও করতে হবে। সে মূর্তিটা হাতে ধরেই দোকান ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চলে আসে।

এতক্ষণে রাত আরও গভীর হয়েছে। এ সময় হরিদ্বার শহর ফাঁকা হয়ে যায়। তার উপর এখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। ঠান্ডার কনকনে কামড় রয়েছে। কিছুটা দূরে একটা বাড়ির সামনে এসে তার খোলা চাতালের উপর বসে পড়ল সাম্য। বুদ্ধমূর্তিটা নামিয়ে রাখল পাশে। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল নতুন বছর আসতে আর কুড়ি মিনিট বাকি।

হাসিমুখে মোবাইল ফোনটা বের করে নাম্বার ডায়াল করল সাম্য। অনেকক্ষণ রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে কেউ রিসিভ করল সেটা,

'বলো...' ধাতুর মতো শীতল গলার আওয়াজ।

'বারোটা কুড়িতে আমার ট্রেন।'

'জানি... সাবধানে ফিরো...'

'শোনো না, একটা কথা বলার ছিল...'

'বলো...'

'দেখো জানি অনেক সমস্যা হয়েছে আমাদের মধ্যে। কিছুই আর আগের মতো নেই। এ ক-মাসে আমার জীবনটাও পালটে গেছে কতটা। মা চলে গেল, বাবার শরীরটা... তোমার সঙ্গেও সময়টা ভালো যাচ্ছে না। আমি এসব চাই না বিশ্বাস করো। দেখ...' ঠোঁট চেটে নিজেকে শান্ত করে সাম্য, 'এই বছরটা আর বেশিক্ষণ বাকি নেই। চলো সবটা ঠিক করে নিই...'

ওপাশ থেকে কোনও আওয়াজ এল না। সাম্য নিজেই আবার বলল, 'আচ্ছা। তোমার জন্য একটা জিনিস কিনেছি জানো, তোমার কতদিনের শখ ছিল কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি। হরিদ্বার শহরটা খুব পবিত্র জানো তো, এখান থেকে কেনা মূর্তিও জাগ্রত হয়...'

'ওহ তাই নাকি? তুমি বিশ্বাস করো এসব?'

'না, কিন্তু মনে হল বছরের বাকি সময়টায় তোমার ভালো লাগে এমন কিছু করা উচিত...'

'তুমি চাও আমার এই বছরের শেষটা ভালো হোক?'

'হ্যাঁ...'

'তাহলে ফোনটা এক্ষুনি রেখে দাও... আর কল ব্যাক কোরো না কখনও এখানে...'

গলাটা ধরে আসে সাম্যর, 'এরকম কোরো না প্লিজ। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমাকে সামলানোর মতো, তুমি যদি এভাবে...'

ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার কেঁপে ওঠে ফোনটা। অন্য একটা নম্বর থেকে ফোন আসছে। নম্বরটা চিনতে পারে সাম্য। বকুল

ফোন করছে ওকে। কে জানে ও যন্ত্রণা পেলেই কী করে বুঝে যায় মেয়েটা? এখন হয়তো নিউ ইয়ারে উইশ করতে ফোন করছে। কিন্তু সেটা ধরতে ইচ্ছা করল না সাম্যের।

ফোনটা কেটে নামিয়ে রাখল পাশে। ওর দুটো চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সারা শরীর জুড়ে অসহ্য ক্লান্তি, খিদেটা কখন যেন মরে গেছে। বাড়িও ফিরতে ইচ্ছা করছে না। মাঝরাতে একটা ফাঁকা শহরের অচেনা বাড়ির রাস্তার ধারে বসে দু-চোখ ছাপিয়ে কাঁদতে লাগল সাম্য।

ট্রেন যখন ছাড়ল তখন সাড়ে বারোটা বাজছে প্রায়। আপার বার্থে উলটে শুয়েছে সাম্য। পায়ের কাছে লাগেজের ব্যাগটা আর মাথার কাছে পাথরের বুদ্ধমূর্তিটা রাখা। ব্যাগের ভিতরে জায়গা হয়নি সেটার।

একরাশ প্রশ্ন ভিড় করে আসছে ওর মনে। মায়ের মুখটা না চাইতেও মনে পড়ে যাচ্ছে বারবার। বাবার শরীরটা কি আগের থেকে আরও খানিক খারাপ হল? এত রাত কি ফোন করে দেখবে একবার?

আবার কাঁপছে ফোনটা। আবার বকুলের ফোন। এত কিসের দরকার মেয়েটার। জোর করেই সেটা রিসিভ করে সাম্য। একহাতে নাকটা মুছে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলে, 'হ্যাঁ বল...'

বকুল অন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল, একটু থেমে বলে, 'কী হয়েছে বল তো তোর? গলাটা এরকম কেন?'

'জানি না, আমার ভালো লাগছে না কিছু... রাখছি...'

ওর নিচের বার্থে একটা মারোয়াড়ি শুয়েছে। সে মোবাইলে চটুল হিন্দি গান শুনছে। ওপাশে একটা বাচ্চা মেয়ে। চাদর মুড়ি দিয়ে সেও মোবাইলে মুখ রেখেছে। তার মা-বাপ মনে হয় নিচে শুয়েছে। বাইরে শনশন করে ছুটে চলা ট্রেনের আওয়াজ। ঘরের দিকে ফিরছে ও। কিন্তু কতদূর সে ঘর? অনন্ত সময় এই ট্রেনের ভিতরে শুয়ে থাকলেও ঘরে ফিরতে পারবে?

দু-আঙুলে চোখটা মুছে নিয়ে মাথার দিকে তাকায় সাম্য। কালো পাথরের মূর্তিটা হাল্কা আলোয় এখনও চোখে পড়ছে। আর কেউ নেই এখন কথা

বলার মতো। ও আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে মূর্তিটার হাত তারপর ধরা গলাতেই বলে, 'আমার কষ্ট কবে শেষ হবে বলুন তো?'

বাইরে ট্রেনের আওয়াজ বেড়ে ওঠে। জোরে কথা বললেও কামরার কেউ ওর কথা শুনতে পাবে না।

'আমার জন্য কি কষ্ট হয় না কারও? এত সহজে ছেড়ে চলে যেতে পারে সবাই? আপনিই তো বানিয়েছিলেন আমাকে, কেন এমন কিছু দিলেন না বলুন তো যাতে আমাকে ছেড়ে যাওয়া যেত না?'

হাসি হাসি পাথুরে মুখটার দিকে চেয়ে রাগ বেড়ে ওঠে সাম্যের। যেন ব্যঙ্গ করছে ওকে হাসিটা। মায়ের মরা মুখটা মনে পড়ছে, বাবার রুগ্ন গলার আওয়াজটা মনে পড়ছে, আর একটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া স্পর্শ... মূর্তিটাকে একহাতে আঁকড়ে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যায় নিচে। পরমুহূর্তেই থেমে যায়।

দু-হাতে মূর্তিটা বুকের মধ্যে আগলে রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে সাম্য। কাঁদতে কাঁদতে বিড়বিড় করতে থাকে।

একসময় চোখের জল শুকিয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়ে। সারারাত পাথুরে মূর্তিটা ওর বুকের কাছেই পড়ে থাকে।

কালচে নিষ্প্রাণ অথচ হাস্যময় চোখে ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে আড়াই হাজার বছর আগে জন্মানো বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। তার মুখের হাসি যেন ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়...

(২)

ট্রেনটা দুলে উঠতেই মাথায় কিসের আঘাতে ঘুমটা ভেঙে গেল সাম্যের। মুখ দিয়ে অজান্তেই আওয়াজ বেরিয়ে এল। কপালে হাত ঘষতে ঘষতে চোখ খুলল সে।

ভোর হয়েছে। চারটে বাজতে যায়। ওদের কম্পার্টমেন্টের কারও এখনও ঘুম ভাঙেনি। তবে জানলা দিয়ে বাইরের আলো এসে ভরিয়ে দিয়েছে বগির ভেতরটা।

মুখটা মুছে নিয়ে ও আবার পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পাশের বার্থের

দিকে চোখ যেতেই থমকে গেল। কাল রাতে ও বার্থটা ফাঁকা ছিল। এখন সেখানে একটা লম্বাটে চেহারার লোক পাশ ফিরে শুয়ে আছে। লোকটার গায়ে একটা লালচে শাল গোছের কাপড় জড়ানো। মাথার চুল খোঁপার মতো বাঁধা।

একবার উসখুস করে সোজা হয়ে শুলো লোকটা। শোয়ার ভঙিটা দেখেই চোখ আটকাল সাম্যের। মনে হল লোকটাকে এইভাবে শুয়ে থাকতে ও আগেও দেখেছে। অন্য কোথাও। পেটটা হালকা উঁচু। খাঁড়া নাক, ঘুম ঘুম চোখ, সুঠাম অথচ নরম গড়ন। কোথায় দেখেছে একে?

লোকটা ঝিমোচ্ছে না ঘুমোচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। চারদিকে চেয়ে কোনও লাগেজও দেখতে পেল না ও।

ভাবনাটা মাথা থেকে সরিয়ে আবার পাশ ফিরে শুতে যাচ্ছিল, এমন সময় পাশের বার্থ থেকে একটা তুলতুলে গলার স্বর ভেসে গেল, 'ওরকম ড্যাবড্যাব করে দেখার কী আছে? কাল রাতে অত কান্নাকাটি করে আজকে ভুলে গেলে?'

সাম্য বুঝল কথাটা ওকেই বলা হয়েছে। কিন্তু ও যে কাল রাতে কান্নাকাটি করেছে সে কথাটা লোকটা জানল কেমন করে? তখন তো বার্থটা ফাঁকাই ছিল। তাছাড়া ও কান্নাকাটি করলে আওয়াজ হয় না। ট্রেনের ঝমঝম শব্দে সেটা শোনা যাওয়া তো আরওই অসম্ভব!

'এক্সকিউজ মি, আপনি কথাটা আমাকে বললেন?'

লোকটা কোনও উত্তর দিল না। তেমন নির্বিকারভাবে শুয়ে থাকতে থাকতেই হাতটা আড় করে চোখের উপর তুলে দিল।

উত্তর না পেয়ে সাম্য গলা তুলল, 'আমি কান্নাকাটি করেছি সেটা আপনাকে কে বলল?'

'তুমি কান্নাকাটি না করলে আমাকে ঠেঙিয়ে এতদূর আসতে হত না... হতভাগা ছেলে কোথাকার...' তেমন করে শুয়ে থাকতে থাকতেই কাটাকাটা গলায় কথাগুলো বলল লোকটা।

এতক্ষণ সাম্যের আগ্রহ বেড়ে উঠেছে, সে কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসে বলল, 'এই আপনি কে বলুন তো?'

'তথাগত...'

'মানে বিজেপি করে ওই লোকটা...'

'উঁহু, বুদ্ধ...'

'সে তো সিপিএম করত!' নিচু গলায় বিড়বিড় করে সাম্য, 'শালা এই জন্যই আমার পিসি বলে, সব সিপিএমগুলো বিজেপি হয়ে গেছে...'

'সারাদিন রাজনীতি নিয়ে কচকচ করো বলেই তোমার প্রেমটা টেকেনি হে ছোকরা...' লোকটা তেমনই বাঁকা গলায় বলল।

রেগে মেগে উঠে বসতে যায় সাম্য। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঠক করে ঠুকে যায় বার্থের ছাদে। সেখানে একটা হাত বুলাতে বুলাতে বলে, 'আপনার মতলবটা কী বলুন তো? হ্যাঁ? কাল রাতে কোথায় লুকিয়ে শুনেছেন আমার কথা?'

'লুকাব কেন? তুমিই আমাকে ডাকছিলে, অগত্যা আসতেই হল...'

'আপনাকে! সেতো আমি...' মুখ ফিরিয়ে মাথার কাছে রাখা কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তিটার দিকে তাকায় সাম্য। এখনও একইরকম স্থির হয়ে মাথার কাছে পড়ে আছে সেটা। সেদিকে তাকাতেই একটা ছবি ভেসে ওঠে সাম্যের মাথায়। কয়েকটা সারিবদ্ধ পাহাড়ের ছবি। পাশাপাশি হিমশৈল। এই শৈলশ্রেণির ছবির একটা পোশাকি নাম আছে। একটু আগে ঘুমন্ত লোকটাকে দেখে ওই ছবিটাই মাথায় এসেছিল। অবিকল যেন একই আউটলাইন। নামটা বিড়বিড় করে বেরিয়ে আসে সাম্যের মুখ দিয়ে, 'স্লিপিং বুদ্ধা...'

সাম্যের মুখ থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে আসতেই ওপাশে লোকটা যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসে। এক ঝটকায় সোজা হয়ে কোমরে ভর দিয়ে বাবু হয়ে বসে সে, সরু হাসি খেলে যায় তার টানাটানা চোখে...

'মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনি... আপনি...'

'তো কাল রাতে অত করে আমাকে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে ডেকে আজকে কে আসবে ভেবেছিলে?'

কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তিটার দিকে আবার একঝলক তাকায় সাম্য। এখনও একই ভাবে বসে আছে সেটা। একটা হাত উপর দিকে তোলা। মধ্যমাকে স্পর্শ করে রয়েছে বুড়ো আঙুল। অন্য হাত পেটের কাছে ভাঁজ করা। মুখে সেই মৃদু হাসি। এই মুহূর্তে ওর সামনে বসা লোকটার মুখেও সেই একই হাসি খেলা করছে।

মাথার ভিতর একটা ঝিমধরা ব্যথা শুরু হয়েছে ওর। লোকটা কি পাগল? নাকি ইয়ার্কি করছে ওর সঙ্গে?

মুখ ঘুরিয়ে দেখে সাম্য, ভালো করে লক্ষ করে লোকটাকে। চোখদুটো অবিকল কোরিয়ানদের মতো চেরাগোছের। চিতল হরিণের মতো টানাটানা। ঝট করে দেখলে মনে হয় ঝিমোচ্ছে। সরু পানপাতার মতো মুখ। তিরিশের আশপাশে বয়স। উত্তরীয় ছাড়া ঊর্ধ্বাঙ্গে পোশাক নেই। নিচে একটা লম্বাটে গোছের ধুতি। গায়ের রং টকটকে ফর্সা। হাত পা নাড়া দেখে আদৌ হাড়গোড় আছে বলে মনে হয় না।

সে আবার ঢোঁক গেলে, 'আপনি ইয়ার্কি মারছেন না তার প্রমাণ দিন...'

'মহা মুশকিল তো, তুমি প্ল্যানচেট করে ভূত নামিয়েছ নাকি যে টেবিল নাড়িয়ে প্রমাণ দিতে হবে?'

'তো ভূতের মতো ভগবানেরও তো একটা আইডেন্টিফিকেশন থাকবে, এমনি এমনিই বিশ্বাস করব কী করে?'

লোকটা আবার সেই বাঁকা হাসিটা হাসে, 'তোমাকে কে বলেছে আমি ভগবান ছিলাম?'

'ছিলেন না? তাহলে প্রফেট?'

'ধুর...'

'তাহলে?'

লোকটা হাত উল্টায়, তারপর মাথার খোঁপা ঠিক করতে করতে বলে, 'আমি একটা সাধারণ মানুষ যে একটু দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছিলাম... ব্যস...'

সাম্যের গলায় এবার আকুতি ঝরে পড়ে, 'আমিও তাই চাই, বিশ্বাস করুন।

আপনি যেই হোন আমার কিছু যায় আসে না। শুধু আমাকেও ওই বিদ্যাটা শিখিয়ে দিন... আমার আর দুঃখ পেতে ভালো লাগছে না...'

'বয়ে গেছে...' নির্বিকার গলায় কথাটা বলে লম্বা দুটো পা ঝুলিয়ে ছোট একটা লাফ মেরে নিচে নেমে আসে তথাগত। আড়মোড়া ভাঙে। পিঠ চুলকাতে চুলকাতে লোয়ার সাইড বার্থের দিকে এগিয়ে যায়।

'বয়ে গেছে মানে? মানে আমাকে সাহায্য করবেন না আপনি?'

'আঃ তা কখন বললাম? বললাম আমার সব কথার মূলমন্ত্র ওইটাই, বয়ে গেছে...'

লোয়ার বার্থের জানালাটা দিয়ে ভোরের আলো আসছে ঝলকে ঝলকে। বার্থটা ফাঁকা। তারই এক পাশে গিয়ে বসে করে কী যেন গান ধরে লোকটা। অচেনা লাগে সাম্যের। সাতসকালে ও নিজেই ভুল দেখছে না তো? লোকটাকে সাধারণ মানুষের মতো মোটেই দেখতে নয়। বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে থাকে তার। কী করবে বুঝতে না পেরে শেষে সেও নিচে নেমে আসে।

ট্রেনের ঝমঝম শব্দ আসছে। মিডল বার্থের মাড়োয়ারি লোকটা ঘুমাচ্ছে। ওপাশে বাচ্চা মেয়েটা চাদর মুড়ি দিয়েছে। সাম্যর মনে পড়ে লম্বা লোকটা নিচে নামার সময় বেশ জোরে আওয়াজ হয়েছিল। তাও কারও ঘুম ভাঙেনি কেন? তবে কি সত্যি লোকটা...

নিজের হাতে একবার চিমটি কাটে সাম্য, নাঃ স্বপ্ন দেখছে না। সত্যি একটা বিদঘুটে কিছু ঘটছে ওর সঙ্গে।

বার্থের উল্টোদিকে এসে বসে সাম্য। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তথাগত একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'ব্যাপার কী বলো তো? এত ভগবান, এত ধর্ম থাকতে শেষে আমাকেই ডাকতে হল?' মিহি মখমলের মতো গলার আওয়াজ। এত নরম স্বর এর আগে কোথাও শোনেনি সাম্য।

'আপনার মূর্তিটাই তো ছিল। তাছাড়া কাল রাতে কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। কষ্ট পেলে কি অত ধর্মটর্ম মনে থাকে?'

তথাগত হাঁটুর উপর সরু আঙুল দিয়ে টুকটুক করে দুটো টোকা মারে,

'তা ঠিকই বলেছ, একসময় মানুষের জীবনে রোগ, জরা, গ্লানি ছিল। যুদ্ধ ছিল, ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল, পরিশ্রম ছিল, তাই ধর্ম নিয়ে অত মাতামাতি ছিল না। এখন আরাম আয়েসের জীবন... যাক গে, দরজাটা খোলো তাহলে...'

'কেন দরজা খুলব কেন?'

'এই ট্রেনের ভেতর ভাঙতে গেলে সবার ঘুম ভেঙে যাবে...'

'কী আশ্চর্য! আমি মূর্তিটা ভাঙব কেন?'

'যার জন্য ওটা কিনেছিলে সে ওটা নেবে না। কোনওদিনই নেবে না। তাছাড়া ওটা না ভাঙলে আমি বিদায় নেব কী করে?'

সাম্য কাঁধ ঝাঁকায়, অবাক হয়ে বলে, 'বিদায়! কাল আমার প্রার্থনা শুনে হাজির হলেন আর আমাকে না ঠিক করেই চলে যাবেন!'

লোকটা যেন অবাক হয় একটু, ভুরু কুঁচকে বলে, 'বটে? তুমি দুঃখ কমাতে চাও?' তারপর কী যেন ভেবে একটু উদাস গলায় বলল, 'অনেক বছর হয়ে গেল লোকে আর এসব নিয়ে ভাবে না... দুঃখ কী করে কমবে? মৃত্যুর শোক কী করে ভুলব? রোগের হাত থেকে নিস্তার কী করে পাব? এসব এখন আর কোন সমস্যাই না...'

'যাচ্চলে, তাহলে এখন লোকে কী নিয়ে ভাবে?'

'এই যেমন ধরো কে কী পরবে, কী খাবে, কাকে ভোট দেবে, কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে... এগুলোই আসল সমস্যা...'

সাম্যর ভিতরের দুরুদুরু ভাবটা এতক্ষণে একটু কমেছে। লোকটা যাই হোক, কথাবার্তার মধ্যে একটা বন্ধুত্বের ভাব রয়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে সিটের উপর দুটো পা তুলে পিঠ এলিয়ে বসে সাম্য। তারপর বলে,

'ছোটবেলায় ইতিহাস বইয়ে বুদ্ধর কথা পড়েছিলাম জানেন, তখন মনে হয়েছিল জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে বেশি ফ্যানাতে গিয়েই আপনি ছড়িয়েছেন। অন্য ধর্মের যা পপুলারিটি সেই তুলনায় আপনি তো নস্যি। শুধু ওই পাহাড় ফাহাড়ে গেলে... ভালো কথা, পাহাড়ে আপনার পপুলারিটি বেশি কেন জানেন?'

'কেন?'

'পাহাড়ে এমনিও ভালো খাবারদাবার পাওয়া যায় না। ফলে ওদের এমনিতেও ঘাসপাতা খেয়ে থাকতে অসুবিধা হয় না...'

'বটে? তোমাকে কে বলেছে আমি ভালো খাবার খেতে বারণ করেছিলাম?'

'করেননি? তাহলে কী বলেছিলেন?'

লোকটা টানাটানা হরিণচোখদুটো জানলা দিয়ে বাইরে মেলে দেয়। মখমলের মতো একটা হাত আর একটা হাতের উপর রেখে ঝিমঝিমে গলায় বলে, 'আমি বলেছিলাম যতদিন তুমি ভালোমন্দ খেয়ে জীবনের সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছ যাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জীবনে যদি এমন কোনও দুঃখ আসে যেখানে তোমার সেটাও খেতে ইচ্ছা করেছে না, তখন আমার কাছে এসো... মানে তোমার এখন যা অবস্থা আর কী...'

কী যেন আছে লোকটার মুখে। অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকলে মনটা শান্ত হয়ে যায়। কোনও উত্তেজনা নেই, নির্দেশ নেই, জ্ঞানী ভাব নেই। উলটে বেশ বন্ধুর মতো কথা বলছে। আশপাশে একটাও পরিচিত লোক নেই বলেই হয়তো তথাগতকে ভারি আপন মনে হল সাম্যের।

'আপনি জানেন যখন আমাকে দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বলে দিন।' সাম্যর গলার আওয়াজ প্রার্থনার মতো শোনাল।

তথাগতর একটা হাত উঠে আসে সাম্যের মাথায়, চুলগুলো এলোমেলো করতে করতে বলল, 'বেঁচে থাকলে দুঃখ হবেই ভাই। যা তুমি আজ পাচ্ছ তার থেকে ঢের বেশি হবে। সব অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য।'

'আপনি যা বলবেন আমি করব, শুধু আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচতে শিখিয়ে দিন...'

শালটা গায়ের উপর ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তথাগত, কিছুটা ঝুঁকে পড়ে বলে, 'আমি যা বলব তাই করবে?'

'হ্যাঁ... আপনি বলে দেখুন...'

'তোমার বাবা বলেছিল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। ওতে স্কোপ বেশি, তাও অনার্স পড়লে কেন?'

'আরে আপনি ওসব বুঝবেন না, বাবা অন্য জেনারেশনের লোক। আই

মিন কেরিয়ার নিয়ে ওদের আইডিয়াটা তিরিশ বছর আগে পড়ে আছে...'

'আর আমি আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের লোক। আমার কথা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবে?'

'তাহলে কী বিশ্বাস করব?'

তথাগত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায়, 'বিশ্বাস করবে না, দেখবে...'

'কী দেখব?'

লোকটা মাঝের বার্থগুলোর দিকে আঙুল তুলে দেখায়, 'ওই যে মাড়োয়ারি লোকটা। আগের সপ্তাহে ওর মা মারা গেছে। ওই যে মেয়েটা ঘুমোচ্ছে ও রোজ বাড়িতে অকারণে মার খায়, মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দেয় ওর বাবা, ওই যে মহিলা নিচের বার্থে শুয়ে আছে...'

বিরক্ত হয়ে ওঠে সাম্য, 'আঃ, আমি জানি পৃথিবীতে এইসব আছে, দুঃখ কষ্ট আছে...'

'উঁহু, তুমি শুধু নিজেরটা জানো। বাকিদের কষ্ট তোমার মনে একটা কষ্টের প্রতিবিম্ব তৈরি করে, আয়নার মতো। সেইটার দিকে তাকিয়ে তুমি কষ্ট পাও। আমরা কেউ অন্যের দুঃখ অনুভব করতে পারি না। তাতে ক্ষতি নেই অবশ্য, তোমাকে শুধু এমন অনেক আয়না জোগাড় করতে হবে...'

'তাতে কী লাভ হবে?'

লোকটা ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার দূরে তাকায়, 'আমি ঊনত্রিশ বছর বয়সে ঘর ছেড়েছিলাম। ছ-বছর পর মুক্তি পেয়েছিলাম। এখনকার দিনে লোকে সেটাকে নির্ভানা বলে...'

'মানে কার্ট কোবেন? সে তো সুইসাইড করেছিল... আপনি আমাকে সুইসাইড করতে বলছেন...'

অল্প হেসে আবার ওর মাথায় হাত রাখে লোকটা, 'বেঁচে থাকাটা একটা সুইসাইড ভাই... ও তুমি না চাইলেও তোমাকে করতে হবে...'

হঠাৎ দু-হাতে লোকটার হাত চেপে ধরে সাম্য, 'আপনি তো ভগবান, আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, আমার মাকে ফিরিয়ে দিন তাহলে... মায়ের জন্য খুব মন খারাপ করে আমার...'

দু-দিকে মাথা নাড়ায় লোকটা, 'আমি কাউকে সৃষ্টি করিনি, কাউকে ফিরিয়েও দিতে পারি না। বললাম না আমি সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কিছু ছিলাম না...'

'তাহলে আমার বাবাকে সুস্থ করে দিন...' ব্যাকুল গলায় বলে সাম্য।

'তা তো আমি পারব না, আমি ডাক্তার নই...'

'তাহলে একটা চাকরি পাইয়ে দিন আমাকে। বিশ্বাস করুন আমার বাবার ভালো করে চিকিৎসা না হলে...' এবার কাতর আর্তির মতো শোনায় সাম্যর গলাটা।

'এসব কিছুই পারব না আমি, বললাম যে তুমি ভুল লোককে ডেকে এনেছ...'

'তাহলে কী পারবেন আপনি?' জানলার উপরে একটা চাপড় মেরে উঠে পড়ে সাম্য, ওর মাথার ভিতরে জমাট দুঃখগুলো গনগনে রাগে পরিণত হয়েছে, হেঁটে বগির শেষপ্রান্তে দরজার কাছে এগিয়ে আসে ও, 'দেখুন আপনি কে তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আপনার যদি কোনও অলৌকিক ক্ষমতা থাকে তাহলে এটুকু সাহায্য করতেই পারেন আমাকে... নাহলে...'

'তাহলে তুমি ভুল লোককে ডেকে এনেছ। আমি এসব কিছুই পারি না।'

সাম্যের মনের ভিতরে একটা উত্তেজনার পারদ বেড়ে উঠেছিল। দুঃখের থেকে ছুটি পাওয়ার নেশা বেপরোয়া ভাব এনে দেয় ওর শরীরে। উত্তেজনায় কী বলছে খেয়াল থাকে না। অলৌকিক সবার জীবনে ঘটে না। ওর জীবনে ঘটছে যখন, নাহয় চোখের ভুলই হল, সেই শান্তিটুকু ও পাবে না কেন?

'বেশ, পারবেন না যখন...' কথা শেষ করার আগেই ছুটে গিয়ে ট্রেনের দরজা খুলে ফেলে সাম্য। তারপর পা বাড়ায় বাইরের দিকে, 'তাহলে আমি নিজেকে শেষ করে দেব। আমার আর কিছু যায়-আসে না...'

তথাগতও উঠে এসেছে ওর পেছন পেছনে। তার শান্ত গলা শুনতে পায় পেছন থেকে, 'লাভ হবে না তাতে, তুমি আবার জন্মাবে। হয়তো বারোশো শতাব্দীর কোনও নাস্তিক মহিলার ছেলে হয়ে। তোমার মাকে ডাইনি সন্দেহে তোমার সামনেই পুড়িয়ে মারা হবে, কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তোমার বাবাকে

ঢোকানো হবে গ্যাস চেম্বারে। অভাব থাকবে, বিচ্ছেদ থাকবে, রোগ থাকবে, মৃত্যু থাকবে, মুক্তি নেই...'

সাম্যের কানের ভিতরে যেন কেউ সীসা ঢেলে দেয়, সে চিৎকার করে ওঠে, 'চুপ করুন, চুপ করুন, আপনার মতো পাগলের একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি... পারবেন আমার মাকে ফিরিয়ে দিতে? আমার বাবাকে আমার আশ্রয়টুকুকে আবার আগের মতো করে দিতে? না পারলে দূর হয়ে যান আমার সামনে থেকে...'

আবার লোকটার মুখে পুরনো নরম হাসিটা ফিরে আসে, 'আমি তোমায় সারিয়ে দিতে পারি কেবল... মুক্তি দিতে পারি...'

'চাই না...' গর্জে ওঠে সাম্য, 'দূর হয়ে যান এখান থেকে...'

পেছন থেকে আর কোনও আওয়াজ আসে না। বাইরের শনশনে হাওয়া সাম্যের মুখে এসে লাগে। ট্রেনের ভিতরের জমাট হাওয়াটাকে মুহূর্তে হালকা করে দেয় সেটা।

ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় কয়েক সেকেন্ড পর হুট করেই মনটা শান্ত হয়ে যায় ওর। একটু বেশিই জোরে চিৎকার করে ফেলেছে।

মুহূর্তে পেছন ঘোরে সাম্য, 'না দাঁড়ান, আমাকে সারিয়ে দিতে পারবেন আপনি?' কথাটা বলতে বলতেই ও ঢুকে আসে কামরার ভিতরে। মারোয়াড়ি লোকটা, বাচ্চা মেয়ে আর তার বাবা-মা ওর চিৎকারেই মনে হয় জেগে উঠেছে এতক্ষণে। তাছাড়া এ কম্পার্টমেন্টে আর কেউ নেই...

ও ছুটে গিয়ে নিজের বার্থে উঠে পড়ে। পাশের বার্থটা ফাঁকা। কেবল ওর সামনে রাখা আছে কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তিটা। তার একটা হাত এখনও আগের মতোই সোজা হয়ে আছে। মুখে লেগে আছে সেই অদৃশ্য হাসিটা।

(৩)

সাম্যদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরেই একটা খাল পড়ে। একসময় সে খাল পেরোতে গেলে ছোট ডিঙি নৌকায় চড়তে হত। কয়েক বছর আগে খালের উপর ব্রিজ হয়ে গিয়ে নৌকার আর দরকার পড়ে না।

মাঝিবিহীন নৌকাটা বহুদিন অদরকারে জলের ধারে ঠায় পড়েছিল। ঝড়-বৃষ্টি-রোদে ধীরে ধীরে তার কাঠ খইতে শুরু করে। ছইটা ভেঙে গেছে। ভিতরের বেশিরভাগটাই শ্যাওলায় ভরা, কেবল একদিকের একটা কোণ আইসক্রিমের মতো জেগে আছে মাটির উপরে। কে যেন সেই ভাঙা নৌকার গায়ে রোজ বিকেলে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রেখে যায়।

সেই নৌকার উপরেই বিকেলে এসে বসে সাম্য আর বকুল। জায়গাটা ওদের ভীষণ প্রিয়। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় এ নৌকাটায় করে কতবার খাল পেরিয়েছে। আজ নৌকার মৃতদেহই হোক, তার উপরে এসে বসলে আবার আগের দিনগুলো মনে পড়ে যায়। মরা নৌকাটা যেন আবার ছোটবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যায় ওদের।

পাহাড় থেকে ফিরে দু-দিন কেটে গেছে। এই দু-দিনে মূর্তিটা বেশ কয়েকবার উল্টে পাল্টে নানান সাধ্যসাধনা করে দেখেছে সাম্য। লাভ হয়নি। তথাগতর দেখা আর পায়নি ও। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষ অবধি।

আজও বিকেলের দিকে ভাঙা নৌকার উপর এসে বসেছিল দু-জনে। পিঠের ব্যাগটা এককোনায় ঝুলিয়ে রেখেছে বকুল। অন্যদিনের থেকে একটু বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে সাম্যকে। সেদিকে চেয়েই ও প্রশ্ন করে, 'তুই হঠাৎ বুদ্ধদেবকে নিয়ে পড়লি কেন বলতো? মানে ধর্ম-কর্মে তো তোর কোনওদিনই তেমন মতি ছিল না...।'

'তাতে নতুন কী আছে? নিব্বা নিব্বি বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা হলেই কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদার উপর বুদ্ধদেবের কোট শেয়ার করছে দেখিসনি?' সাম্য একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে।

'সেসব আদৌ বুদ্ধ বলেইনি। সেদিন দেখলাম উনি ঢুলুঢুলু চোখে হাতে বরাভয় মুদ্রা ফুটিয়ে বলেছেন—তোমার বয়ফ্রেন্ড যদি তোমার সঙ্গে ফেসবুক ডিপি না দেয়, জানবে সে বারোভাতারি...'

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ভারীক্কি গলায় বলে সাম্য, 'হুঁ, লোকটাকে দেখেই মনে হয় জীবনে অনেক ব্রেকআপ টেকআপ হয়েছে। কেমন কাঁচুমাচু টাইপ! মানে ধর থর কিংবা আনুবিশকে দেখে আদৌ মনে হয় ওরা তোকে

রিলেশনশিপ অ্যাডভাইস দিতে পারবে? উল্টে ধুম করে একটা হাতুড়ি মেরে দিলে...'

বকুলকে চিন্তিত দেখায়, গালে হাত রেখে বলে, 'কিন্তু বুদ্ধদেব ব্রেকআপ নিয়ে তেমন কিছু বলেননি যতদূর জানি...'

'তাহলে কী বলেছে?'

'ওনার মূল বক্তব্যটা ছিল—আকাঙ্ক্ষাই অনর্থের মূল। মানে লোকের ডিভোর্স হয় তার কারণ একদিন তার বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে যদি না করিস তাহলে ডিভোর্সের প্রশ্ন আসছে না।'

'আজব তো! আমি কি সলমন খান নাকি?'

বকুল কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপর বলে, 'ব্রেকআপ হলে এক-একটা মানুষ এক-একরকম হয়ে যায়। কেউ জিমে গিয়ে ডোলেশোলে বানায়, কেউ প্রচুর পড়াশোনা করে...'

'আমি তার কিছুই করছি না...'

'কোথায় করছিস না? এই যে আমার সঙ্গে কথা বলছিস...'

কাঁধ ঝাঁকায় সাম্য, 'সেটাই ভয় লাগে। মা বলত খারাপ সময়ে কেউ পাশে থাকলে তার উপর নির্ভরতা তৈরি হয়।'

বকুল হেসে কপালের উপর এসে পড়া চুল কানের পাশে সরায়, জ্বলন্ত হ্যারিকেনের আলো ওর মুখে এসে পড়ে, 'আমি পাঁচবছর বয়স থেকে তোর পাশে আছি। এতদিনে আর নির্ভরতা তৈরি হতে বাকি নেই...'

'এতদিন তো খারাপ সময় চলছিল না...'

বকুলের মুখে আলো পড়ে, 'তার মানে তুই-ই ভেবে দেখ, খারাপ সময়ের একটা শুরু আর একটা শেষ আছে। এটাও এসেছে, শেষ হয়ে যাবে...'

'কিন্তু আমার মা তো ফিরে আসবে না...' কথাটা বলে উঠে দাঁড়ায় সাম্য। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'আমি সব কিছুর একটা স্থায়ী সমাধান চাই। আর চারপাশে তাকালে কোনও সমাধান দেখতে পাচ্ছি না...'

'একটা মানুষ তো দেখতে পাচ্ছিস।' উঠে এসে ওর পিঠে একটা হাত রাখে বকুল, 'একটা মানুষ কখনও সমাধান হতে পারে না, তাই না?'

ওর দিকে ফিরে তাকায় সাম্য। মেয়েটার চোখ ছলছল করছে কি? ওর নিজের মনটাও নরম হয়ে আসে। ছোট থেকে ওর জীবনে এমন কোনও খারাপ সময় আসেনি যখন বকুল ওর পাশে ছিল না। এমনকী সম্পর্কে গিয়ে টানা দু-বছর ওর ফোন অবধি রিসিভ করেনি। তাও একবারের জন্যও জবাবদিহি করতে হয়নি ওর কাছে। যখন সাম্য বলতে চেয়েছে ও মন দিয়ে সমস্তটা শুনেছে। তার বদলে সাম্য নিজে প্রায় কিছুই দিয়ে উঠতে পারেনি ওকে।

মুখ ঘুরিয়ে চোখের জলটা মুছে আবার নৌকার উপর গিয়ে বসে বকুল, প্রসঙ্গটা জোর করেই ঘোরানোর চেষ্টা করে, 'বেশ, তুই যখন বুধিজম নিয়ে জানতে চাইছিস আমি তখন বাড়ি গিয়ে একটু পড়াশোনা করব না হয়। তবে তাতে যে সমাধানের কথা বলা আছে তা এখনকার দিনে মনে হয় না আর সম্ভব...'

'কেন?'

বকুল একটু দম নিয়ে বলে, 'যতদূর মনে পড়ছে তাই বলছি, ভুলও হতে পারে। বুদ্ধদেব জন্মেছিলেন শাক্য বংশে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। জন্মের পরপরই মা মারা যায়। এক জ্যোতিষী সিদ্ধার্থকে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এ ছেলে হয় জগৎজয়ী রাজা হবে। নাহয় সন্ন্যাসী হবে। তবে রাজা কবেই আর চেয়েছে যে ছেলে সন্ন্যাসী হোক। ফলে তিনি সিদ্ধার্থকে দুঃখকষ্টের কাছেই যেতে দিলেন না। সোনায় মুড়িয়ে বড় করতে লাগলেন তাকে। হাজার চাকর সর্বক্ষণ তার দেখাশোনা করে, যখন ছেলে যা চায় তাই এনে দেয়, মুখ ফুটে কেবল বলার অপেক্ষা। তো এমন করেই তেরো বছরের জন্মদিনে সিদ্ধার্থ বায়না ধরল সে বাইরের জগৎ দেখতে যাবে। চাকররা তাই নিয়ে গেল তাকে। রথে করে যেতে যেতে সিদ্ধার্থ রাস্তায় একজন বৃদ্ধ, একজন অসুস্থ লোক আর একজনের একটা মৃতদেহ দেখতে পেল...'

'আক্কেল বলিহারি, সব ছেড়ে সরকারি হাসপাতালের সামনে দিয়েই নিয়ে যেতে হল?'

রসিকতায় পাত্তা দিল না বকুল, 'তো এইসব দেখে সিদ্ধার্থর মাথা গেল ঘুরে। সে দেখল এতদিন যে ইউটোপিয়া সে দেখে এসেছে সেটা তো সত্যি না। সত্যিকারের দুনিয়ার রোগ আছে, বিচ্ছেদ আছে, মৃত্যু আছে। সে ভাবল, যাঃ, এসব তো আমাকেও ভোগ করতে হবে একদিন। আমার শরীর খারাপ হবে, প্রিয়জনের মৃত্যু দেখতে হবে, চুল পেকে যাবে, ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে হবে...'

'এখনকার দিন হলে বাড়িতে এলআইসির লোক চলে আসত...'

'ব্যস এই চিন্তায় সে পাগল হয়ে গেল। নানা সাধুসন্তের কাছে গিয়েও কোনও উপায় হল না। শেষে আর কোনও উপায়ন্তর না দেখে তিরিশ বছর বয়সে বোধিবৃক্ষের নিচে সাধনা করতে বসল... ছ-বছর একটানা সাধনার পর মুক্তি পেয়ে সিদ্ধার্থ হল বুদ্ধ...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাম্য, 'আমার সেই স্কুল লাইফের ক্রাশ ইতিকে মনে আছে তোর? শালা ছ-বছর তার পেছনে সাধনা করে গেলাম। পাত্তা দিল না, আর ইনি ছ-বছরে মুক্তি পেয়ে গেলেন...'

'তুইও পাবি, চেষ্টা করে দেখ...'

'ধ্যান করব?'

'হ্যাঁ, শুধু একটা পিপুল গাছ খুঁজে নে। তারপর পদ্মাসনে বসে পড়।'

ফিরেই আসতে যাচ্ছিল সাম্য। হঠাৎ পেছন ফিরে বলল, 'এই তুই কী গাছ বললি যেন, কোন গাছের নিচে সাধনা করেছিল...'

'বোধিবৃক্ষ। আই মিন পিপুল গাছ... আরে তোদের বাড়ির পাশেই তো...'

'রাতে ফোন করছি তোকে...' কথাটা বলতে বলতেই ছুট লাগাল সাম্য। ওদের বাড়ির ঠিক লাগোয়া বিশাল পিপুল গাছটার কথা এই ক-দিন ওর মাথাতেই আসেনি।

(৪)

গেট খুলে যখন পিপুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল সাম্য তখন রাত গভীর হয়েছে। মৃদু একটা হাওয়া খেলা করছে বাগানে। গেটের কাছে একটা কুকুর

গুটিসুটি হয়ে শুয়েছিল। তাকে পাশ কাটিয়েই গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল সাম্য। ওর হাত থেকে ঝুলছে কালো পাথরের মূর্তিটা।

নিচু গলাতেই ডাক দিল, 'তথাদা, ও তথাদা...'

উপরের গাছগুলোর মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল, 'ব্যাপার কী? রাত-বিরেতে আমাকে ডাকাডাকি কেন?'

উপরে তাকিয়ে সাম্য দেখল ঝাঁকড়া পিপুল গাছের উঁচু একটা ডালে পা তুলে বেশ আয়েস করে বসে আছে তথাগত। হুট করে দেখে একটু ভয়ই লাগল তার, ঢোঁক গিলে বলল, 'ইয়ে... আপনি এইভাবে বসে?'

'তো আমি সারাক্ষণ হাত তুলে পদ্মাসনে বসে গেঁটে বাত হয়ে মরব নাকি?'

'আপনি আড়াই হাজার বছর আগেই মরে গেছেন। আর নতুন করে কী মরবেন?' কথাটা বলতে বলতেই গাছ বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসতে থাকে সাম্য, 'ভালো কথা, আপনার যত ছবি আর মূর্তি দেখেছি সব ওই তিরিশের আশপাশে। অথচ আপনি বেঁচেছিলেন আশি অবধি। মাঝে এমন সুচিত্রা সেন হয়েছিলেন কেন বলুন তো?'

ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওকে গাছের উপর টেনে নেয় তথাগত, 'কারণ মানুষ সিদ্ধার্থকে আর কেউ মনে রাখেনি। যারা তোমাকে চেনে তারা আসলে কেবল তোমার কাজটাকেই চেনে। তাদেরকে তুমি যেভাবে স্পর্শ করেছ শুধু সেইটুকু চেনে...'

লোকটার উল্টোদিকের ডালে বসে কাঁধ ঝাকায় সাম্য, 'হ্যাঁ, বকুল বলছিল আপনার কথা। স্যাড লাইফ...'

তথাগত ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে এবার, 'আচ্ছা এই বকুল বলে মেয়েটা। এ তো তোমাকে ভালোবাসে, তাই না?'

'তা বাসে... নইলে এতদিন...'

'বাঃ, তাহলে তুমিও তাকে ভালোবাস, তাই না?'

সাম্য রেগে ওঠে, 'আরে মুশকিল তো। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি শুনেছিলাম।

লুচ্চামি শুনিনি। এতদিন তো আমি অন্য কাউকে ভালোবাসতাম... ওর ফোনটা অবধি ধরিনি...'

তথাগত জিভ কাটে, 'আসলে ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, ঊনত্রিশে ঘর ছাড়ি। প্রেম ভালোবাসার ব্যাপারটা...'

'আপনাদের কালে লোকে ঘর ছাড়লে সন্ন্যাসী হত, এখন প্রধানমন্ত্রী হয়... ভালো কথা, আপনি গাছ থেকে খুব একটা নেমে এদিক-ওদিক যাবেন না কিন্তু...'

'কেন?'

'আরে জাতে নেপালি। নেহাত ভগবান-টগবান হয়ে গেছেন বলে রক্ষে নাহলে এরকম হলদে রং আর টানাটানা চোখ দেখলে ছেলেপুলে মেড ইন চায়না বলে প্যাঁক দেবে...'

তথাগত হাত তুলে আশ্বস্ত করে ওকে, 'আমাকে তুমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাবে না...'

'সেকি! মানে এখন এই গাছের ডালে বসে আমি নিজের সঙ্গে কথা বলছি... এমনিতেই লোকে বলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে... দেখুন, আপনি জলদি আমার একটা ব্যবস্থা করে বিদায় নিন...'

'ব্যবস্থা?'

'বলেছিলেন যে আমাকে সারিয়ে দেবেন? মুক্তি দেবেন... তার জন্য যা বলবেন করব, তবে হ্যাঁ, ওসব ধ্যান-ট্যান আমাকে দিয়ে হবে না...'

'কেন?'

কাঁচুমাচু মুখে মাটির দিকে তাকায় সাম্য, 'আর বলবেন না, সেই পিটি ক্লাসে জয়দেব স্যার মেডিটেশন করাত। আর ওরকম চোখ বন্ধ করে সোজা বসতে গেলেই আমার পিঠ চুলকাত, নাক সুড়সুড় করত, হাসির কথা মনে পড়ত...'

'তোমাকে কে বলেছে তুমি এখন ধ্যান করছ না?'

'সেকি! এখন!'

তথাগত ঘাড় নাড়ায়, 'নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলাকেই ধ্যান বলে। তবে

হ্যাঁ, সেই কথার মাঝে অন্য কাউকে আসতে দেওয়া যাবে না। একদম মন দিয়ে কথা বলতে হবে...'

'কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম ধ্যান করলে লোকে ভগবানের সঙ্গে কথা বলে...'

তথাগত একটা আঙুল ওর বুকের উপরে স্পর্শ করে, তারপর বলে, 'যা থাকার সব এখানে আছে, ভগবান, শয়তান, ভালোবাসা, ঘৃণা... এর বাইরে আর কোথাও কিচ্ছু নেই...'

'মানে আপনি ছ-বছর ধরে গাছতলায় বসে নিজের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?'

মূর্তির হাসিটা আবার খেলে যায় তথাগতর মুখে, চাঁদের আলোয় ওর মুখটা আরও চকচকে, মসৃণ দেখায়, 'আবিষ্কার করেছিলাম। অনেক ঝগড়া, অনেক তর্ক, অনেক অপেক্ষার পর নিজের ভিতরে আবিষ্কার করেছিলাম... বুদ্ধকে...'

'মানে আপনি বুদ্ধ নন?'

তেমন চকচকে মুখেই অদ্ভুত হাসি হাসে তথাগত, চাঁদের ফিকে আলো চারপাশ থেকে মুছে গিয়ে যেন তার মুখটাকেই আলো করে রেখেছে, 'বুদ্ধ কোনও মানুষ না। মানুষের একটা অবস্থা। তোমার ভিতরেও বুদ্ধ আছে, যাকে শোক স্পর্শ করে না। নিজের ভিতরে তাকে খুঁজে নিতে হবে তোমাকে...'

'কী করে?'

'এই পিপুল গাছের তলায় বসে, এইভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলে। চাইলে নাক চুলকাতে পারো, পিঠ চুলকাতে পারো, এমনকী গানও গাইতে পারো। কেবল আর কাউকে আসতে দেওয়া যাবে না...'

কী যেন ভেবে মাথা নামিয়ে নেয় সাম্য, 'কিন্তু একটা সমস্যা আছে।'

'কী?'

'চোখ বন্ধ করলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ে...'

কয়েক সেকেন্ড আর কেউ কোনও কথা বলে না। তথাগত স্থির চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে ওর দিকে। গাছের পাতায় সরসর করে আওয়াজ হয়, দূর থেকে অপরিচিত সুর ভেসে আসে যেন। হঠাৎ করেই তথাগত একটা

টান দিল ওর হাত ধরে, ‘এসো, বাগানটা দেখতে দেখতে একটা গল্প বলি তোমাকে...’

‘গল্প?’

‘হ্যাঁ, গল্পের শেষে একটা প্রশ্ন থাকবে। উত্তর দিতে পারলেই আজকের মতো কাজ শেষ...’

ওকে প্রায় কোলে নিয়েই গাছ থেকে নেমে এল তথাগত। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা। সাম্য দেখল লোকটার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ঘাসের উপর। রোগাটে চেহারা, মাথায় মুকুট। পাশে ওর ছায়াটা ছোট...

সাম্যর কাঁধে হাত রেখে গল্প বলতে শুরু করল তথাগত, ‘একটা খুব অসুস্থ লোক ছিল জানো, ধরে নাও তার নাম মতি। তো সে কারও মুখে শুনল যে জঙ্গলে এক ওঝা আছে। সেই নাকি একমাত্র তার রোগ সারাতে পারবে। মতি ঠিক করল যেভাবেই হোক সে জঙ্গলে যেতেই হবে। কিন্তু সেখানেও হল সমস্যা। জঙ্গলে বাস করে এক হিংস্র বাঘ। সে একবার কাউকে দেখে ফেললেই আর রক্ষে নেই।

তো মতি সেই ওঝাকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু মাংস ব্যাগে পুরে চলল সেই জঙ্গলের পথ দিয়ে। যেতে যেতে পেয়েও গেল ওঝাকে। সবে ওঝা রোগ সারানোর তোড়জোড় করেছে এমন সময় ঠিক পেছনেই শুনতে পেল এক গড়গড় চিৎকার... মতি পেছন ফিরে দেখল লাল ভাঁটার মতো চোখে ওর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই হিংস্র বাঘটা... এখন বলো তো মতি বাঁচবে কী করে?’

ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেন্ড ভাবল সাম্য, তারপর বলল, ‘উঁহু, বুঝতে পারছি না, কী করে?’

তথাগতর গলার স্বর এবার মিহি সুরের মতো শোনায়, আঙুল তুলে সামনে দেখিয়ে সে বলল, ‘ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করো তো, জানেন কি না উত্তরটা...’

সামনে মুখ তুলে তাকিয়ে থমকে গেল সাম্য। এতক্ষণ মাটির দিকে মুখ

রাখায় সামনেটা দেখতে পায়নি। তার মুখ দিয়ে একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে এল, 'মা...'

পাশের মানুষটাকে ভুলে গেল সাম্য, এক ছুটে এগিয়ে গেল সেদিকে, 'মা... তুমি অসময়ে চলে গেলে কেন? আমার তো দরকার ছিল তোমাকে, বলো...'

হাসিভরা মুখ তুলে মা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সাম্যের চোখ ভরে যায় জলে, 'আমার কত কষ্ট হয় তোমাকে ছেড়ে থাকতে জানো? তুমি...'

একটা অল্পবয়সি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশেই, তার দিকে ফেরে সাম্য, 'তুমি... তুমি কেন চলে গেলে বলো তো, তুমি তো জানতে আমার থেকে বেশি কেউ বোঝেনি তোমাকে...'

ওরা কেউ কোনও কথা বলে না, নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। দূরে একটা লোক ঘাসের উপর শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছ—বাবা। সাম্য চিৎকার করে ওঠে, 'বন্ধ করুন, বন্ধ করুন এসব... আমি...'

যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে মানুষটা। সামনের দুটো মানুষ নিশ্চল। অসহ্য যন্ত্রণায় সাম্যের বুকের ভিতরটা ডুকরে ওঠে। দু-হাতে কান চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে, 'ব্যাগ... ওই ব্যাগটা...'

মুহূর্তে আশপাশের মানুষগুলো মুছে যায়। ওর সামনে এসে দাঁড়ায় তথাগত, 'ব্যাগটা... কী?'

'বাঘটা মতিকে খেতে আসেনি। এসেছিল ওই ব্যাগের ভিতরে মাংসটার লোভে। ওঝা ব্যাগটা বাঘের দিকে ছুঁড়ে দিতে মতি বেঁচে যায়...'

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে লোকটা, দু-কাঁধে হাত রেখে বলে, 'দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, মৃত্যু আমাদের নিতে আসে না। আসে আমাদের হাতের জমাট বাঁধা স্মৃতির লোভে, আকাঙ্ক্ষার লোভে... যেদিন তুমি সেগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে দেবে সেদিন আর তাকে ভয় পেতে হবে না।'

'কিন্তু কী করে হবে সেটা?'

হঠাৎ মানুষটার টানা টানা চোখের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে, মুখটা নিচের দিকে নামিয়ে সে বলে, 'মেয়েটা ভালোবাসে তোমাকে। ওর

কাছে আশ্রয় পাবে তুমি, নির্ভরতা পাবে। আশ্রয় আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে হোক বা এখন, সহজে পাওয়ার জিনিস ছিল না কোনওদিন...'

'কী করব আমি?'

দূরে কুয়াশা জমাট বাঁধছে। সেদিকে হাঁটতে থাকে তথাগত। ঘন কুয়াশার চাদরে কেবল তার শরীরের বিমূর্ত আউটলাইন ফুটে ওঠে।

'অনেক বছর আগে বলে গেছি আমি। খুঁজে বার করো... নাহলে...'

তথাগতর বাকি কথাটা প্রতিধ্বনিত হয় ফাঁকা মাঠে, 'নাহলে নিজের মধ্যে খোঁজো বুদ্ধকে...'

সাম্য লক্ষ করে কুয়াশার চাদর এখন আবার আগের মতো নিটোল হয়ে গেছে। ওর হাতে ধরা মূর্তিটা ঠান্ডা হয়ে এসেছে...

(৫)

'পৃথিবীতে আজ অবধি যত অবতার এসেছে গৌতম বুদ্ধ তাদের মধ্যে অন্যতম!'

'সে কী? বডি তো নীল নয়...'

'আঃ, জেমস ক্যামেরনের না, বিষ্ণুর অবতারের কথা বলছি... জন্ম পাঁচশো তেষট্টিতে...'

'তাহলে যে শুনলাম আড়াই হাজার বছর আগে। পাঁচশো তেষট্টি মানে তো দেড় হাজার...'

'ধুর বিসি...'

'একী! তুই খিস্তি করছিস কেন?'

'খিস্তি কই করলাম। বললাম আমি খ্রিস্টাব্দের কথা বলছি না। যিশুর জন্মের পাঁচশো বছর আগের কথা বলছি। বাবা শুদ্ধধন, মা মায়াদেবী, বুদ্ধের জন্ম বোঝানো হয় পদ্মফুল দিয়ে, যে কারণে বহু মূর্তি বা ছবিতে বুদ্ধের হাতে পদ্মফুল দেখা যায়...;

'এখনকার দিনে লোকে হাতে পদ্মফুল দেখলে বিজেপি ভাবত...'

আজ একটা চাকরির ইন্টারভিউ ছিল সাম্যের। দিতে যেতে পারেনি।

বাবাকে নিয়ে হসপিটালে গেছিল একটা টেস্ট করাতে। বিদঘুটে টেস্ট। বলেছে তিনদিন পরে রিপোর্ট দেবে।

সেসব শেষ হতে হতেই বিকেল হয়ে গেল। তারপর বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে আর সময় হয়ে ওঠেনি। এই মাঝের ক-দিন বকুলের সঙ্গে কথা হয়নি তেমন। তবে জানত ও নাকি বুদ্ধিস্ট থিয়োরি নিয়ে ক-দিন খুব পড়াশোনা করছে। তবে অনেক খুঁজেখাঁজেও আশার কথা কিছু শোনাতে পারেনি। আজ সন্ধেবেলা ওর বাড়ি এসে হাজির।

বাবা একটু দূরেই বিছানার উপরে ঘুমাচ্ছে। শরীরটা আগের থেকে বেশ কিছুটা ঝরে গেছে। মুখ-চোখেও দীর্ঘ রোগভোগের ছাপ। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে শারীরিক দিক থেকেও যেন অর্ধেক হয়ে গেছে মানুষটা।

বারান্দার চৌকাঠের উপর বসেছে ওরা। এ সময়ে বাইরের দিক থেকে একটা নরম হাওয়া জানলা বয়ে আসে। সেই সঙ্গে বাইরের বাগানের মৃদু আওয়াজ। কোলের উপর একটা মোটা গোছের বই রেখে সেটা দেখেই এটা সেটা মাঝে মাঝে বলছে বকুল। সাম্য আবার তাতে মন দেয়।

'মোটামুটি নথিপত্র বলছে সিদ্ধার্থ চেহারায় ছিল লম্বাটে, রাজার ছেলে বলে চেহারায় একটা আভিজাত্য, চোখে বুদ্ধির ছাপ...'

'ব্যস ব্যস, এখনকার বাংলা সিনেমার ডিরেক্টররা দেখতে পেলে ফেলুদা বানিয়ে ছাড়ত...'

'দেখ তুই যদি ইয়ার্কি মারতে থাকিস তাহলে আমি আর কিছু বলব না।'

'কিন্তু কেমন দেখতে ছিল সেটা জেনে কী করব আমি, মুক্তির উপায় নিয়ে কিছু বলেছে কি না দেখ...'

'কিছু ছোট ছোট টোটকা আছে বটে, এই যেমন ধর মাথা ন্যাড়া করে ফেলতে হবে, কাম পরিত্যাগ করতে হবে...'

'হেঃ...' কাঁধ ঝাকিয়ে হাসে সাম্য, 'ন্যাড়া মাথা নিয়ে লোকে কামের গুষ্টি চটকে দিচ্ছে... আর?'

'মাঝে মাঝে উপোস করতে হবে...'

'বুদ্ধদেব উপোস করতে বলছিল! তবে যে আমার পিসি একবার একুশ দিন উপোস করে বুদ্ধদেবকে গালাগাল করেছিল?'

ধপ করে বইটা বন্ধ করে দেয় বকুল, 'তোর আদৌ কিছু জানার ইচ্ছা নেই। ফালতু ইয়ার্কি মারবি তো আমি বাড়ি যাই...'

ওকে একরকম জোর করেই বসিয়ে দেয় সাম্য, 'আরে রেগে যাচ্ছিস কেন? আচ্ছা একটা কথা বল...'

'কী কথা?'

'ধর তুই এই ভগবান বুদ্ধকে সামনে থেকে দেখতে পেয়েছিস, তাহলে সবার আগে কী জিজ্ঞেস করবি?'

একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবে বকুল, তারপর বলে, 'সবাই যা জিজ্ঞেস করে আমি তা জিজ্ঞেস করব না। আমি জানতে চাইব যশোধরাকে, নিজের ছেলেকে চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে কেমন করে পেরেছিল? আমি হলে পারতাম না।'

'তুই আমাকেই ছাড়তে পারিস না তো ছেলে বউ...'

একটু যেন রেগে ওঠে বকুল, ঝাঁজালো গলায় বলে, 'দিয়েছিলাম তো ছেড়ে, নিজের ইচ্ছায় প্রেম করে কেমন ছড়ালি দেখতে পেলাম তো... হয়েছে তো শিক্ষা? এবার আর এক পা এগিয়ে দেখ...'

'কী করবি?'

'ঠ্যাং ভেঙে রেখে দেব শয়তান।'

সাম্য হেসে মাথা নাড়ায়, 'ওসব নিয়ে ভাবি না আর। একটা চাকরি জোগাড় করে বাবার চিকিৎসাটা ঠিকঠাক করতে পারলেই...' কথাটা শেষ হওয়ার আগেই থেমে যায় সাম্য। একটা যন্ত্রণামাখা শব্দ বেরিয়ে এসেছে খাটের উপর শুয়ে থাকা মানুষটার মুখ থেকে। ওরা দু-জনেই উঠে ছুটে যায় সেদিকে।

কাশতে কাশতে বিছানার উপরে উঠে বসেছে বাবা। সাম্য চেয়ে দেখে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত বুকের উপরে জমা হয়ে আছে।

'একটা কাপড় নিয়ে আয়...' নির্দেশটা দিয়ে বাবার মাথাটা বুকের উপরে তুলে নেয় সাম্য, 'কোথায় কষ্ট হচ্ছে বাবা?'

কোনওরকমে কাশির দমক সামলে হাতের উল্টোদিক দিয়ে মুখ মোছেন ভদ্রলোক। তারপর ধরা গলায় কষ্ট করে উচ্চারণ করেন, 'তোকে একটা কথা বলি সোমু?'

'হ্যাঁ, বলো না...'

'তোর মা ছোট থেকে তোকে একটু বেশি আদর-যত্নে মানুষ করেছে। দুনিয়াদারি তেমন একটা শেখায়নি। আমি বলতাম অত আতুপুতু করে রেখো না... তাও... তুই পারবি তো?'

সাম্য হাসে, 'এখন পারছি যখন পরেও চালিয়ে নেব। তুমি আছ তো, সুস্থ হয়ে গেলে বাপ-ব্যাটা দু-জনে মিলে...'

ওর কথার মাঝে খুব ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন বাবা, 'আমি আর ভালো হব না রে ব্যাটা... আমার শরীর বলে আমার সময় হয়ে গেছে...'

কাপড় আর ওষুধ নিয়ে ফিরে এসেছে বকুল। সাম্যের শরীর জুড়ে একটা বিচ্ছিরি অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে, 'ধুর, তুমি কী সব বলো। রিপোর্ট আসুক তারপর দেখাচ্ছি মজা...'

'বয়স হয়েছে, তোর মা চলে গেছে, আমার আর মরে যেতে ভয় করে না... শুধু খুব চিন্তা হয় তোকে নিয়ে...' শীর্ণ হাতে ওর হাতটা চেপে ধরেন বাবা, 'তুই পারবি তো সোমু?'

'এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো, ব্যথা কমে যাবে...'

মিনিটদশেকের মধ্যে ভদ্রলোকের শরীরটা ঝিমিয়ে আসে। মাথাটা আবার বিছানার উপরে রেখে পিছিয়ে এসে চৌকাঠে বসে পড়ে সাম্য। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে বাবার দিকে। ওর পিঠে হাত রাখে বকুল, 'মন খারাপ করল তোর, না রে?'

'বাবা অকারণে বলল কথাটা...'

বকুল জোর করেই হাসে, 'অকারণে বলবে কেন? তোকে নিয়ে আমারও টেনশন হয়, তা বলে আমি কি চলে যাচ্ছি কোথাও?'

একটু নিশ্চিন্ত হয় সাম্য, চোখের কোণটা ঘষে নিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলে,

'ধুর, বাবাকে ছেড়ে থাকা যায়? আজ হোক, কাল হোক, একটা কেন, দশটা চাকরি পেলেও বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

'কেন?'

হাসে সাম্য, 'বাবা কলকাতা খুব ভালো চেনে। কোথায় কোন বাসে করে যাওয়া যাবে। কোন গলি দিয়ে গেলে শর্টকাট হবে বাবাকে জিজ্ঞেস না করলে জানব কী করে? বাবারা কি আর চিরকাল টাকাপয়সা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে যত্ন নিতে পারে? কিন্তু ওই যে একটা মানুষ যে একটা মাংসের ডেলার মতো আমিকে এই আমিতে নিয়ে এসেছে সে শুধু বিছানার উপরে শুয়ে থাকলেও তার দিকে তাকিয়ে ঢের ঢের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে যাওয়া যায়, অন্ধকার পার করে ফেলা যায়...'

বকুল বুঝতে পারে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আসছে, সেটা হালকা করতেই ও বলে, 'আর আমি? আমাকে ছাড়া থাকতে অসুবিধা হবে না?'

'কেন হবে না? যতদিন না আর একটা সুন্দরী মেয়ে পটিয়ে ফেলছি ততদিন খানিক অসুবিধা হবে বইকী...'

দুম করে রেগে গিয়ে হাতের বইটা তুলে ওর মাথায় মেরে দেয় বকুল, 'তবে রে হারামজাদা!'

সাম্য হাত তুলে বাধা দেয়, 'এই দেখ, বুদ্ধদেব কিন্তু পুরো অহিংসার কথা বলেছিল। আর তার বই দিয়ে তুই আমায় মারলি?'

বইটা নামিয়ে রাখে বকুল, তারপর দু-হাতের মুটো দিয়ে ওর চুল খামচে ধরে বলে, 'বেশ তোর সব ক-টা চুল তুলে আগে তোকে ন্যাড়া বানাই তারপর দেখছি বুদ্ধদেব কী বলে...'

দু-জনের চাপা চিৎকারে ঘর ভরে ওঠে।

***

'আচ্ছা তথাদা, আপনি সবাইকে মাথা ন্যাড়া করে ফেলতে বলেছিলেন কেন?'

'যাতে টাক পড়ার ভয় আর না থাকে...'

'যাঃ, ফালতু ইয়ার্কি মারছেন...'

'সত্যি। আমার সব শিক্ষার মূলে ওইটাই। যেটার ভয় পাচ্ছ সেটাকে একেবারে গোড়া থেকে উড়িয়ে দাও...'

গাছের একটা পাতায় টোকা মারতে মারতে সাম্য বলে, 'আপনার এই কিছু খিচকিল্লেপনার জন্য না আপনার ধর্মটা তেমন ফলোয়ার পেল না। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, কত সুন্দর সুন্দর নাম ছিল, আপনি কী নাম রাখলেন? স্তূপ! শালা শুনলেই ধাপার মাঠের কথা মনে পড়ে... নাঃ ধর্ম প্রচারক হিসেবে সেই ইয়েটা আপনার মধ্যে নেই...'

'বেশ, তাহলে কী করতাম বলো?'

লোকটার উপর থেকে নিচ একবার জরিপ করে সাম্য, তারপর বলে, 'লুকস টুকস তো খারাপ ছিল না আপনার, চেরা চেরা টানা চোখ, মাখনের মতো স্কিন, ফিনফিনে গলার আওয়াজ... ধর্ম-টর্ম ছেড়ে যদি গান গাইতেন কলকাতার কে-পপ লাভাররা আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিটিএস ফিটিএস বলে লাফালাফি করত...'

লোকটা এবার ভুরু কুঁচকে ওর দিকে ঝুঁকে বলে, 'আমাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা করে কী হবে? সেদিন ট্রেনে প্রেমিকা নেই বলে তুমি কাঁদছিলে না ফলোয়ার নেই বলে আমি কাঁদছিলাম?'

সাম্য কাঁধ ঝাঁকায়, 'আরে আপনি বকুলকে সব কষ্টের কথা খুলে বলতে বলেছিলেন। আমি চেষ্টাও করেছি, কিন্তু সবটা বলতে গেলেই কেমন ঘুলিয়ে ঘ হয়ে যাচ্ছে...'

'আমি সংস্কৃত ছেড়ে পালি ভাষায় কেন ধর্মপ্রচার করেছিলাম জানো?'

'কেন?'

'ভাষাটা সহজ ছিল বলে। কাউকে সাহায্য করতে গেলে বা কারও থেকে পেতে গেলে আগে খুব সহজ ভাষায় সবটা খুললে বলতে হয়...'

একটা অদ্ভুত হাসি হেসে মাথা নাড়ে সাম্য, 'উঁহু, কাউকে সবটা বলতে গেলে আগে নিজেকে বুঝতে হয় যে সবটা জেনেও সে পালিয়ে যাবে না। তবেই আমরা মুখ খুলতে পারি...'

'তাই নাকি?'

'এই যেমন ধরুন আপনাকে আমি সবটা বলতে পারি কারণ আমি জানি যতদিন মূর্তিটা আমার কাছে আছে আপনি কোথাও যেতে পারবেন না, তাই নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।'

তথাগত মুখ ফিরিয়ে নেয়, বলে, 'বেশ তাহলে এমন কিছু করো যাতে সে যেতে না পারে...'

সাম্য গাছের ডাল থেকে চোখ ফিরিয়ে চাঁদের দিকে তাকায়, 'আমার প্রেমিকার সঙ্গে মাঝে মাঝে হেব্বি ক্যাচাল হত জানেন। আমি রেগে গিয়ে বলতাম, 'যাও তুমি দূর হয়ে যাও আমার জীবন থেকে', কিন্তু ততদিনই বলতে পারতাম যতদিন জানতাম ও আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না। যেদিন বুঝতে পেরেছিলাম ও সত্যি চলে যেতে পারে সেদিন আর বলতে পারিনি...'

'যেমন তোমার বাবাকে আজ বলতে পারলে না।'

এই কথাটা আশা করেনি সাম্য, মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মানে? কী বলতে পারিনি?'

'বাবা চলে গেলে তুমি গুছিয়ে নিতে পারবে কি না, বাকি জীবনটা নিজের খেয়াল রাখতে পারবে কি না... বাবা-মাও কথাটা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে তোমার টানটা পরীক্ষা করতে, আজ কিন্তু অসহায়ের মতো জিজ্ঞেস করেছিলেন...'

'কারণ আমি সত্যিটা বলতে পারব না বাবাকে...'

'আমি তোমাকে সত্যি বলতে বলিনি...'

'আপনি নাকি সারাজীবন সত্যের অন্বেষণ করেছেন—আর আমাকে মিথ্যে বলতে বলছেন?'

তথাগত লম্বা হাত রাখে সাম্যের মাথায়, 'সত্যের খোঁজ করা আর সত্যি কথা বলা এক জিনিস নয় ভাই... মানুষকে তার যন্ত্রণার থেকে রেহাই দেওয়া হল সত্য...' কথাটা বলে মুখ তোলে সে, 'যাও বাড়ি যাও, তোমার বাবার আবার শরীর খারাপ করছে...'

মিনিট খানেক পরে ঘরে ঢোকে সাম্য। ওর ঢোকার সময় তেমন একটা

আওয়াজ হয় না। তাও বিছানার দিক থেকে উসখুস আওয়াজ আসে। বাবার দিকে এগিয়ে যায় সাম্য—

'বাবা...'

টেবিল ল্যাম্পের আলোটা কাঁপা কাঁপা হাতে জ্বেলে দেন ভদ্রলোক। চশমাটা চোখে গলিয়ে ওকে ভালো করে দেখে বলেন, 'তুই এত রাতে কোথায় যাস বল তো?'

'ধ্যান করতে, একটা কথা বলার ছিল তোমাকে।'

'বল...'

'তুমি না থাকলে আমার কষ্ট হবে ভীষণ। কিন্তু আমি নিজের জীবনটা চালিয়ে নিতে পারব। চিন্তা কোরো না তুমি...' ঠান্ডা কিন্তু দৃঢ় গলার আওয়াজ।

মানুষটার কুঁচকে যাওয়া ভুরু আবার সোজা হয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে ছেলের একটা হাত চেপে ধরেন তিনি, 'কত বড় হয়ে গেছিস তুই...'

বাবার হাতের স্পর্শ সাম্যর শরীরে গাছের পাতার মতো আদুরে মনে হয়। রক্তের গন্ধ মেখে বাবার পাশেই শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে ও। শুতে শুতে ওর মনে হয় ওর মতো বাবাও এক্ষুনি মিথ্যে বলেছে। ও আসলে অনেক ছোট হয়ে গেছে... একেবারে ছোটবেলার মতো...

(৬)

'তোর এখনও মায়ের জন্য মন কেমন করে, তাই না?'

ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সাম্য, 'কে বলল তোকে?'

'রাতবিরেতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাস শুনলাম। কোথায় যাস বলতো?'

'তোকে বললে বিশ্বাস করবি না।'

আজও সন্ধ্যায় ভাঙা নৌকাটার উপর এসে বসেছে দু-জনে। আজ দেখা হবার কথা ছিল না। কিন্তু কাল বকুল দু-দিনের জন্য মাসির বাড়ি যাচ্ছে ঘাটশিলা। সকালের ট্রেন। দিনতিনেক দেখা হবে না। তাছাড়া একটু পরেই সাম্যর বাবার রিপোর্টটা দেওয়ার কথা। যে কোনও সময় ফোন আসবে। টেনশনে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে সাম্যর। সে জন্যেই ছুটে এসেছে বকুল।

একটু দূরে ফাঁকা মাঠের উপরে ধীরে ধীরে শীত সন্ধ্যার ধোঁয়া নামছে।

একটা হাত দিয়ে ওর কম্পমান হাত চেপে ধরে বকুল, ‘এত চিন্তা করিস না। রিপোর্ট যাই আসুক, আমি আছি তো, একসঙ্গে লড়ে নেব। শুধু তোকে ঠিক থাকতে হবে...’

‘আমি ঠিকই আছি...’

‘কাকু বলল পাহাড় থেকে ফেরার পরই তোর মধ্যে কিছু একটা বদলে যাচ্ছে। সবসময় কেমন অন্যমনস্ক থাকিস, খাওয়া-দাওয়া করিস না, বিশেষ কথা বলিস না, হাসিস না... এই তুই সত্যি বুদ্ধিস্ট-ফুদ্ধিস্ট হয়ে যাচ্ছিস নাকি?’

ওর দিকে ফিরে তাকায় সাম্য, একটু দূরে জ্বলন্ত হ্যারিকেনের ফিকে আলো এসে পড়েছে মেয়েটার চোখের উপর। দুশ্চিন্তা মাখামাখি হয়ে রয়েছে ওর সমস্ত মুখের চামড়ায়। মায়া লাগে সাম্যর, ‘বেকার এত কিছু করে গেলি আমার জন্য, বদলে কিছুই পেলি না কোনওদিন...’

‘ধার হয়ে গেছে তোর আমার কাছে অনেক। একেবারে দিতে পারবি না। ইএমআইতে উশুল করব।’

‘আর যদি কিছুই না দিতে পারি?’

‘তাহলে লোক পাঠিয়ে একেবারে তুলে আনব বাড়ি থেকে...’

‘তাই নাকি? তারপর?’

‘একেবারে নিজের কাছে রেখে দেব।’ কথাটা বলে ওর হাতটা দু-হাতে চেপে ধরে বকুল, ‘অনেক অযত্ন হতে দিয়েছি তোর, আর দেব না।’

অদ্ভুত মায়ামাখা চোখ তুলে ওর দিকে তাকায় সাম্য, ‘মাঝে মাঝে মনে হয় তোকে সবকিছু খুব সহজ ভাষায় একেবারে জলের মতো বলে ফেলতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ওটাই একমাত্র সলিউশন সবকিছুর...’

‘তাহলে বল, আমি শুনছি তো...’

সাম্যর ঠোঁট কেঁপে যায়, ‘আমি জানি না কী করে বলতে হয়। খুব সহজ করে বলা সহজ নয়...’

‘বেশ, তাহলে আমি চেষ্টা করি?’

'কর...'

সাম্য বুঝতে পারে ওর হাতের উপর নরম হাতের চাপ বাড়ছে। বকুলের চোখদুটো ওর চোখে স্থির হয়ে আছে। অস্বস্তি হচ্ছে কি? সন্ধ্যার হাওয়াটা আরও ঘন হয়ে গেল না? নাকি সব ওর মনের ভুল? বকুল কিছু বলছে না কেন?

সাম্যর খেয়াল হয় ওর ফোনটা বাজতে শুরু করেছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ও ফোনটা রিসিভ করে। রিপোর্টের লোকটাই ফোন করেছে। ফোনটা কানে লাগিয়ে কাঁপা কাঁপা গলাতেই হ্যালো বলে ও। তারপর কয়েক সেকেন্ড সেভাবেই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে ফোনটা কেটে দেয়...

'হল কী? কী বলল রিপোর্ট?' বকুল অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করে।

'কিছু না। আমি পরে কথা বলছি...' কথাটা বলে একরকম ছুটেই মাঠের উপর জমাট ঁাধা কুয়াশার ভিতর হারিয়ে যায় সাম্য। সেদিকে চেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বকুল। হলটা কী ছেলেটার?

* * *

গাছের নিচে এসে আজ আর ডাকতে হল না। গাছের একটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসেছিল তথাগত। সাম্য নিঃশব্দে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে সে মুখ না ফিরিয়েই পাশের ঘাসের জমিটা দেখাল হাত দিয়ে, 'এসো, বসো এখানে...'

যন্ত্রচালিতের মতো সেখানে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল সাম্য। তারপর গাছের গুঁড়িতেই পিঠ এলিয়ে দিল। আজ চাঁদের দিকে পিঠ করে বসেছে তথাগত। ওর মাথার ঠিক পেছনে গোল পূর্ণিমার চাঁদটা। একটা রুপোলি বলয় তৈরি করেছে যেন।

তথাগত এক মনে চেয়েছিল আকাশের দিকে, বিড়বিড় করে বলল, 'পূর্ণিমায় আকাশটা কী সুন্দর দেখায়, না? আমি পূর্ণিমাতে জন্মেছিলাম, আর পূর্ণিমাতেই...'

'আমার বাবা আর বেশিদিন বাঁচবে না।' পাথরের মতো শীতল স্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করে সাম্য।

'জানি।' কথাটা বলে ওর দিকে ফিরে তাকায় তথাগত। তার টানাটানা দুটো চোখ আরও গভীর হয়েছে এখন। যেন গলিত কান্নার স্রোত অতল ছুঁয়েছে।

'আপনি আজ কিছু বলবেন না আমায়?'

তথাগত উত্তর দেয় না। ধীরে ধীরে হাতের চাপে সাম্যর মাথাটা কাছে টেনে নেয়। উত্তরীয়র স্পর্শ লাগে সাম্যর মাথায়। চোখ ঢেকে যায় অন্ধকারে। মায়ের কোলের মতো চেনা উষ্ণতা গলিয়ে দেয় সাম্যকে। সে উষ্ণতাতে মাথা রেখেই শান্ত হয়ে বসে থাকে ও। কান্না আসে না, ভয় আসে না, যন্ত্রণার ঢেউ ওকে স্পর্শ করে না।

দু-হাতে তথাগতকে জড়িয়ে ধরে ও। পূর্ণিমার গোল চাঁদের দিকে চুপ করে সারারাত চেয়ে থাকে দু-জনে, রাত বাড়তে থাকে...

(৭)

ভোরবেলা ভাঙা নৌকাটার কাছে এসে একটু অবাকই হয় বকুল। এত সকালে সাধারণত দেখা করে না ওরা। কিন্তু আজ একেবারে ভোরে ফোন করে জরুরি তলব। একটু পরেই বকুলের ট্রেন, ট্রেনে ওঠার আগে একবার দেখা করে যেতেই হবে। কীসব নাকি বলার আছে সাম্যর।

ভাঙা নৌকাটার সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় বকুল, 'এই, ব্যাপার কী তোর? কাল রিপোর্টের কথা কিছু না জানিয়েই হুট করে চলে গেলি...'

'বাবা ঠিক আছে, কিছু হবে না। আমার তোকে কিছু বলার ছিল...' সাম্যের কথার মধ্যে কেমন যেন নেশার ঘোর আছে। মনে হয় ওর মধ্যে থেকে অন্য কেউ কথা বলছে। এখন সকাল বলে হ্যারিকেনটা জ্বলছে না। জায়গাটাকেও অন্যরকম লাগছে বকুলের।

'সেইটা শুনতেই তো এলাম, বল কী বলবি?'

সাম্য তেমনই শান্ত গলায় বলে, 'ছোট থেকে এমন কোনও সময় ছিল না যখন তুই আমার পাশে ছিলিস না...'

'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?' বকুল একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করে।

'কেন?'

'কারণ আমি তোকে ভালোবাসি...'

'মানে?'

'মানে আবার কী? ভালোবাসি মানে বাসি। তুই তো বলেছিলি সবকিছু সোজা কথায় সোজা ভাবে বলতে, বলে দিলাম...'

ওর দিক থেকে একবার পিছিয়ে আসে সাম্য। তারপর মুখ তুলে বলে, 'আমি আসলে...'

হঠাৎ ওর মুখের সামনে নিজের মুখটা নিয়ে আসে বকুল, 'কেন, তুই ভালোবাসিস না?'

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল সাম্য। থেমে যায়। একটা অদ্ভুত স্রোত খেলে যায় ওর সমস্ত শরীর জুড়ে, ওর মনে হয় বহু যুগ ধ্যানের পর যেন চোখ মেলে তাকিয়েছে ও। সমস্ত যন্ত্রণার উপশম ওর সামনে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তটার জন্যেই তো অপেক্ষা করছিল এতদিন... অবাক হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে তাকায়। সমাধান ওর হাতের কাছে ছিল এতদিন, আর ও পাগলের মতো খুঁজেছে, বুঝতে পারেনি...

'না...' দৃঢ় গলায় বলে সাম্য।

হেসে ফেলে বকুল। ওর দুটো হাত গালে উঠে আসে সাম্যের গালে, আদুরে একটা চড় মেরে বলে, 'এত সামনে থেকে মিথ্যে বলতে নেই জানিস না?'

'আমি তোকে ভালোবাসি না বকুল...' আগের মতোই কঠিন অথচ শান্ত গলা।

নিজের মুখটা সরিয়ে আনে বকুল, ওর চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন, 'বাসিস না? সত্যি কোনওদিন বাসিসনি?

'না সত্যি কথা বলতে আমি চাই না। তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রা...।'

'মানে! কী বলছিস এ সমস্ত?'

'হ্যাঁ। আমার জীবন থেকে চিরকালের মতো তোকে চলে যেতে বলছি।

কোনও যোগাযোগ না, মেসেজ, ফোন, কিছু না...'

'কিন্তু তোর কী লাভ হবে তাতে?'

'তা জানি না, কিন্তু আমার জীবনে তোর কোনও অস্তিত্ব আমি চাই না। তুই চলে যা...'

বকুলের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। সেটা কোনওমতে সামলে নেয় সে। গলা বুজে আসছিল, রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'তুই সত্যি বলছিস? এটাই চাস তুই?'

উপরে নিচে মাথা নাড়ে সাম্য। বকুল বুঝতে পারে ও মজা করছে না। বরঞ্চ এতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আগে দেখায়নি ওকে।

'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, আর কোনওদিন দেখা হবে না...'

কথাটা বলে পেছন ফিরে হাঁটতে যাচ্ছিল বকুল। হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে সাম্যের, ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এই দাঁড়া, আমার কিছু দেওয়ার আছে তোকে...'

নিজের ব্যাগটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা কালো পাথরের বুদ্ধমূর্তি বের করে আনে সে। তারপর সেটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'এটা নিজের কাছে রাখিস, সবসময়...'

বকুল আর কিছু বলে না। দু-হাতে বুদ্ধমূর্তিটা ধরে সেটা কোলের কাছে টেনে নেয়। তারপর রুদ্ধকণ্ঠেই বলে, 'বেশ, এবার আসছি...'

আর কথা না বাড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পা চালায় বকুল। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে না একবারও।

সাম্য সেভাবেই স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। ওর ঠোঁট কাঁপে না, কিন্তু ধীরে ধীরে একটা হাসি ফুটে ওঠে মুখে। বকুলের চলে যাওয়া পথের দিকে একটানা চেয়ে থাকে ও। ও জানে মেয়েটা আজ ট্রেনে উঠে সারারাত কাঁদবে। ঘুম হবে না, জলের ধারা ওর মুখ ভিজিয়ে দেবে। আর সারা রাত বুদ্ধমূর্তিটা থাকবে ওর মাথার কাছে। কাল সকালবেলা উঠে ওর পাশের বার্থে খুঁজে পাবে একটা লম্বাটে চেহারার বছর ত্রিশেকের যুবককে। যে ওকে সারিয়ে দিতে পারবে... সব যন্ত্রণার থেকে মুক্তি দিতে পারবে... চিরকালের মতো...

প্রিয়জনকে, ভালোবাসার মানুষকে, সারিয়ে তোলার থেকে বেশি সেরে ওঠা আর কিছুতে নেই...

ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ভিজে আসে সাম্যের। অথচ মনের সমস্ত ব্যথা একটু একটু করে পুড়ে ছাই হতে থাকে। একটা অপরিচিত নিরাপত্তা, জ্বর ছাড়ার অনুভূতি ঘিরে ধরে ওকে...

ওর কাঁধে কি কারও নিশ্বাস পড়ছে? না, সাম্য জানে আশপাশে কেউ নেই। তাও ওর মন বলে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে ওর মতোই দূরের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে আছে একটা লম্বাটে চেহারার বছর ত্রিশেকের যুবক।

দূরে এতক্ষণে বকুলের ছোট হয়ে আসা শরীরের পাশে জড়ো হয়েছে আরও কয়েকটা ছায়া, মায়ের ছায়া, বাবার ছায়া, একটা অল্পবয়সি মেয়ের ছায়া, তারা সবাই হেঁটে চলে যাচ্ছে দূরে... আরও দূরে... মিলিয়ে এল একসময়...

নিজেকে এক অন্ধ জাতিস্মর মনে হয় সাম্যর। হাজার বছর ধরে যেন হেঁটেই চলেছে সময়ের পথে। কত স্মৃতি-রাজরাজড়াদের, যুদ্ধের, দুর্ভিক্ষের, প্রেমের, যন্ত্রণার, একাকিত্বের, সভ্যতার... দৃশ্যগুলো ভুলে গেছে, কেবল অনুভূতিগুলো রয়ে গেছে এ জন্মে...

দূরে জমাট কুয়াশার দিকে চেয়েই ও বিড়বিড় করে বলে, 'ওদের সারিয়ে দিলাম, বলো তথাদা?'

'তার বেশি আর কী করতে পারি আমরা?'

পেছন ফেরে সাম্য। না, কেউ নেই ওর আশপাশে। মিহি রোদ খেলা করছে সমস্ত জায়গাটায়। সেই রোদেই ফেলে আসা রাস্তার উপরে ওর নিজের ছায়াটা পড়েছে। একটা দীর্ঘ, শান্ত, পরিচিত ছায়া...

জানি, তুমি অনন্য

(এক)

রাতে ঝমঝম করে বেজে ওঠা ফোনের শব্দে বিছানার উপর উঠে বসল অনির্বাণ। এমনিতে পেশাগত কারণে রাতবিরেতে ওর কাছে ফোন আসা আশ্চর্যের কিছু নয়। অন্যদিন হলে রিসিভই করত, কিন্তু আজ মেজাজটা একেবারেই ভালো নেই। সারাদিন চেম্বারে বিস্তর খাটনি গেছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে আর ভালো লাগছে না।

ফোনটা কেটে দেবেই ভাবছিল। হঠাৎ কলার আইডিতে ভেসে ওঠা নামটা দেখে থেমে গেল। ওর কোনও পেশেন্ট কিংবা তার বাড়ির লোক নয়। সেখানে জেগে আছে অনিকেতের নাম।

অনিকেত ওর কলেজ জীবনের বন্ধু। একটা সময় হৃদ্যতা ছিল দু-জনের। অনির্বাণ চিরকালই একটু ডাকাবুকো গোছের। অনিকেত ঠিক উল্টো। কোথাও কিছু গন্ডগোল হলেই ভয়ে কুঁকড়ে বসে থাকত। টেনশনে হাত-পা গুটিয়ে আসত। ওর চরিত্রের সব থেকে বড় বৈশিষ্ট্যই ছিল ওইটা, টেনশন।

কলেজ শেষ হওয়ার পর দু-জনের যোগাযোগ একেবারেই কমে এসেছিল। কিছুদিন আগে অনিকেত নিজেই ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়। সেই সূত্রেই অনির্বাণ জানতে পারে বছর তিনেক হল একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে অনিকেত। একটা আইটি কোম্পানিতে দু-জনেই চাকরি করছে। মাঝে মাঝে মেয়েটার সঙ্গে ছবি আপলোড করে। অনির্বাণ তাতে লাভ রিঅ্যাক্ট দেয়।

কিন্তু এখন রাত প্রায় আড়াইটা বাজে। এই সময়ে পুরনো বন্ধুকে তো কেউ গল্পগুজব করার জন্য ফোন করে না। কোনও বিপদ হল নাকি? অবশ্য অকারণে যেরকম টেনশন করত ছেলেটা... একরকম উৎকণ্ঠা নিয়েই ফোনটা ধরে অনির্বাণ,

—বল ভাই, এত রাতে...

—আমি একটা ঝামেলায় পড়েছি ভাই।

—সে তো তোর গলা শুনেই বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার, কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে কারও?

—কারও নয়, আমার।

—তোর! কী হয়েছে?

—আমার মনে হয় মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এই উত্তরটা অনির্বাণের কাছে নতুন নয়। ওর অনেক পেশেন্টেরই থেকে থেকে এরকম একটা সন্দেহ জাগে মনে। সত্যি কথা বলতে মাথাখারাপ মানুষ মাত্রই অল্পবিস্তর থাকে। তারা নিজেরা যদি সেটা বুঝতে পারে সেটা আরেক ধরনের ছিটলামো।

—সাডেনলি এরকম ভাবছিস! কিছু ঘটেছে?

—তুই সঞ্চারীর কথা তো জানিস?

—হ্যাঁ...

—ওর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে।

—দেখ ছেলেদের মাথাটা বিয়ের পর খারাপ হয়, আগে নয়।

—আমি ইয়ার্কি মারছি না ভাই। আমার মনে হচ্ছে আমার এই বিয়েটা করা উচিত নয়।

—উচিত নয়! কেন?

—

পরের কথাগুলো একটু সময় নিয়ে বলে অনিকেত। অনির্বাণ বুঝতে পারে কথাগুলো প্রয়োজনের থেকে একটু বেশি জোর দিয়ে বলছে সে, ‘দেখ,

আমার প্রেমটা তিন বছরের। বুঝতেই পারছিস প্রথম প্রেমের উষ্ণ ছোঁয়া-ফোয়া যেগুলো হয় সেসব আমার মধ্যে নেই। ব্যাপারটা ডাল-ভাত-গামছা-সাবানের মতো হয়ে গেছে...'

'তো?'

'তো জানি না কেন একটা ভাবনা দিনদিন আমার মাথার ভিতর চেপে বসছে। আমার কেবল মনে হচ্ছে সঞ্চারীর মতো মেয়ে আর এ দুনিয়াতে নেই...'

অনির্বাণ উত্তর দিতে গিয়ে এবার হেসে ফেলে, 'এতে পাগলামির কী আছে? কাউকে ভালোবাসলে এসব মনে হতে পারে। যা গিয়ে ঘুমিয়ে পড়... রাত হয়েছে...'

বিরক্ত গলায় ধমকে ওঠে অনিকেত, 'আঃ, আমার কথাটা শোন। ব্যাপারটা অত সহজ না। তুই আমাকে এরকম যাত্রাপালা টাইপের ডায়ালগ দিতে শুনেছিস আগে? আমার কেবলই মনে হচ্ছে সঞ্চারী এই পৃথিবীর অন্য সব মেয়েদের থেকে আলাদা। কিন্তু কোথায় আলাদা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না... কিছুতেই আইডিয়াটা থেকে বেরতে পারছি না...'

অনিকেত ছেলে ছোট থেকেই এরকম পাগলাটে। ফলে অনির্বাণ খুব একটা অবাক হয় না, একবার হাঁই তুলে বলে, 'এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা ভাই। তুই, আমি, সবাই... যাই হোক, শুধু এটাই না আরও কিছু?'

ওপাশ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসে, 'শুধু এটা হলে তো চিন্তা ছিল না। কিন্তু... তুই তো জানিস আমি ছোট থেকেই নার্ভাস। সেটা যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে। কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তা হলেই বাড়ির লোককে জ্বালিয়ে মারি। ইদানীং ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর র‍্যাপিডলি বেড়ে যাচ্ছে... একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে, বুঝলি?'

'কী মনে হচ্ছে?'

'এই টেনশন করার ব্যাপারটা আমার বাতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখলাম এটাকে তোদের ভাষায় ওসিডি বলে। আর সেটা হলে আমাকে বিয়ে করে ওর লাইফটা হেল হয়ে যাবে ভাই...'

অনির্বাণের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, এই ফালতু বকার জন্য মাঝরাতে ফোন করেছে? রেগে মেগেই বলে, ‘আগে ইন্টারনেটে ডাক্তারি ফলানোটা বন্ধ কর। ওসিডি কি জ্বর-সর্দি-কাশি নাকি যে হুট করে সেট ইন করবে?’

‘না, হেরিডিটারি, আমার দাদুর ছিল। ঠাকুমা কিছুটা ওনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্যই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে... মানসিক রোগ অনেক সময়ই তো হেরিডিটারি হয়...’

আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেল তো। অনির্বাণের মাথাটা আরও কয়েক পরত গরম হয়, ‘তা হতে পারে। এমনকী অন্য কোনও মানসিক সমস্যাও থাকতে পারে। আপাতত তোর কেবল এটা মনে হচ্ছে যে সঞ্চারীর মতো মেয়ে আর হয় না। কিন্তু তার জন্য...’

‘আমি চাই না সঞ্চারীর অবস্থা আমার ঠাকুমার মতো হোক... তুই আমায় একটু টাইম দিতে পারবি?

অনির্বাণ বিছানার উপর উঠে বসে একবার মাথায় হাত ঘষে, ‘বেশ, তোর পয়সা খসানোর ইচ্ছা হয়েছে যখন আমি বারণ করার কে? টাইম করে চলে আয়... আর আপাতত ঘুম না এলে একটা কাজ কর...’

‘কী কাজ?’

‘যে যে কারণে তোর মনে হচ্ছে ব্যামোটা তোর মাথায় চেপেছে সেগুলো লিখে রাখ...’

ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে অনির্বাণ। মাথাটা গরম করে দিল রাতবিরেতে।

এক্ষুনি আর ঘুম আসবে না। আড়মোড়া ভেঙে ফেসবুকটা স্ক্রল করতে থাকে অন্যমনস্কভাবে। অনিকেতের প্রোফাইলটা হাতের কাছে আসে। ওর কয়েকটা ছবি আর ভিডিও প্রোফাইলে পরপর উঠে আসতে থাকে। সেগুলো মন দিয়ে দেখতে থাকে অনির্বাণ। দু-জনের একসঙ্গে ছবি, আলাদা আলাদা সেলফি হাই তুলতে তুলতে সেসব দেখতে থাকে অনির্বাণ। হুট করে এক জায়গায় ওর চোখ আটকে যায়...

(দুই)

মিউজিক স্কুলে ঢুকে সবার আগে অনিকেতের মনে হয়েছিল এসব ওর জন্য না। মিউজিক শেখার খুব যে একটা আগ্রহ আগে ছিল তাও না। তবে কলেজ শেষ করা আর পুরোদমে চাকরি শুরু করার মাঝের সময়টা একটা ক্রিয়েটিভ কিছু না করলেই নয়। কিন্তু ব্যাজার মুখে ক-দিন কন্টিনিউ করতেই সুরের প্রেমে পড়ে যায় অনিকেত। ওর অস্থির মনটাকে, মনের ভিতর চলা সর্বক্ষণের টেনশনটাকে, একমাত্র মিউজিকই শান্ত করতে পারে।

অল্পবিস্তর গিটার আগে বাজাতে পারত অনিকেত। ছেলেবেলায় মহব্বতে দেখে ভায়োলিন বাজানোর শখ জেগেছিল। কিন্তু দু-বার ছড় টানতেই শেয়ালের চিৎকারের মতো আওয়াজ হতে বুঝেছে ও জিনিস ওর জন্য না।

সেদিন সবে বাজনার ক্লাস শেষ হয়েছে। ক্লাস শেষ করে কমন রুমে বসে যন্ত্রপাতি গোছাচ্ছিল। ঘরে ও ছাড়া আর একটা মাত্র মেয়ে বসে। নতুন ভর্তি হয়েছে মেয়েটা। একটা একুস্টিক গিটার হাতে নিয়ে টুংটাং শব্দে টিউন করার চেষ্টা করছে। সম্ভবত এখনও ঠিক করে টিউন করতে শেখেনি। মাঝে মাঝেই বিকট শব্দ করে আর্তনাদ করছে গিটারটা। না চাওয়া সত্ত্বেও একবার সেই আওয়াজ শুনে হেসে ফেলেছিল অনিকেত। মেয়েটা আড় চোখে সেটা দেখে মনে মনে খেপেছে।

মেয়েটাকে এমন আহামরি কিছু দেখতে নয়। মাঝারি রং, রোগাটে গড়ন, চোখে একটা পাতলা ফ্রেমের চশমা, মুখের উপর বিন্দুবিন্দু ঘাম জমেছে। এতক্ষণেও যন্ত্রটা টিউন না হওয়ায় যথেষ্ট অসহায় দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। অনিকেতের খারাপ লাগল। উঠে গিয়ে একবার সরি বলবে কি? বললে কি আরও রেগে যাবে? বলবে? ভিতরে ভিতরে অস্থির লাগল অনিকেতের...

'ইয়ে, ম্যাডাম, একটা কথা বলব?'

কান মুচড়ানো থামিয়ে মুখ তোলে মেয়েটা, তারপর আবার নামিয়ে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ বলুন...'

কিন্তু অনিকেত তখন আর বলার অবস্থায় নেই। মেয়েটার চোখে চোখ

পড়তেই যেটা বলার ছিল সেটা বেমালুম গুলিয়ে গেল। সব তালগোল পাকিয়ে যেটা বলতে চাইছিল না সেটাই বলে ফেলল, 'বলছিলাম, ইয়ে... আপনার লিপস্টিকটা একটু ঘেঁটে আছে। মানে ডানদিকটা ঠিকই আছে। বাঁদিকেরটা একটু কেমন উঠে মতো গেছে...'

কথাগুলো আশা করেনি মেয়েটা। একটু অপ্রস্তুত হয়ে পিঠের ব্যাগ টেনে চেন খুলতে থাকে সে।

অনিকেত একটু ইতস্তত করে বলে, 'আসলে অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিলাম, কিন্তু আপনি কী মনে করবেন ভেবে...' ও বুঝতে পারে কথাগুলো নিজে বলছে না। ভিতরে জমাট বাঁধা টেনশন ওকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে আর পরিস্থিতি একটু একটু করে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

'না না, এতে মনে করার কী আছে,'

'না, মানে যদি ভাবেন আমার নজরের দোষ...'

'ওটা মনে করছি না। বুঝতে পারছি...'

এক ধাক্কায় মাথাটা টং করে জ্বলে ওঠে অনিকেতের, 'অদ্ভুত বেইমান তো আপনি! বলতে কী চাইছেন?'

'যেটা আপনি বলে ফেললেন...'

টেবিলের উপর একটা চাপড় মারে অনিকেত, 'এই জন্য বলে আজকের যুগে কারও ভালো করতে নেই। এরকম লিপস্টিক ওঠা ঠোঁট নিয়ে বাড়ি যেতেন তারপর বাড়ির লোক ভাবত বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে চুম্মাচাটি করে ফিরেছেন, সেটাই ভালো হত, তাই না?'

'হুহ্...' মেয়েটা ঠোঁট বাঁকায়, 'আমার বাড়ির লোক ভালো করে জানে ওসব বয়ফ্রেন্ড টয়ফ্রেন্ড আমার নেই...'

'শুধু বাড়ির লোক কেন, আপনার এই বিলিতি আমের মতো থোবড়া দেখে আর এই ট্যাঙস ট্যাঙস চোপা শুনে যে কেউ ওটা বলে দিতে পারবে...'

'আর নিজের চোপাটা দেখেছেন? গায়ে পড়ে জ্ঞান দিয়ে আবার কথা শোনাচ্ছেন! আপনার সঙ্গে বেশিদিন থাকতে গেলে তো যে কেউ উন্মাদ হয়ে যাবে...'

'কই আপনি তো বেশিদিন আমার সঙ্গে থাকেননি...'

মেয়েটার মুখ এতক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। টেবিলের উপর পড়ে থাকা পেপারওয়েটটা শক্ত করে ধরে বলে, 'দেখুন, আমাকে রাগাবেন না, রাগলে আমার ভিতর থেকে একটা পশু...'

'আরে রাখুন আপনার পশু, খাটাল থেকে শুধু গরু আর গরুর গু-মুত বেরয়...'

মেয়েটা এবার পেপারওয়েট হাতে নিয়েই এগিয়ে আসে, 'বড় বুকনি মারছেন যে, আপনি জানেন আমার বাবা কে?'

'এমন কেউ যাকে একটা দিনের ভুলের মাশুল দিনের পর দিন গুনতে হচ্ছে... যত সব পাগল শালা...'

অনিকেত ফিরে আসছিল, মেয়েটা সিংহবাহিনী হয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসে, 'আমি পাগল, না? আপনাদের মতো কুৎসিত পুরুষদের আমার চেনা আছে। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তাদের পাবেন না জেনে হিংসা হয় আপনাদের। তাই তাদের বোকা নির্বোধ, মাথা খারাপ এইসব বলে নিজেদের হতাশা বের করেন...'

'আপনার যদি নিজেকে সুন্দরী মনে হয় তাহলে শুধু মাথা কেন আপনার চোখের দৃষ্টি নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার...'

কপালের শিরা ফুলিয়ে এবার গর্জে ওঠে মেয়েটা, 'আপনি আর একটা অপমান করলে আমি কিন্তু এবার চিৎকার করব...'

'সেকি! এতক্ষণ কি তাহলে চিৎকার করছিলেন না?'

এবার আর রাগ সামলাতে পারে না মেয়েটা। হাতের পেপারওয়েটটা সজোরে অনিকেতের কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। ঠং করে একটা শব্দ করেই মাটিতে পড়ে ভেঙে যায় সেটা। অনিকেতের দুনিয়া দুলে ওঠে। ওর মনে হয় ওর মাথাটাও অমন করেই মাটিতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কপাল বেয়ে নামা তরলের অনুভূতি চোখ ঢাকতে সে বুঝতে পারে মেয়েটা উদ্ধত ভঙ্গিতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে...

অনিকেতের চোখ যখন খুলল তখন সে হসপিটালের বেডে শুয়ে। মাথায়

ঝনঝনে একটা ব্যথা। সেটার উপরে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে বসতেই সামনে ঝুঁকে পড়া একটা লোকের মুখ দেখতে পেল। লোকটার গায়ে পুলিশের ইউনিফর্ম। সম্ভবত জরুরি তলবে কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন। ওকে চোখ খুলতে দেখে লোকটার মুখের উদ্বিগ্ন ভাব খানিকটা কমে এল মনে হয়।

'কেমন লাগছে শরীর? ব্যথা আছে?'

অনিকেত মাথা নাড়ায়। কিছু বলে না।

'ডাক্তার বলল আপনার চোট খুব একটা গুরুতর নয়। একটু রক্তও বেরিয়েছে। নরমের উপর দিয়েই গেছে...'

'আপনি...'

'আমি সঞ্চারীর বাবা। তোমার বাড়ির লোককে আমিই খবর দিয়েছি... একটু পরেই চলে আসবেন।'

নামটা কানে যেতেই অনিকেতের কান আবার গরম হয়ে উঠল। কপালে পেপারওয়েট মেরে আবার বাবাকে পাঠানো হয়েছে ক্ষমা চাইতে। সে ঘড়ির দিকে তাকাল। মাঝে দেড় ঘণ্টা কেটে গেছে।

'দেখ। কিছু মনে কোরো না। তুমি তো আমার ছেলের মতোই। আসলে আমার মেয়ের মাথাটা একটু গরম...'

'একটু!' অনিকেত গর্জে ওঠে, 'আরেকটু বেশি গরম হলে আমার বডিটাই এতক্ষণে ঠান্ডা হয়ে যেত...'

'আমি বুঝতে পারছি। তোমার চিকিৎসার জন্য যা দরকার হয়...'

'আগে আপনার মেয়ের একটু ভালো করে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করুন। মাথার ডাক্তার দেখাননি ওকে?'

উপরে নিচে মাথা নাড়েন ভদ্রলোক, 'দেখিয়েছি...'

'তাতে ফল হয়নি কিছু?'

'হয়েছে, ডাস্টার...'

'ডাস্টার? মানে?'

'মানে তোমাকে পেপারওয়েট মেরেছে, ওঁকে ডাস্টার...'

অনিকেত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভদ্রলোক কপালটা একবার ঘষে নিয়ে

বলেন, 'যাই হোক, আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি ভাই। শুধু আমি কেন, ও নিজেও বাইরেই আছে। এক্ষুনি...'

অনিকেত আঁতকে ওঠে, 'না, না তার আবার কী দরকার...'

কে শোনে কার কথা? ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘরে ঢুকে আসে সঞ্চারী। ধীরে পায়ে এগিয়ে এসে ওর বিছানার পাশে দাঁড়ায়। মাটির দিকে চেয়ে কঠিন অথচ শান্ত গলায় বলে, 'বাবা বলেছেন আপনাকে সরি বলতে...'

'কিন্তু আপনি বলবেন না, তাই তো?

হঠাৎ করেই মুখ তোলে মেয়েটা, অনিকেত বুঝতে পারে তার মুখে অপরাধবোধ স্পষ্ট, খানিকটা কান্নাকাটি করেছে কি?

আচমকাই বিছানায় কাছে এগিয়ে এসে অনিকেতের হাত চেপে ধরে সে, 'আমার সত্যি আপনাকে অত জোরে মারা উচিত হয়নি...'

'অত জোরে মানে? ওর থেকে একটু কম জোরে মারাও উচিত ছিল না...'

'আপনি গিটার টিউন করা দেখে হাসলেন কেন? তাতেই তো আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল। কেউ কিছু না পারলে না হেসে তাকে সেটা শিখিয়ে দিতে হয়...'

'বেশ, সুস্থ হলেই আপনাকে শিখিয়ে দেব...'

মেয়েটা খুশি হয়ে বলে, 'ডিল, আপনি আমাকে গিটারের কান মুলে টিউন করা শিখিয়ে দিন, আমি আপনার কান মুলে আপনাকে টিউন করে দেব...'

অনিকেত হেসে ফেলে, মেয়েটা ভুরু কুঁচকে বলে, 'হাসছেন যে বড়! আপনার ভয় করছে না আমাকে?

অনিকেত টেবিলের উপর পড়ে থাকা ওষুধের শিশিটা এক ঝটকায় সরিয়ে ফেলে বলে, 'না না, ভয়ের কী আছে!'

এবার দু-জনেই হেসে ফেলে।

খানিক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মেয়েটা। অনিকেত মনটা অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করে। কপালের ব্যথাটা আগের থেকে একটু কমেছে। বাড়ির লোক কি এতক্ষণে এসে পড়েছে? ওরা কি দুশ্চিন্তা করছিল এতক্ষণ?

হাবিজাবি কথা ভাবতে গিয়েও লাভ হয় না। কিছুক্ষণ পরে পরেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে ওর মনটা। মেয়েটার মুখটা ভেসে উঠছে বারবার। একটা খয়েরি সালোয়ার কামিজ পরেছিল বোধহয়। চোখে একটা পাতলা ফ্রেমের চশমা। গালের একপাশে একটা তিল আছে। মাথার ভিতর যে এত রাগ গিজগিজ করছে সেটা বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। সব মিলিয়ে ভারি সাধারণ একটা মুখ। কিন্তু সেই মুখটাকেই কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না অনিকেত।

আচ্ছা মেয়েটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েই ওকে ভুলে যাবে না তো? যাবার আগে আবার দেখা হবে জাতীয় কিছু বলে তো গেল না। ফোন নম্বরটা অবধি... পরদিন মিউজিক ক্লাসে আবার দেখা হলে কি অপরিচিতের মতোই আচরণ করবে?

নিজের মাথার মধ্যে ভিড় করা চিন্তাভাবনাগুলোয় নিজেই অবাক হয়ে ওঠে অনিকেত।

(তিন)

'দেখ আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে তুই ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করছিস। মানসিক রোগ কারও এরকম হুট করে হতে পারে না...'

অনির্বাণের চেম্বারের জানলাগুলো বিশাল। স্বচ্ছ কাচ লাগানো তাতে। ফলে বাইরের অনেকটাই দেখা যায়। বাইরে শীতের রোদ ঝলমল করছে। প্রায় জানলার কাছ অবধি উঠে আসা নারকেল গাছের পাতা সে রোদে স্নান করছে যেন। এ দৃশ্য একবার দেখলেই মন হালকা হয়ে যায়।

আজ বেশ কয়েকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল অনির্বাণের। তাও এই সময়টুকু কেবল বন্ধুর জন্যই রেখেছিল। ঠিক দুটো বাজার পাঁচ মিনিট আগেই এসে উপস্থিত হয়েছে অনিকেত। ওর হাত পায়ে একটা উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। বোঝাই যাচ্ছে ভালোমতো টেনশনে রয়েছে। মুখের দিকে তাকালে মায়া লাগে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রাখে অনির্বাণ। একটু

আগের কথাটা অনিকেতের কানে যায়নি। সে নারকেল গাছের দুলন্ত পাতার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে, 'তুই বল আমার যদি সত্যিই ওরকম কিছু হয় তাহলে আমাদের ফিউচারটা কেমন হতে পারে?'

অনির্বাণ একটু সময় নিয়ে ভেবে বলে, 'সেটা ডিপেন্ড করছে সিভিয়ারিটি কতটা হচ্ছে তার উপর। অল্পবিস্তর ওসিডি প্রায় সবার মধ্যেই আছে। যেমন ধর কারও শুচিবাইগ্রস্থতা থাকে। তাদের সারাক্ষণ মনে হয় হাতে নোংরা লেগে আছে, পাঁচ মিনিট অন্তর তারা হাত ধুতে থাকে। কারও কারও সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার বাই থাকে, একটু এদিক ওদিক হলেই তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কেউ একটু দুশ্চিন্তা হলেই মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে, ছিঁড়তে ছিঁড়তে টাক পড়ে যায়। তবে এগুলো সবই প্রাথমিক স্তর। এটা বাড়তে থাকলে আস্তে আস্তে ব্যাপারটা নিজের বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে পড়ে... তখন গোটা ব্যাপারটা পারসোনালিটি ডিসর্ডারের মধ্যে চলে যায়...'

'দাদুর যেমন হয়েছিল... ছোট থেকে অল্পসল্প অবসেশন ছিল। বিয়ের পর থেকে সেটা বাড়তে থাকে। পান থেকে চুন খসলে টেনশন, সেখান থেকে চিৎকার চেঁচামেচি। দিনের পর দিন যেতে যেতে সেটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে পরিণত হয়। বাবা মাঝে মাঝেই দেখত ঠাকুমার সাড়া গায়ে মারের দাগ... একদিন সেই অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে... ঠাকুমা মারা যাওয়ার পরও দাদুর রোগটা সারেনি। মাঝে মাঝেই দেওয়ালে মাথা ঠুকত... একদিন আমি নিজেই দেখেছিলাম... গোটা কপাল জুড়ে রক্ত... উফফফ...'

'সম্ভবত ব্যাপারটা পারসোনালিটি ডিসর্ডারের জায়গায় গেছিল। আমি নিজে এমন পেশেন্ট কম দেখিনি...'

'এর কোনও কিওর নেই?'

দু-পাশে মাথা নাড়ায় অনির্বাণ, 'এখনও অবধি না। সিম্পটমগুলো কোনওভাবে কন্ট্রোলে রাখা যায় বটে কিন্তু পুরোপুরি সারিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব!'

'জোর করে রোগটা চেপে রাখা যায় না? মানে ধর রোগটা আমার আছে জেনে কেবল ওর সামনে বিহেভিয়ারগুলো প্রকাশ করলাম না...'

মিহি হেসে মাথা নাড়ায় অনির্বাণ, 'মানসিক রোগ, বিশেষ করে অবসেশন চেপে রাখা যায় না। ঘণ্টাখানেক চাইলে করা যেতে পারে। কিন্তু কারও সঙ্গে দিনের পর দিন থেকে...'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে অনিকেত, মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'আমি সঞ্চারীর সঙ্গে জেনে বুঝে এটা হতে দিতে পারি না...'

ওর কাঁধে একটা ধাক্কা দেয় অনির্বাণ, 'অকারণে বেশি ভাবছিস। আপাতত তোর শুধু মনে হচ্ছে যে সঞ্চারীর মতো মেয়ে আর হয় না। এবং সেই ভাবনার কারণ না জানাটা তোকে ভেতরে ভেতরে অস্থির করে তুলছে। এছাড়া আর কিছু ছোটখাটো কারণ...'

'কারণগুলো মোটেই ছোটখাটো নয়...' চেয়ার থেকে উঠে কাছের জানলার দিকে এগিয়ে যায় অনিকেত, 'দেখ ছ-মাস পরে আমাদের বিয়ে। তারপর আর পিছিয়ে আসার জায়গা নেই। আমি নিজের সুখের জন্য ওর জীবনটা হেল করতে চাই না। যদি জিনিসটা অল্পের উপর থাকে তাহলে আমার থেকে বেশি খুশি কেউ হবে না, কিন্তু যদি এমন করে বাড়তে থাকে...'

অনির্বাণের গলা অনেকটা খাদে নেমে আসে এবার, নরম শান্ত স্বরে সে বলে, 'বেশ, আমি তো আছিই। আমার কাছে আয় ক-দিন। যা জিজ্ঞেস করছি খুলে বল। তারপর দেখছি সত্যি তোর ওসিডি আছে, নাকি সুখে থাকতে ভূতে কিলিয়েছে... ভালো কথা, সঞ্চারীকে জানিয়েছিস?'

'বলেছি, ও বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি...'

হাত বাড়িয়ে একটা ভঙ্গি করে অনির্বাণ, 'মেয়েটা তোকে ভালোবাসে অনি, ফালতু টেনশন করছিস...'

'ভালোবাসে বলেই ওর লাইফটা নিয়ে ছেলেখেলা হতে দিতে পারি না...' কথাটা বলে পড়ে অনিকেত। দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলে, 'তুই কবে কবে ফাঁকা আছিস জানিয়ে দিস। আমি নিজেই আসব। আজ চলি...'

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অনিকেত। অনির্বাণ কিছুক্ষণ নিজের চেয়ারেই গুম হয়ে বসে থাকে। একটা অদ্ভুত ভাবনা ওর মাথার কোণে ক্রমাগত উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সত্যি ছেলেটা একটু পাগলাটে... কিন্তু তাই বলে...

* * *

গঙ্গার ধারে বসেছিল দু-জনে। সাধারণত প্রতি শুক্রবার সন্ধের দিকে গঙ্গার ঘাটে এসে বসে ওরা। শীতের বিকেলে শহরের খুদে খুদে বাড়ি ঘরগুলোর পেছনে সূর্যটাকে ডুবতে দেখতে ভারি আদুরে লাগে। সঞ্চারী লেবু চা খেতে ভালোবাসে। এখানে আসার সময় মোড়ের দোকান থেকে চিনেবাদাম কিনে আনে। সেটা ছাড়িয়ে কিছু নিজে খায়, কিছু অনিকেতের গালে ঢুকিয়ে দেয়। আজ অনিকেতের লেবু চা ঠান্ডা হয়ে এসেছে। সূর্যটাও যেন ডুবতে একটু বেশি সময় নিচ্ছে আজকে।

চায়ের দিক থেকে চোখে তুলে অনিকেতের ভাবুক মুখের দিকে চেয়ে সঞ্চারী জিজ্ঞেস করে, 'তুই আজকাল কী এত ভাবিস বল তো? অফিসে কিছু হয়েছে?'

হুট করে আসা প্রশ্নটায় অনিকেতের চটকা ভাঙে, অল্প হেসে মাথা নেড়ে বলে, 'আচ্ছা তোর কখনও আমাকে সাফোকেটিং মনে হয় না?'

'মানে?'

'মানে ধর আমি কোনওকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি। ফোনের পর ফোন করছি। কিংবা তুই বাড়ি ফিরতে দেরি করলে একটু বেশি দুশ্চিন্তা করছি...'

'তো নিজের প্রেমিকাকে নিয়ে মানুষের দুশ্চিন্তা হবে না তো কি পাশের বাড়ির বউদিকে নিয়ে হবে? কী যে বলিস বুঝি না... নে চা খা...'

অনিকেত একবার চায়ে চুমুক দেয়। তারপর গোঁজ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে। একবার গাল চুলকে নিয়ে বলে, 'কিন্তু ধর যদি কখনও বাড়াবাড়ি রকমের হতে থাকে...'

'বাড়াবাড়ি রকমের বলতে?'

'মানে তুই ফোন না ধরলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কিংবা তোর উপর রেগে গিয়ে নিজের বা তোর কোনও ক্ষতি করে বসলাম। দাদুর কথা তো বলেইছি তোকে। অতিরিক্ত ভালোবাসার প্রকাশ মানুষের দমবন্ধ করে দেয়... তোর মনে হয় না আমি তোর দমবন্ধ করে দিচ্ছি?'

সঞ্চারী সামনে বয়ে যাওয়া গঙ্গার দিকটা দেখিয়ে বলে, 'তুই সাঁতরে গঙ্গা পেরোতে পারবি?'

'মানে? এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল?'

'আহা বলই না... পারবি?

'না...'

'আমি পারি।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'আমি সাঁতার কাটতে পারি...'

'তাতেই বা কী হয়েছে?'

হাত বাড়িয়ে একবার অনিকেতের গাল টিপে দেয় সঞ্চারী, 'আমি অনেকক্ষণ শ্বাস ধরে রাখতে পারি, অনি। অত সহজে আমার দমবন্ধ হবে না...'

বিকেলের গলন্ত সূর্যের আলো সঞ্চারীর সারাদিন অফিস করা ক্লান্ত মুখের উপরে এসে পড়ে। সেই আলোয় মুখটা অবাস্তব দেখায়। চোখদুটো আরও রহস্যময় দেখায়। গঙ্গার ঘোলাটে জলের মতো তার গভীরে কী আছে তাও যেন বোঝা সম্ভব নয় কোনওভাবে। একমাত্র প্রাণের মায়া ভুলে ভরা জোয়ারে ঝাঁপ না দিলে তার তল পাওয়া যায় না।

'আমার ইদানীং একটা জিনিস মনে হয় জানিস?' অনিকেত ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকেই প্রশ্ন করে।

'কী?'

'তোর মতো আর কোথাও কেউ নেই। না এই গঙ্গার ঘাটে, না এই শহরে, আমার চেনা অচেনা কোনও মানুষ তোর মতো নয়... আমার অবচেতন মন সারাক্ষণ বলে চলে কথাটা অথচ কারণটা কিছুতেই বুঝতে পারি না...'

নাটকীয় ভঙ্গিতে এক গোছা চুল সরিয়ে কানের পাশে রাখে সঞ্চারী, 'আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি তোকে আমার মতো সুন্দরী আর হয় না...'

'উঁহু, রূপটা নয়। অন্য কিছু একটা। এমন কিছু একটা যেটা আমার অবচেতন মন জানে, অথচ আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না...'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখে সঞ্চারী, ‘সব কিছু বুঝতে নেই বোকা। বুঝে গেলে সবকিছু আর আগের মতো সুন্দর থাকে না।’

‘আমার খুব ভয় করে তোর জন্য...’

‘কেন?’

‘জানি না আমার মাথার ভিতরে কী আছে...’

‘আমি আছি এটুকু তো জানি। বাদবাকি যদি কিছু থেকেও থাকে ও আমি লড়ে নেব। তুই নিশ্চিন্তে থাক...’ কথাটা বলে ওর কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দেয় সঞ্চারী।

‘তোর লাগে না ভয়?’

দু-দিকে মাথা নাড়ায় সঞ্চারী, অনিকেতের মনে হয় ওর গলার স্বর বহু দূর থেকে ভেসে আসছে, ধীর প্রায় মিলিয়ে আসা কণ্ঠে সে বলতে থাকে, ‘আমি অত মাথা ঘামাই না। এই নদীটা কোথা থেকে কোথায় বইছে, কারা এই ঘাটে এসে বসে, কোন লোকটার থেকে আজ লেবু চা খেলাম, সূর্যটা ঠিক কোন অ্যাঙ্গেলে ডুবছে, কাল ডুববে কি না... আমি শুধু জানি তোর সঙ্গে কাটানো এই বিকেলগুলো সুন্দর... আর...’

‘আর?’

‘আর জীবনের সব ক-টা শুক্রবার বিকেল আমি তোর সঙ্গে এই ঘাটে বসে সূর্যাস্ত দেখতে চাই। আমি শুধু ওইটুকু বুঝি...’

অনিকেত জানে এই মেয়েটার মধ্যে অন্য কিছু আছে। এই মেয়েটা অনন্য। কিন্তু ঠিক কোথায়? কাঁধে ঝুঁকে পড়া মাথাটা ভারি হালকা লাগে ওর। বুকের ভিতরে জমে ওঠা আশঙ্কার মেঘটা ততটাই ভারী হয়...

(চার)

অটো থেকে নেমে তড়িঘড়ি মোবাইল ফোনটা বের করতেই সঞ্চারীর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। প্রায় বিয়াল্লিশখানা মিসড কল। এতক্ষণে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ছেলেটার। একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভিড়ের মধ্যে অনিকেতকে দেখতে পেল সে। একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্রুত সেদিকে ছুটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এই, কিছু মনে করিস না। একটু দেরি হয়ে গেল...'

'দেরি হয়ে গেল? ফোনটা ধরতে কী হয় তোর?'

'আরে অটোর সামনের সিটে বসেছিলাম। ফোন ছিল পকেটে, কী করে ধরব বল?'

'সামনের সিটে বসেছিলি? কতবার বারণ করেছি তোকে... দুম করে পড়ে গেলে? এত রিস্ক নিতে কে বলে তোকে?'

'আরে ওখানে বসলে বেশি হাওয়া পাওয়া যায়...'

'হ্যাঁ, তুই হাওয়া খা আর আমি এদিকে টেনশন মরে যাই... কতদিন বলেছি অকারণে টেনশন দিবি না আমায়...'

'তুই এত টেনশন করিস কেন বলতো? আমি কি বাচ্চা খুকি?'

'নাঃ অনেক বড় হয়ে গেছিস। এবার একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দেব... চল...'

ওদের প্রথম দেখা হবার পর প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে। এর মাঝে আইটি সেক্টরে চাকরি পেয়েছে দু-জনে। অফিস একই জায়গায় হলেও একই কোম্পানিতে নয়। ওরা দু-জনে নিউ টাউনের মোড়ে দেখা করে সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে অফিসে যায়। রোদ বা বৃষ্টির দিনে অনিকেতই ছাতা নিয়ে আসে। রোদ বৃষ্টি আটকানো ছাড়াও সে ছাতার আর একটা কাজ আছে।

সঞ্চারীর কোন মামা নাকি এইদিকেই একটা অফিসে চাকরি করে। অনিকেতের ভয় তিনি যে কোনওদিন ওদের রাস্তায় দেখে ফেলতে পারেন। তাই মুখ বাঁচাতে ছাতার আশ্রয়। সঞ্চারী কয়েকবার বলেছে ওদের ব্যাপারটার কথা বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া উচিত। নয় নয় করে তো প্রায় দু-বছর হতে চলল। কিন্তু অনিকেত কিছুতেই রাজি নয়।

'সবে দু-মাস হল চাকরি পেয়েছি, এখন তোর বাপ কিচাইন করলে?'

'করলে আর কী, মেয়ে নিয়ে ভেগে যাবি...'

'ওঃ! তারপর তোর পুলিশ বাপ আমাকে খুঁজে পেতে ডান্ডা দিয়ে সোঁটালে?'

'ডান্ডা খেতে খেতে চিৎকার করবি, পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো...'

'রাখ তোর একশো বারো। ঘুষের টাকা খেয়ে ভুঁড়ি বাগিয়েছে মালটা...'

'এই, আমার বাপ ঘুষ খায় তোকে কে বলেছে?'

'দেখ ভাই - প্রেমিকরা চুমু, নেতারা কাটমানি আর পুলিশ ঘুষ সুযোগ পেলেই খায়। কিন্তু কেউ স্বীকার করতে চায় না...'

'বটে! তুই কবে চুমু খেয়েছিস?'

অনিকেত একটু ভেবে বলে, 'তা নাহলেও ছ-মাস আগে হবে।'

'তা এতদিন খাসনি কেন?'

'কারণ আমার প্রেমিকা চিংড়ি মাছ খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়। আরে উপন্যাস টুপন্যাস পড় ভাই। প্রেমিকাকে চুমু খেলে ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া দেয়, গা শিরশির করে, মৌরি লজেন্সের গন্ধ আসে। আরে লটে, খোলসে চচ্চড়ি খাওয়া প্রেমিকাকে কি আর চুমু খাওয়া যায়?'

'তাই নাকি?'

'তাই না? আরে প্রেমিকা হবে বাল বিখরে হুয়ে, গাল নিখরে হুয়ে...'

আচমকাই হাতের ফাইলটা তুলে নিয়ে অনিকেতকে তাড়া করে সঞ্চারী, 'দাঁড়া শুয়োরের বাচ্চা তোর সব ক-টা বিখড়ানো বাল যদি যদি টেনে টেনে না তুলেছি তাহলে...'

ব্যাপারটার জন্য তৈরি ছিল অনিকেত। ছুট লাগিয়েছে আগেই। ফাঁকা রাস্তায় দু-জনের চিৎকারই ছড়িয়ে পড়ে। খানিকটা ছোটাছুটির পর একরকম অনিকেতকে ধরেই ফেলেছিল সঞ্চারী। এমন সময় সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার হাতে এক ফোঁটা শীতল জলের স্পর্শ লেগেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে মৃদু হেসে বলে, 'বৃষ্টি আসছে অনি, ভিজবি?'

অনিকেত হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, 'তাহলে আর অফিসে ঢুকতে দেবে না...'

'উপন্যাসের হিরোরা অফিসের চিন্তা করে না...'

অনিকেত একটা ছাতা খোলার উপক্রম করেছিল। এগিয়ে গিয়ে সেটা

একরকম কেড়েই সরিয়ে নেয় সঞ্চারী। বৃষ্টির বেগ বেড়ে ওঠে। শুনশান ফাঁকা রাস্তায় ওদের শরীর ভিজিয়ে দিতে থাকে বৃষ্টির ফোঁটা। দুটো শরীর ঘন হয়ে আসে।

কাছেই বাজ পড়ে কোথাও। অনিকেতের কানে তালা লেগে যায়। ঘন বৃষ্টির ফোঁটা দু-জনেরই চশমার কাচ ভিজিয়ে দিয়েছে, চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে গেছে তাতে। একটা একটা করে অনুভূতি বুজে আসতে থাকে ওদের। কেবল অবিশ্রান্ত জলধারার স্পর্শ লেগে থাকে ওদের সারা গায়ে।

একসময় অনিকেত অনুভব করে ওর চোখ থেকে ঝাপসা চশমাটা খুলে নিচ্ছে সঞ্চারী।

চোখ থেকে জলের পর্দাটা সরে যেতেই অনিকেত দেখতে পায় ওদের থেকে মিটার দশেক দূরেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটা আশ্চর্যের কিছু না। কিন্তু গাড়ির জানলা থেকে কেউ একজন তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

'মামা...' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে অনিকেত। সঞ্চারী জলমাখা মুখেই সেদিকে ফিরে তাকায়, 'কোথায়?'

'ওটা তোর মামার গাড়ি না?'

দু-জনে সেদিকে ফিরে তাকাতেই দ্রুত গতি নেয় গাড়িটা। শব্দ করে বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়।

সঞ্চারী অনিকেতের দিকে তাকিয়ে দেখে তার মুখ থমথমে হয়ে গেছে। এগিয়ে গিয়ে মুখ থেকে বৃষ্টির জল সরিয়ে সে প্রশ্ন করে, 'হলটা কী তোর?'

'এবার কী হবে?'

'কী আবার হবে? তুই ভয় পাস নাকি?'

'যদি গন্ডগোল হয় কিছু?'

'আশ্চর্য বোকা ছেলে তো তুই...'

'আমি বোকা? তোকে ছাতাটা সরাতে কে বলেছিল?'

আর একটু কাছে এগিয়ে এসে ওর জামার বুকের কাছটা খামচে ধরে সঞ্চারী, 'সারাজীবন ছাতা দিয়ে মুখ ঢেকে বেঁচে থাকা যায় না অনি, কোনও প্রবলেম হলে সেটার সামনে দাঁড়িয়ে সেটা ফেস করতে হয়...'

‘আমি পারব না ফেস করতে, টেনশন হলে আমার শরীর খারাপ করে...’

‘তোকে আমি কিছু ফেস করতে বলেছি? বলছি তো আমার উপর ছেড়ে দে সবটা...’

‘আমি বিশ্বাস করি না তোকে...’

নিজের কথায় অনিকেতের নিজেরই অবাক লাগে। ও বুঝতে পারে ভিতরে চাপা টেনশনটা ওকে আবার গ্রাস করছে।

‘বিশ্বাস করিস না মানেটা কী?’ সঞ্চারীর গলায় এখনও রুক্ষ ভাব আসেনি, ‘দেখ আমি জানি এই অকারণে নার্ভাস হওয়াটা তোর একটা রোগ। একটু সময় দেখ, এক্ষুনি এটা নিয়ে এত মাথা ঘামাস না...’

অনিকেত বুঝতে পারে ওর মাথার শিরাগুলো দপদপ করতে শুরু করেছে। হাত-পায়ে একটা অবশ ভাব। সঞ্চারীর মুখটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। কেন ছাতাটা সরিয়ে নিতে গেল? ইচ্ছা করল ওকে ঠেলে রাস্তার উপরে ফেলে দিতে...

নিজেকে সামলাতেই দু-পা পিছিয়ে এল অনিকেত, খুব ধীরে ধীরে কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, ‘আমার আর তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই... তুই চলে যা আমার সামনে থেকে...’

অনিকেত জানে ও এই কথাটা বলতে চায়নি। ওর মাথায় কি রোগ আছে কিছু? টেনশন হলে আর মাথার ঠিক থাকে না। যা বলতে চায় না তাই বলে ফেলে।

ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে সঞ্চারী। ওর চোখে জল এসেছে কি না বোঝা যায় না। বৃষ্টির ধারা ঢেকে দেয় সমস্ত কিছু।

কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এক ছুটে রাস্তার উল্টোদিকে কোথায় যেন হারিয়ে যায় সঞ্চারী। কমে থাকা জলের উপর ওর পায়ের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে আসে...

* * *

প্রিন্ট করা কাগজগুলো হাতে তুলে নেয় অনির্বাণ। লেখাগুলো মেইল করে আগেই ওকে পাঠিয়েছিল অনিকেত। সেগুলোর উপর আর একবার

চোখ বুলাতে বুলাতে বলে, 'ঘটনাগুলো অভিনব তাতে সন্দেহ নেই। আই মিন তোর থট প্রসেস যে আর পাঁচটা মানুষের মতো স্বাভাবিক নয় সেটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তুই ক্রমশ ক্ষতিকর কিছুর দিকে এগোচ্ছিস তা বলা যায় না...'

'আর এই ক-দিন তুই আমাকে দেখলি, কী মনে হল তোর?'

আজ আর অনির্বাণের চেম্বারে বসেনি ওরা। অনিকেতের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েই গল্প করছিল দু-জনে। এর মাঝে দু-জনের মোট ছ-টা দিন দেখা হয়েছে। অনিকেত মন খুলে সবই বলেছে ওকে। অনির্বাণ কেবল মন দিয়ে সমস্ত কথা শুনে গেছে। কখনও ইচ্ছা হলে টুকটাক প্রশ্ন করেছে ওকে।

উত্তর দিতে দিতে কখনও কেঁদে ফেলছে অনিকেত, কখনও থরথর করে কেঁপেছে, কোনও সুখস্মৃতি মনে করতে করতে আবার দু-জনেই হেসে খুন হয়েছে। শেষ দু-দিন ধরেই অনির্বাণের মনে হয়েছে ওর কাজ গুটিয়ে এসেছে। দু-এক জায়গায় কিছু খোঁজখবর নেওয়ার ছিল। সেগুলো হতে সময় লাগছে। আজ সকালেই তারা ফোন করে জানিয়েছে কাল সকালে দরকারি কাগজপত্র পাঠিয়ে দেবে মেইল করে।

'আশা করি কালকের মধ্যেই ফাইনালি কিছু জানাতে পারব তোকে। ভালো কথা, তোর সঞ্চারীর সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে কবে?'

'কাল তো শুক্রবার। অফিস শেষে গঙ্গার ঘাটে দেখা হবে...'

'আমাকে একটা কথা বল, যদি সত্যি কাল সকালে খবর খারাপ শুনিস তাহলে ওকে গিয়ে বলতে পারবি সিদ্ধান্তের কথা?'

'আমি জানি না...' মাথা নাড়ায় অনিকেত, 'তবে ওর কাছে ব্যাপারটা সহজ হবে হয়তো...'

'সহজ হবে কী করে?'

'এই তিন বছরে কম জ্বালাইনি ওকে...'

'সেই জন্যেই বলছি, একটা মানুষ এত সহ্য করেও তোর সঙ্গে থেকে গেল তাও তাকে গিয়ে এটা বলতে কষ্ট হবে না?'

দূরে ঘনায়মান সন্ধের দিকে চেয়ে একটু হাসে অনিকেত, 'ও আগে খুব

রাগী ছিল জানিস, কথায় কথায় হাত চলত। থেকে থেকে রেগে বোম হয় যেত... তারপর...'

'তারপর?'

'তারপর আমাকে সামলাতে গিয়ে কবে যেন নিজে নিজেই কমে গেল ওর রাগটা... আমি মাথা খারাপ করে ভুলভাল কিছু বলে ফেললে ও নিজেই সময় নিয়ে বোঝাত আমাকে...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনির্বাণ, 'নিজের কোর ক্যারেক্টারিস্টিক প্রিন্সিপালকে ছাপিয়ে কাউকে ভালোবাসা সহজ কথা নয়... প্রাণীজগতে একমাত্র মায়েরা পারে সেটা।'

অনিকেত দুটো হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে রাখে, 'কাউকে তেমন করে ভালোবাসলে আমরা সবাই মা হয়ে যাই... আর ওর মতো করে আমাকে ভালোবাসেনি কেউ...'

ওর দিকে ফিরে তাকায় অনির্বাণ, 'সেই জন্যেই ওকে অনন্য মনে হয় তোর?'

মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় অনিকেত, 'নাহ্, এত সহজ কিছু না। আরও কঠিন, আরও অসম্ভব কিছু...'

ছাদের একদিকের পাঁচিলে হেলান দেয় অনির্বাণ, 'কারণটা তোর সাবকন্সাস জানে, কিন্তু তুই বুঝতে পারছিস না। মানুষের মাথা কী অদ্ভুতভাবে কাজ করে, তাই না? বাদ দে, কাল অফিস ফেরত চলে আসিস আমার চেম্বারে... কথা হচ্ছে, এখন চলি...'

অনির্বাণ চলে যেতে নিচে চলে এল অনিকেত। ও জানে কাল বিকেল অবধি অন্য কিছুতেই মন বসবে না ওর। সারাক্ষণ এই একটাই চিন্তা কুরে কুরে খাবে ওকে। আচ্ছা সঞ্চারীকে সব খুলে বললে ও কি হাসিমুখে মেনে নেবে ব্যাপারটা? নাকি ঝগড়া করবে?

নিচে নেমে একটু ভেবেচিন্তে সঞ্চারীকে একটা ফোন করল অনিকেত। ওপাশ থেকে সারাদিন অফিসে কাজের পর ক্লান্ত গলা কানে এল, 'বল রে, আজ অসময়ে ফোন?'

'কাল দেখা হচ্ছে তাহলে...'

'সে তো প্রতি সপ্তাহেই হয়...'

'যদি না হয়?'

'মানে, হবে না কেন?'

'মানে ধর আমি যদি আর না আসি, তোর কষ্ট হবে খুব?'

ওপাশের মানুষটাকে কয়েক সেকেন্ডের একটা নীরবতা গ্রাস করে, 'তোর কী মনে হয়?'

'কী জানি, অন্তত আমার যতটা হবে তোর ততটা হবে না...'

আবার একটা নীরবতা। কী ভাবছে এত সঞ্চারী, একটু পরে জবাব আসে, 'তোর এত কষ্ট হবে যখন এসব ভাবছিসই বা কেন?'

অনিকেত করুণ হাসে, 'জানিস তো আমি ওভার থিঙ্ক করি। আচ্ছা বাদ দে, একটা শেষ প্রশ্নের উত্তর দে...'

'কী?'

'আমার কেন মনে হয় তুই সবার থেকে আলাদা? তোর মতো আর কেউ নেই...'

'আমাকে ভালো করে চিনিস বলে...'

'কিন্তু আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি না কেন মনে হচ্ছে... তুই জানিস যখন বলে দে...'

ওপাশ থেকে এবার একটা হাসির আওয়াজ ভেসে আসে, সেই হাসি মেখেই উত্তরটা শোনা যায়, 'আমার তোর সঙ্গে বসে সানসেট দেখতে ভালো লাগে বলে...'

'সে তো আমারও লাগে...'

'হতে পারে, কিন্তু আমার মতো লাগে না... তোর জন্য যত কষ্ট আমি পেতে পারি আর কেউ পেতে পারে না।'

'কিন্তু কষ্ট পাইয়ে কী লাভ?' অসহায় গলায় প্রশ্ন করে অনিকেত। কিন্তু আর কোনও উত্তর আসে না। ওপাশ থেকে কেটে যায় ফোনটা।

(ছয়)

পরদিন অফিসের কাজে কিছুতেই মন বসে না অনিকেতের। সারাদিন মাথার ভিতরটা ধরে থাকে। কানের পর্দায় একটা ক্রমাগত গুনগুন আওয়াজ। হাতের আঙুলগুলো কী বোর্ডের উপরে কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। এর মধ্যে অন্তত বারতিরিশেক ফোন করে ফেলেছে অনির্বাণকে। সে হয় ফোন ধরেনি, নাহয় ধরে বলেছে চেম্বারে ছাড়া সে কিছু বলতেই রাজি নয়।

অফিস ছুটি হতে একরকম পড়ি কি মরি করেই দৌড়েছে অনির্বাণের চেম্বারে। ততক্ষণে ওর শরীর রীতিমতো ঝিমিয়ে আসতে শুরু করেছে। বুকের ভিতরে একটা বিশাল হাতুড়িকে যেন ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে কেউ।

আজ অফিস থেকে বেরোতেও একটু দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়তো গঙ্গার ঘাটে এসে বসেছে সঞ্চারী। একবার ফোন বের করে অনিকেত দেখল ওর নম্বর থেকে একটা মিসড কল এসেছিল। কিন্তু আজ আর কল ব্যাক করার মতো মানসিক অবস্থা নেই ওর। একটু অপেক্ষা করুক নাহয়...

অনির্বাণ চেম্বারে নিজের টেবিলের পেছনে একাই বসে ছিল। মন দিয়ে একতাড়া কাগজ গুছিয়ে রাখছিল। অনিকেত একরকম ছুটেই ওর ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'আরে, এত মাথা খারাপ করিস না। আমি তোর ফাঁসির আদেশ শোনাব না, বোস আগে...'

অনিকেত টেবিলের উপর একটা চাপড় মারে, 'বসার নিকুচি করেছে, আমার খবর বল আগে...'

'একটা ভালো খবর আছে, একটা খারাপ... কোনটা আগে শুনতে চাস?'

অনিকেতের মুখ বুকের উপর নেমে আসে। থমথমে গলায় বলে, 'খারাপটা গেস করতে পারছি। ওসিডি আছে, তাই তো?'

উপরে নিচে মাথা নাড়ায় অনির্বাণ, 'শুধু আছে না, ভয়ানক রকমের আছে। দিনদিন সেটা বেড়েই চলেছে...'

দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে অনিকেত। কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে

ওর। মুখের উপর একটু একটু করে লালচে রং লাগে। আচমকা মুখ তুলে নিজের হাতের উপর একটা ঘুসি মারে অনিকেত, ‘আমি জানতাম। কী করি এখন? ওকে গিয়ে বলব? বাড়িতে বলব? নাকি...’

‘সে আমি কী করে বলব?’ অনির্বাণ কাঁধ ঝাঁকিয়ে টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে কী যেন দেখতে থাকে।

‘আমাকে কোনও ওষুধপত্র দিয়ে ঠিক করা যাবে না?’

অনির্বাণ হাসে। অন্যমনস্কভাবেই বলে, ‘ওষুধপত্র দিয়ে রোগ ঠিক করা যায় অনিকেত। আর তোর কোনও রোগ নেই। অন্তত মানসিক রোগ নেই। তুই জাস্ট ভয়ঙ্কর রকমের নার্ভাস। ছোটবেলার কিছু ট্রমাটিক এক্সপেরিয়েন্স কাজ করে, সেই সঙ্গে অ্যাংজাইটি ইসু আছে। তাও চাইলে কমিয়ে ফেলা যায়। ভয় পাওয়ার মতো কিছু না...’

‘কিন্তু এই যে বললি আমার ওসিডি আছে...’

‘বলেছি। কিন্তু তোর আছে সেটা তো বলিনি...’

ফোনটা আবার বেজে উঠছে বুঝতে পারে অনিকেত। কিন্তু সেদিকে আর চোখ যায় না তার। হাতের কাগজগুলো ওর সামনে ফেলে দেয় অনির্বাণ। তারপর কাগজের একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলে, ‘ওসিপিডি, আই মিন তুই নিজের যেটা আছে বলে ভয় পাচ্ছিলি, সেটা তোর নয়, আছে সঞ্চারীর। এবং আজ থেকে নয়, বিগত ছ’বছর ধরে এই ব্যাপারটায় ভুগছে ও। এই যে পাশে দেখছিস। এটা ওর রিপোর্ট, আর ডক্টরের নাম...’

অবিশ্বাসের চোখে কাঁপাকাঁপা হাতে কাগজটা তুলে নিজের চোখের সামনে ধরে অনিকেত। তারপর বলে, ‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আমিই তো সবকিছু নিয়ে মাথা খারাপ করতাম ও তো ভীষণ ঠান্ডা মাথার মেয়ে...’

অনির্বাণ একটা সিগারেট ধরায়। তারপর এগিয়ে গিয়ে জানলার একটা কাচ সরিয়ে দিয়ে অন্য কাচে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, ‘তোর মধ্যে যে কোনও মানসিক রোগ নেই তা আমি প্রথম থেকেই জানতাম। সেদিন রাতে অন্যমনস্কভাবে ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে আমার সঞ্চারীর কিছু সেলফি চোখে পড়ে। নিজের ঘরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেজেগুজে নানান পোজে

নিজের ছবি তুলেছে। সেগুলো দেখতে গিয়েই একটা জিনিস লক্ষ করি আমি। প্রায় সব ক-টা ছবিতে ওর পেছনে একটা ড্রেসিং টেবিলে কিছু সাজগোজের জিনিসপত্র রাখা। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সব ছবিতে সেগুলো একদম একই অর্ডারে সাজানো। টেবিলের ঠিক যেখানে যা রাখা ছিল সব ছড়িয়ে সেখানে তাই রাখা আছে। ব্যাপারটা অড, না? বারবার সাজগোজ করছে, ছবি তুলছে। একটু তো আলাদা অর্ডারে সাজানো হবেই। সেটা হচ্ছে না মানে ও বারবার মন দিয়ে সাজাচ্ছে...'

অনিকেত হাঁ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, বিড়বিড় করে বলল, 'ও চিরকালই টিপটপ, কিন্তু আমি এইভাবে কখনও...'

'প্রথমদিন যখন ওর সঙ্গে তোর দেখা হয় তখন ও তোকে পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারে। কেউ হুট করে এসে লিপস্টিক ঘেঁটে গেছে বললে কারও এতটা রাগ হওয়ার কথা নয়, এমনকী একটা অচেনা লোক হেসেছে বলেও না। ওর মূল রাগ হয়েছিল গিটারের তারগুলোকে সাজাতে না পেরে। সেই রাগটাই তোর উপর দিয়ে বেরিয়ে আসে। তোর আগে যে সাইকায়াট্রিস্টকে ডাস্টার ছুঁড়ে মারে সেটারও কারণ একই। ওসিডি আছে কি না টেস্ট করার জন্য অনেক সময় পেশেন্টের সামনে ইচ্ছা করেই ওলটপালট করে জিনিস রাখি আমরা। তারপর তাদের কিছুতেই সাজিয়ে রাখতে দিই না। তাতে যদি পেশেন্ট হঠাৎ রেগে যায় তাহলে বোঝা যায় তার ওসিডি আছে। ডাক্তার ভদ্রলোক হয়তো সেই টেস্ট করতে গিয়েই ডাস্টারের ঘা খান...' অনিকেতের কাছে এগিয়ে এসে ওর দিকে অন্য একটা কাগজ বাড়িয়ে ধরে অনির্বাণ, 'সন্দেহ হতে সঞ্চারীর প্রোফাইলে আবার ভিজিট করি আমি। আমার এক মনোবিদ বন্ধু দেখলাম মিউচুয়াল ফ্রেন্ডে আছে। তাকে যোগাযোগ করে দু-একটা খোঁজখবর করতেই সঞ্চারীর চিকিৎসার কাগজপত্র আমার হাতে আসে... দুশ্চিন্তা, অ্যাংজাইটি, অল্পতে ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ানকরকম মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়া, বাড়ির লোকের জীবন হেল করে দেওয়া, আই মিন যেগুলোর ভয় তুই পাচ্ছিলি সেগুলোতে আজ পাঁচ বছর ধরে ভুগে আসছে সঞ্চারী...'

'কিন্তু আমি এসব কিছুই জানতাম না...'

অনির্বাণ একটা বাঁকা হাসি হাসে, 'জানতিস, অবচেতনে। যবে থেকে এই ওসিডির ভয় তোর মাথায় ঢুকেছে তবে থেকেই এই সব নিয়ে পড়াশোনা করিস তুই। ও যতই চেপে রাখার চেষ্টা করুক তোর অবচেতন মন কিছু কিছু সিম্পটমে মিল পায়। ভেবে দেখ দাদুকে দেখার পর থেকে ওসিডি জিনিসটা তোর কাছে একটা ট্রমার মতো কাজ করে। ফলে তুই ডিনাইয়ালে চলে যাস...'

সমস্ত ব্যাপারটা এখনও স্পষ্ট হয়নি অনিকেতের মাথার ভিতরে, ও বিড়বিড় করে বলে, 'কিন্তু সঞ্চারী ভীষণ ঠান্ডা মাথার মেয়ে। এই তিন বছরে আমিই পাগলামি করেছি, ওকে জ্বালিয়ে মেরেছি, কতবার সামান্য কারণে ওকে ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছি... ওর যদি এই রোগ থেকে থাকে... তুই যে বলেছিলি এই রোগের সিম্পটম চেপে রাখা অসম্ভব?'

জানলা দিয়ে বাইরে ধীরে ধীরে নামতে থাকা বিকেলের দিকে চোখ মেলে দেয় অনির্বাণ, 'তাই তো জানতাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ওসিডির থেকে বড় একটা মেন্টাল ডিসর্ডার বাসা বেঁধেছে সঞ্চারীর মাথায়... তোকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা!'

'মানে?'

হাত নাড়ায় অনির্বাণ, 'ও তোকে ভালোবাসে অনি, তোর সঙ্গে থাকতে চায়। তোকে হারাতে চায় না। তাই নিজের রোগটাকে তোর কাছে লুকিয়ে ফেলতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সম্ভব নয় সেটা। যতটা দুশ্চিন্তা তোর হয়, যতটা ওভারথিঙ্ক তুই করিস তার থেকে কয়েকশো গুণ ওর হয়। কিন্তু ও কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় সেটা লুকিয়ে ফেলতে পারে— যাতে একদিন তোর ওকে অসহ্য মনে না হয়। সমস্যার সমাধান তোর কাছে ছিল ছেড়ে চলে আসা, ওর সে ক্ষমতাটা ছিল না। ও অসম্ভব পথটাকেই সম্ভব করে নিয়েছে...'

অনিকেতের হঠাৎ খেয়াল হয় ওর ফোনটা এই নিয়ে তৃতীয়বার বাজছে। প্রায় একঘণ্টা লেট করে ফেলেছে ও। একঘণ্টায় মোট তিনবার ফোন।

এতক্ষণে কি ডুবে গেছে সূর্যটা?

ঝট করে চেয়ার থেকে উঠে দরজার দিকে দৌড় লাগায় অনিকেত। অনির্বাণ পেছন থেকে একবার ডেকে ওঠে, 'আরে সব কথা শেষ হয়নি, চললি কোথায়?'

কান দেয় না অনিকেত। এক ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে নিচে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে যখন শোভাবাজার গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছয় অনিকেত তখন চারদিক প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ আগে। আজ ঘাটে বেশি ভিড় নেই। সমাজের নানা শ্রেণির নানা বয়সের লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। কতগুলো ছিপছিপে চেহারার লোক ঘাটের একদম শেষ সিঁড়িতে ঘষে ঘষে স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট কাচছে।

হাঁপাতে হাঁপাতেই ওদের বসার জায়গাটার দিকে এগিয়ে আসে অনিকেত। একমনে জলের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছে সঞ্চারী। জলের উপর ভেসে আসা বুনো লতা ভেসে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ ঢেউ যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের।

পেছনে ঘন নিশ্বাসের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকায় সঞ্চারী। মুখে উদাস ভাব কেটে গিয়ে একটা নরম হাসি ফোটে, 'আয় বস, লেবু চা খাবি?'

অনিকেত নিঃশব্দে বসে পড়ে ওর পাশে, তারপর থমথমে গলায় বলে, 'আজ সানসেট দেখা হল না...'

সঞ্চারী কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার জলের দিকে তাকায়, 'আমি সূর্য ডুবে যাওয়ার অনেক পর অবধি বসে থাকতে পারি তোর জন্য...'

'তোর দুশ্চিন্তা হয়নি? এই যে আমি দেরি করে এলাম?'

'সময় পেলাম কই। ভাবতে ভাবতেই তো কেটে গেল...'

'কী ভাবলি?'

'তুই এখানে এসে সবার আগে কী বলবি? তুই বলবি আজ সূর্যাস্ত দেখা হল না, আর আমি বলব আমি অন্ধকার নামার অনেক পড়ে অবধি অপেক্ষা করব তোর জন্য...'

হঠাৎই ওর দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে যায় সঞ্চারীর, ব্যাগের চেন টেনে চিরুনি বের করতে করতে বলে, 'চুলটা আঁচড়ে বেরোসনি আজকে?

গোটা অফিস এই চুলে কাটালি? আর শার্টের কলারটা ঢুকে আছে ভিতরে... উফ, তোকে নিয়ে কী যে করি...'

হঠাৎ করেই নিজের জায়গা থেকে উঠে সঞ্চারীকে জড়িয়ে ধরে অনিকেত। ওর বুক কেঁপে ওঠে। চোখ থেকে অজান্তেই কয়েকটা বিশ্বাসঘাতক জলের রেখা বেরিয়ে আসে।

সঞ্চারী হেসে ফেলে, 'কাল যে আর আসবি না বলছিলি। আজ আবার পিডিএ!'

'তোর মতো আর কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই তোর মতো... আমি তোর মতো করে কোনদিন ভালোবাসতে পারব না...'

'বাসতে হবে না...' সঞ্চারীর গলা ফিসফিসে হয়, 'শুধু একটা কথা মনে রাখবি?'

'কী কথা?'

'কাউকে ভালোবাসলে তার জন্য সূর্যাস্তের অনেক পরেও বসে থাকতে হয়। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেলে, সব লেবু চাওয়ালা, ঘটিগরমওয়ালারা বাড়ি চলে গেলেও অপেক্ষা করতে হয়... তুই করবি তো অপেক্ষা আমার জন্য?'

অনিকেত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে সঞ্চারীর দিকে। চাঁদের আলোও কি পৃথিবীতে এসে পড়ে? সেই আলো কি সঞ্চারীর মুখটাকে স্বপ্নের মতো রুপোলি করে তুলেছে?

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ও বুঝতে পারে এই গঙ্গার ঘাট, নদী, সূর্য, আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা লোকগুলো, দূরে ভেসে যাওয়া লঞ্চ, সবকিছু কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেছে। শুধু জেগে আছে ওর সামনে বসা এক অলীক মানবী।

যার মতো আর কেউ কোথাও নেই...

ধার

অফিসে ঢোকার মুখে আজ মাসতিনেক হল ভিখারিটাকে দেখতে পায় অঙ্কিতা। বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। মিশমিশে কালো গায়ের রং। পরনে একটা ছেঁড়া নীল লুঙ্গি আর ফুলহাতা চেক শার্ট। চুল দাড়ির মা-বাপ নেই। একটা ছোট বস্তার ছাউনি টাঙিয়ে অফিসের ঠিক বাইরেটাতেই বসে থাকে। ওদের সেক্টর ফাইভ-এর চকচকে কর্পোরেট অফিসের পাশে বস্তার বিশ্রী ছাউনি ভীষণ বেমানান। তবে বাসু স্যারের দয়ার শরীর বলেই ওখানে ঠাঁই হয়েছে লোকটার।

প্রথমদিন বসতে দেখে সিকিউরিটি গার্ড এসে তুলে দিতেই যাচ্ছিল। বাসু স্যার তখনই বেরোচ্ছিল কাচের দরজা ঠেলে। হাঁ হাঁ করে এগিয়ে এসে বলল, 'একি সুজয়! তুমি ওর উপর চিৎকার করছ কেন?'

রুলটা ভিখারিটার পিঠে বসাতে যাচ্ছিল সুজয়, সেটা আবার কোমরের খোপে গুঁজতে গুঁজতে বলেছিল, 'জায়গাটা একদম স্পয়েল করছে স্যার। মানে আমাদের বিদেশি ক্লায়েন্ট আছে...'

'তো? দেশের যা অবস্থা তাই তো তারা দেখবে, নাকি?'

বাসু হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল লোকটার সামনে। তারপর আঙুলের ঠেলায় চশমাটা নাকের উপর তুলতে তুলতে বলেছিল, 'কোত্থেকে আসছ?'

লোকটা মার আটকাতে হাতের বাটিটা মুখের সামনে তুলেছিল, সেটা নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'হেঁহেঁ... তা সার সেই মেদিনীপুর থিকে...'

'কী করতে মেদিনীপুরে?'

'চাষের জমি ছিল সার। চাষ করতাম, জমি মালিকে কিনে নিলে। কলকেতা

এসচিলাম কাজের খোঁজে। কারখানায় কাজ করতাম, কলে হাত কেটি গেল। এহন ভিক্ষে করছি...' ইশারায় নিজের কবজি থেকে কাটা ডানহাতটা দেখিয়েছিল লোকটা।

একটু হেসে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বাসু। তারপর সুজয়ের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'তবে? চাষা মানুষ বলে কথা। সকালে যে ভাতটি খেয়ে অফিসে আসছ তা এরই হাতে ফলানো। তাকে ঠেঙিয়ে তুলে দিলে একেবারে পাতে মরবে ভাই, ও থাক...'

তারপর থেকে আর ওখান থেকে নড়েনি হাতকাটা লোকটা। অঙ্কিতার শিফটিং ডিউটি। কখনও সকালে অফিসে ঢোকে, কখনও বিকেলে, আবার কখনও গভীর রাতে। সারাক্ষণই দেখে লোকটা ওখানেই পড়ে আছে। হয় বাটি হাতে বসে আছে ছাউনির বাইরেটায়, না হয় বস্তার ঘেরাটোপের ভেতরে ঢুকে ঘড়ঘড় করে কী একটা আওয়াজ করছে।

আওয়াজটা কিসের সেটা অবশ্য জানে অঙ্কিতা। লোকটার ভিক্ষা চাওয়ার একটা ধরন আছে। হাতের দোমড়ানো বাটিটাকে ক্রমাগত মাটির উপর ঘষতে থাকে। তাতেই সড়সড় আওয়াজটা হয়। ওভাবেই নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর হাত বাড়িয়ে দেয় সামনের দিকে, 'ধার দিবেন সার?'

হ্যাঁ, সিরিয়াল কিলারদের যেমন মোডাস অপারেন্ডি থাকে, ভিখারিদেরও সেরকম ভিক্ষা চাওয়ার একটা ধরন থাকে। এই লোকটা ভিক্ষা চায় না, ধার চায়।

আজও সেভাবেই বাটি এগিয়ে ধরেছে লোকটা। অন্য দিন অঙ্কিতা এড়িয়ে চলে যায়। আজ কী মনে হতে দশটা টাকা বের করে এগিয়ে দেয় ওর দিকে, 'বেশ, দিলাম ধার। কবে শোধ করবে?'

'যেদিন আপনের দরকার হবে।' কথাটা বলে নোংরা দাঁতগুলো বের করে লোকটা হাসে।

'বাবা! তুমি ভিখারি না হয়ে ব্যাঙ্ক খুলতে পারতে তো...'

লোকটা জিভ কাটে, 'খপরে বলছেল ব্যাঙ্কই নাকি ভিখারি হই গেছে ম্যাডাম?'

লোকটার কথাবার্তা কেমন যেন বাঁকাচোরা গোছের। মোটেই ভালো লাগে না অঙ্কিতার। খানিক রাগও হয়। আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলে, 'তোমার আর একটা হাত আছে, তাও ভিক্ষা করো কেন? কাজ করে খেতে পারো না?'

'খেতুম তো, খেতে দিলে কই?'

'মানে? তোমাকে চাষ করতে বাধাটা দিচ্ছে কে?'

'হেঁহেঁ, একহাতি ভিক্ষা করি চলি যাচ্ছে যখন খেটেখুটে কে চাষ করে?' বিশ্রী হাসিটা আবার ফুটে ওঠে লোকটার মুখে।

'সেয়ানা মাল শালা...' অঙ্কিতা বাঁকা স্বরে বলে।

এরপর চাষবাসের হিসেবের যে ফিরিস্তি দিলে সেসব অঙ্কিতার মাথায় ঢুকল না। ঢোকার কথাও নয়। অঙ্কিতাদের আদিবাড়ি বর্ধমানে। চাষের জমিজমা কিছু ছিল সেখানে। ওর ছোড়দাদু সেসব দেখাশোনা করতেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় ওদের বাড়ি এলে গ্রামের গল্প শোনাতেন তিনি। তবে সেসব ছোটবেলার কথা। ভদ্রলোক বহুকাল হল গত হয়েছেন।

তারপর থেকে চাষজমির সঙ্গে ওর সম্পর্ক বলতে ওই গ্রামের মাঝখান দিয়ে যাওয়া ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা। বরঞ্চ ওর ছোট থেকেই ব্যবসায় আগ্রহ। বাবার বাগবাজারে একটা শাড়ির দোকান ছিল। এক গুজরাটি বেনের উৎপাতে বছরদশেক আগে সে দোকানে তালাচাবি ঝোলে। সে সময় থেকেই সংসারে টানাটানি ওদের। বাবা ভয়ানক ভেঙে পড়েছিল। তারপর থেকেই অঙ্কিতার জেদ, যেভাবেই হোক পয়সা রোজগার করবে ও।

কলেজ শেষ করে সেই কারণেই এমবিএ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল টেকনোতে। কিন্তু সেটা শেষ হওয়ার আগেই অঙ্কিতার জীবনে ঝড় নেমে আসে।

তিনবছর আগে একরকম ঝোঁকের মাথাতেই একটা বিয়ে করে বসে অঙ্কিতা। তার আগে একটা বছর চারেকের সম্পর্ক ছিল। সেটা হুট করে বিশ্রীভাবেই কেটে যায়।

কী করবে না করবে কিছুই বুঝতে পারছে না, জীবনে টালমাটাল অবস্থা। ঠিক এমন সময় এসে ওর হাত ধরে সৌম্য। মাসখানেক মেলামেশা করে

ভালোই লাগে ছেলেটাকে। বড় পরিবার, বিশাল ব্যবসা, বিশেষ দাবিদাওয়াও নেই। ধুমধাম করে বিয়েটা করে ফেলে অঙ্কিতা। এবং তারপরেই ভুল বুঝতে পারে।

একটা সহানুভূতিশীল মানুষের মুখোশের পেছনে এত বড় হিংস্র শয়তান লুকিয়ে থাকতে পারে জানা ছিল না অঙ্কিতার। দিনের পর দিন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আর সেক্সুয়াল টর্চারের শিকার হতে থাকে সে। কোনও মতে তিনটে মাস সেভাবে কাটে। তারপর একরকম জোর করেই শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাড়ি চলে আসে। বাবা-মা খুব একটা জোর করেননি। ডিভোর্স পিটিশন করেছিল। সেটা পেতে সমস্যা হয়নি।

তারপর থেকে ওর ধ্যানজ্ঞান এই অফিস।

লোকটার কথায় মাথা না ঘামিয়ে অফিসের ভিতরে নিজের কিউবিকলে ঢুকে আসে অঙ্কিতা।

কাজ শুরুর আগে ফোনটা লকারে রেখে আসতে হয়। এ অফিসের ওই দস্তুর। অবশ্য তাতে অঙ্কিতার তেমন অসুবিধা হয় না। বরং কাজে খানিকটা বেশি মন বসে।

ঘণ্টাতিনেক পর একটা ব্রেক নেয়। ওদের মোট আধঘণ্টার ব্রেক। সেটা তিনভাগে ভেঙে নেওয়া যায়। লকার থেকে ফোনটা বের করে বাইরে এসে দেখে এর মধ্যে তিনটে মিসড কল ঢুকেছে ওর নম্বরে। সব ক-টাই বাড়ির থেকে। বাবা-মা দু-জনের বয়সই ষাটের কাছাকাছি। একটার বেশি মিসড কল এলে দুশ্চিন্তাই হয়।

রিং ব্যাক করতে ওপাশ থেকে বাবার গলা শোনা যায়, 'হ্যাঁ মানু, বল...'

'ফোন করেছিলে যে...'

'ও তোর মা করেছিল। আমি কতবার বললাম থাক, মেয়েটা এলেই একেবারে বলবে... ওর তো আবার তর সয় না...'

'আরে হয়েছেটা কী?'

অঙ্কিতা বোঝে কথাটা বলতে বাবা একটু ইতস্তত করছে। এদিকে ওর পনেরো মিনিট শেষ হয়ে আসছে, ও তাড়া দেয়, 'আরে বলবে তো...'

‘ইয়ে তোর সেই কুমারেশের কথা মনে আছে?’

‘তোমার সেই বসের ভাই। থাকবে না কেন? বাঞ্চত লোক...’

‘আঃ, কতবার বলেছি তোকে মুখ খারাপ করবি না। ও তোর ফেসবুকটা ভিজিট করছিল মনে হয়। তো বলল...’

‘ব্লাডি পারভার্ট...’ ফুঁসে ওঠে অঙ্কিতা, ‘হি ইজ ফাকিং ফরটিটু বাবা...’

‘তোরও তো নয় নয় করে ছাব্বিশ হতে চলল। তাছাড়া লাইফে এত বড় একটা ব্লান্ডার ঘটে গেছে...’

‘তো আর একটা না ঘটা অবধি শান্তি হচ্ছে না তোমাদের, তাই না?’

ফোনটা মুখের উপর কেটে দিয়েই বারান্দার রেলিংয়ের দিকে সরে আসে অঙ্কিতা। পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট ধরায়। মাথার ভিতরটা গরম হয়ে গেছে আচমকাই। কুমারেশ সরকারের মুখটা মনে পড়লেই গা'টা রিরি করে জ্বলে উঠছে। কচি মেয়ে বিয়ে করার পুরকি জেগেছে বাঞ্চতটার।

বাইরে দুপুরের সেক্টর ফাইভ রোদে পুড়ছে। মানুষের বাড়িঘর বিশেষ নেই। সবই ঝাঁ চকচকে অফিস। এখানে কেউ আশ্রয়ের সন্ধান করে না, জিরিয়ে নিতে চায় না। কেবল দুটো পয়সার ধান্দায় ঘোরে। অফিসের এই জায়গাটায় এসে দাঁড়ালে অকারণেই ছোড়দাদুর কথা মনে পড়ে অঙ্কিতার।

ছোড়দাদু শহরে এলে সারাদিন কলকাতার রাস্তাঘাট চষে বেড়াতেন। ততদিনে তাঁর যাটের আশপাশে বয়স হয়েছে। মা বকাবকি করতেন, ‘এই বয়সে রোদের মধ্যে কী এত টোটো করে ঘোরেন বলুন তো?’

ভদ্রলোক গামছা দিয়ে পিঠের ঘাম মুছতে মুছতে বলতেন, ‘এত বুদ্ধি করে বানানো শহরটা একটু ঘুরে দেখব না?’

মা অবাক হতেন, ‘কোথায় বুদ্ধি করে বানানো দেখলেন বলুন তো? অফিস, বাড়ি, বাজার, মন্দির, কবরস্থান সব ঘোঁট পাকিয়ে রয়েছে। রবিদার ছেলে প্যারিস থেকে ফিরেছে। সে বলল...’

‘আরে রাখো তোমার প্যারিস-ফ্যারিস। সবকিছুর একটা ব্যালেন্স রাখতে হয়, বুঝলে? দেখ, অফিস কাছারিতে লোকে যায় পয়সার ধান্দায়, এক জায়গায় যত বেশি অফিস তত বেশি ধান্দা। তাই মাঝে মধ্যে দুটো বাড়ি

ঘর গুঁজে দিতে হয়। আবার ধর কসাইখানার পাশেই একটা মন্দির। মদের দোকানের পাশেই একটা ওষুধের দোকান... না হে, আমার কিন্তু মনে হয় কলকাতা বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি করে ব্যালেন্স রেখেই বানানো...'

ছোড়দাদু এরকম উদ্ভট কথা মাঝে মধ্যেই বলতেন। সেসব মায়ের তেমন পছন্দ হত না। অঙ্কিতা বাবা-মায়ের ঘরে কান পেতে মাঝে মাঝে শুনত আড়ালে মা বাবাকে বলছেন, 'ওই পার্টি পলিটিক্স করেই তোমার কাকার মাথাটা গেছে। যাই বলি কেমন ট্যারাব্যাঁকা উত্তর দেয়...'

'পার্টি পলিটিক্স না। ঠিক বয়সে মেয়ে দেখে একটা বিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যেত...'

মা চটুল হেসে বলত, 'এখনও তো শক্তসমর্থ আছেন, মেয়ে দেখ...'

বাবা একটা হাত বাড়িয়ে মাকে খপ করে ধরে নিয়ে বলত, 'ধুর, এই একটা মেয়ে ছাড়া আর মেয়ে দেখলাম কই জীবনে...'

এরপর এক ছুটে বারান্দায় চলে আসত অঙ্কিতা। বারান্দায় টবে রাখা গাছপালার মাঝেই মেঝেতে শুয়ে থাকতেন দাদু। ওকে পাশে বসিয়ে গল্প বলতেন। সে নানারকমের গল্প। দাদু নাকি একবার ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধে গেছিল। দেশের রাজা আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ইচ্ছা করে খাবার দাবার লুকিয়ে ফেলছিল। ফলে খাবারের দাম বেড়ে যাচ্ছিল চোঁচোঁ করে। গরিব মানুষ খেতে পাচ্ছিল না। শেষে সব গরিব মানুষ মিলে রাজার বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করল। রাজা যাকে পারল জেলে ভরল। পেয়াদা দিয়ে মারল, পিটিয়ে পিটিয়ে মেরেও ফেলল; কিন্তু লাভ হল না। শুনে ভারি বিরক্ত লাগত অঙ্কিতার, সে মুখ ভার করে বলত, 'ধুর, তোমার গল্পের শেষগুলো সব একইরকম হয়। শুধু গরিব লোক আর চাষারা জিতে যায়। রাজা জিততে পারে না কখনও?'

দাদু হেসে বলত, 'জিতবে কী করে? রাজা তো মন্ত্র জানে না...'

'মন্ত্র জানলেই জিতে যাওয়া যায়? আমাকেও শিখিয়ে দাও...' আবদার করত অঙ্কিতা।

দাদু তখন উঠে বসে দু-হাতে তালি দিয়ে দিয়ে ভাঙা সুরে গাইত, 'হেই

সামালো ধান হো/ কাস্তেটা দাও শান হো/ জান কবুল আর মান কবুল/ আর দেব না আর দেব না/ রক্তে বোনা ধান, মোদের প্রাণ হো...'

'জান কবুল আর মান কবুল—ব্যস এটা বলেই চাষারা জিতে যেত!'

অঙ্কিতার তখন বিশ্বাস হত না। এখনও হয় না। বছর খানেক আগে এক রাতে ওর হাতদুটো পাখার ব্লেডে বেঁধে রেখেছিল সৌম্য। গেঞ্জি, প্যান্ট আর অন্তর্বাস ছিঁড়ে পড়েছিল ঘরের এক কোণে। কোমরের চামড়ার বেল্ট দিয়ে ওকে মেরে মেরে রক্তাক্ত করছিল। পা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল, ঘামে রক্তে ভিজে যাচ্ছিল বিছানার চাদর। মুখে কীসব যেন বলছিল সৌম্য, 'তোর মতো স্লাটকে বিয়ে করতে নেই, ছিবড়ে করে ফেলে দিতে হয়...'

অঙ্কিতা প্রথমদিকে চিৎকার করত। পরে রুটিন হয়ে যাওয়ায় অত ছটফট করত না। মাঝে মাঝে যন্ত্রণামাখা শব্দগুলোর সঙ্গে ওই মন্ত্রটা কি দু-একবার বেরিয়ে আসেনি? উঁহু, ওতে আর লাভ হয় না... ও মন্ত্রটা কালের যাত্রায় ভোঁতা হয়ে গেছে।

সিগারেটে দুটো টান দেয় অঙ্কিতা। পিঠে একটা হাতের ছোঁয়া পেয়ে ঘুরে তাকায়। রুমেলাদি এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। এই অফিসে যে ক-জনের সঙ্গে ওর মোটামুটি একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছে তার মধ্যে রুমেলাদি একজন। মধ্যে সেই স্কুল জীবনের মতো নিখাদ বন্ধুত্ব খুঁজে পায়।

অঙ্কিতার হাতের সিগারেটটা প্রায় নিভে এসেছে। সেটা রুমেলার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নেবে?'

কাউন্টার নিতে নিতে ওর পাশটায় এসে দাঁড়ায় রুমেলা, বলে, 'কিছু নিয়ে আপসেট আছিস নাকি? এসে থেকে অন্যমনস্ক দেখছি...'

মুখের সামনে থেকে চুল সরায় অঙ্কিতা। তারপর উল্টোদিকে ফিরে বলে, 'ওই যা চলে, আগের মাসে একটু বেশি কেনাকাটা হয়ে গেছিল। এ মাসে হাতটান যাচ্ছে...'

'সেকি! এর মধ্যেই? লাস্ট উইক তো স্যালারি ক্রেডিট হল...'

'ধুর, সেসব ইএমআইতেই চলে যায় শালা। বিয়ের সময় একগাদা টাকা

লোন নিয়েছিলাম। সামনের মাসে আবার বাবার একটা অপারেশন আছে, তাতে লাখ দেড়েক খসবে...'

'তুই বাবা বড্ড ধুমধাম করে বিয়ে করেছিলি। অত খরচ না করলেই পারতিস।'

সিগারেটে লম্বা একটা রিং ছাড়ে অঙ্কিতা, 'আমার অত শখ ছিল না। বাবা বলল রিসেপশন ওরা এত ঘটা করে করছে, আমরা মুরগির ঝোল ভাত খাইয়ে বিয়ে সারলে আর প্রেস্টিজ থাকবে না।'

'বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রেস্টিজ হেব্বি ঝাঁটের জিনিস মাইরি। খরচ করছি দেখানোর সুযোগ পেলেই আর পায় কে শালাদের। নেহাত সেক্স করার সময় লোক দেখানো যায় না, তাই সবকিছুর দাম বেড়ে গেলেও কনডোমের বাড়েনি। কুড়ি টাকাকে কুড়ি টাকাই রয়ে গেছে...'

অঙ্কিতা হাসে, নিচে ছাই ফেলে বলে, 'তোমারও তো ইএমআই চলছে, সেটা কিসের?'

'আমি চাকরিতে ঢুকেছিলাম কেন জানিস?'

'কেন?'

'একটা ক্যামেরা কিনতে...'

'ক্যামেরা?'

'হ্যাঁ, নিকন জেড-ডি-এক্স আঠেরো। বডি আর লেন্স মিলে লাখের কাছাকাছি দাম। হিসেব করে দেখেছিলাম মোটামুটি বছরখানেক চাকরি করতে পারলে পয়সাটা উঠে আসবে। তারপর চাকরি ছেড়ে ফটোগ্রাফি করে রোজগার করব। ক্যামেরাটা কিনেওছিলাম। দু-একটা বিয়েবাড়িতে কাজও করেছি...'

'তারপর চাকরিটা ছেড়ে দিলে না কেন?'

সিগারেটের ফিল্টারের কাছে আগুন চলে এসেছিল। সেটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয় রুমেলা। তারপর নিজের প্যাকেট থেকে আর একটা ধরাতে ধরাতে বলে, 'নেশায় পেয়ে গেল বাঞ্চত। হুট করে মনে হল ক্যামেরা ছাড়া আমার আরও অনেকগুলো শখ আছে... হতে চেয়েছিলাম আর্টিস্ট, হয়ে

গেলাম বালের লোভী কর্পোরেট। শালা আমাদের এই চাকরি জীবনটা না, একটা টক্সিক রিলেশনশিপের মতো। অত্যাচার করবে, যন্ত্রণা দেবে, কিন্তু ছেড়ে যেতে দেবে না...'

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রুমেলার মুখ দিয়ে। অঙ্কিতার দিকে চেয়ে ও দেখে সেও উদাস চোখে তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। কয়েকদিন ধরেই মেয়েটাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখছে রুমেলা। বাড়িতে শান্তি নেই, টাকাপয়সার টান, অফিসে চাপ, মানসিক যন্ত্রণার কথা না হয় বাদই রাখল। মায়া লাগে রুমেলার, কাঁধে হাত রেখে বলে, 'কিন্তু তুই আগের মাসে এতগুলো এপ্রেইজাল পেলি, এতদিনে বেশ কয়েকটা ইংক্রিমেন্ট হওয়ার কথা, তাতেও লাভ হয়নি?'

'বালের ইংক্রিমেন্ট। আমার ওসব হয় না...'

'কেন?'

'ওর জন্য উপরতলায় তেল দিতে হয়। আমি এসব তেল-ফেল দিতে পারি না...'

'তা যা বলেছিস, তোর কথাবার্তা কেমন যেন কাটাকাটা গোছের। কর্পোরেটে একটু নরমসরম কথা বলতে না পারলে চলে না। এখানে বাল সবাই সবাইকে ডমিনেট করতে চায়। যতক্ষণ না ওর উপরে যাচ্ছিস ওর নিচে ভালো করে থাকাটা শিখতে হবে...'

'সারাজীবন তো তাই করে এলাম। নিচে থাকা শিখলাম ভালো করে...'

নিচে তাকিয়ে ভিখারিটাকে দেখতে পায় অঙ্কিতা। পাশেরই একটা ভাতের হোটেল থেকে রোজ দুপুরের দিকে ফেলে দেওয়া ভাতের খানিকটা ওকে দিয়ে যায়। সেটাই হলদে টাইপের কী দিয়ে যেন মেখে খাচ্ছে। একটু হেসে রুমেলা বলে, 'এর থেকে শালা ভিখারি হলেই ভালো হত। ইএমআই-এর টেনশন নেই, সংসারের জোয়াল টানা নেই, বসের খিস্তি নেই, আরামের জীবন...'

'তার উপরে বাবা আজকাল থেকে থেকে আবার বিয়ের জন্য সম্বন্ধ নিয়ে আসছে...'

'বেশ, তো তুই চাস না বিয়ে করতে?'

মাথা নামিয়ে নেয় অঙ্কিতা, 'না, ভয় লাগে।'

'আরে সব ছেলে তো সৌম্যের মতো নাও হতে পারে।'

রুমেলার দিকে তাকিয়ে হাসে অঙ্কিতা, 'এই টক্সিক রিলেশনগুলোর সমস্যা কী জানো তো? দীর্ঘদিন এর মধ্যে থাকলে এই সম্পর্কগুলো তোমায় বুঝিয়ে দেবে যে তোমার মতো একটা মেয়ে এই সমস্ত কিছু ডিজার্ভ করে। ওই মার, সেক্সচুয়াল টর্চার, ডমিনেসন... ইউ ফাকিং ডিজার্ভ অল দ্যাট... সব ছেলে সৌম্যের মতো নয়, কিন্তু সব সম্পর্কের একটা দিকে তো আমি থাকব, বলো?'

'এর মধ্যে আর কাউকে ভালো লাগেনি?'

কাঁধ ঝাঁকায় অঙ্কিতা, 'ফেসবুকে একটা ছেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ক-দিন। ছবি আঁকত ছেলেটা। কথাবার্তা খারাপ না...'

'তারপর?'

'তারপর বলল ন্যাংটা ছবি পাঠাতে। নুড স্টাডি করবে। চুদির ভাইটা সামনে থাকলে ওই নুড স্টাডি ওর গাঁড়ে গুঁজে দিতাম... শালা গোটা সমাজটা ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাও এদের মেয়েদের শরীর লাগে...'

ফিরতে হবে। পনেরো মিনিট প্রায় শেষ হতে চলেছে। রুমেলা ভিতরের দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলে, 'শেষ কবে মদ খেয়েছিস বল তো?'

'হবে, মাসখানেক আগে।'

'গ্রেট, পরশু আমার বাড়ি চলে আয়। ভালো বিয়ার আছে...'

রুমেলার কথাগুলো খুব একটা ভালো করে কানে যায় না অঙ্কিতার। ও রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে চেয়ে থাকে বস্তার ছাউনির পাশে শুয়ে থাকা ভিখারিটার দিকে। খাওয়া শেষ করে বাসন ধুয়ে পাশ ফিরে রাস্তার উপরেই নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েছে।

কী যেন অদ্ভুত একটা ব্যাপার আছে লোকটার মধ্যে। মুখে কিছু না বলেও যেন ওদের ঝাঁ-চকচকে অফিস, কেতাদুরস্ত জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করে লোকটা। কোনও খারাপ উদ্দেশ্য আছে কি?

রেলিং থেকে সরে আসে অঙ্কিতা।

(২)

'দেখ আমরা আর পাঁচটা বাবা-মার মতো কোনওদিনও কনজার্ভেটিভ ছিলাম না। যেদিন প্রেম করতে চাইছিস করেছিস। যেদিন বিয়ে করতে চেয়েছিস, তাও করেছিস। আমরা কোনওদিনই তোকে বাধা দিই না...' টিভিতে খবরের চ্যানেলে অ্যাড দিয়েছে। তাই অন্য চ্যানেল ঘোরালেন বাবা। এখানেও অ্যাড। বিড়বিড় করে বললেন, 'এরা শালা যুক্তি করে অ্যাড দেয়। সব হারামজাদা...'

'আর আজ জাস্ট কিচ্ছু করতে চাইছি না। তাতেই বা বাধা দিচ্ছ কেন?' চোখ থেকে চশমাটা খুলে ঠক করে টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখে অঙ্কিতা। অফিসে গাধার মতো খাটনি গেছে আজ। তার উপরে বাড়ি ফিরতেই মা আর বাবা মিলে ঝিঁঝিঁ পোকার মতো আসর বসিয়েছে।

মা এগিয়ে আসে ওর কাছে। পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, 'আমরা শুধু চাই না সারাজীবন তুই এভাবে একা একা কাটা...'

'আরে বিয়ে ভাঙাটা আজকালকার দিনে কোনও বড় ব্যাপার নয়। কত লোকের ডিভোর্সের পর আবার বিয়ে হচ্ছে। তোমার মেয়ের এসব জেদ।'

'হ্যাঁ বেশ করছি জেদ করছি। আমার লাইফ আমি জেদ করব না তো কি পাশের পাড়ার পাঁচুদা করবে? নাকি তোমাদের ওই বাঞ্চত কুমারেশ করবে?'

'আঃ তুই কুমারেশের উপরে কেন এত রাগ করছিস বল তো? ও জাস্ট আগ্রহ দেখিয়েছে...'

'আগ্রহ? ফেসবুকের পোস্টগুলো দেখেছ শুয়োরটার। ব্লাডি মিসোজিনিস্ট। অনলি রিজন হি ওয়ান্টস টু ম্যারি মি ইজ ওকে এই বয়সে আর কেউ জাস্ট দেয় না...'

এতক্ষণে বিজ্ঞাপন শেষ হয়েছে। রাজনীতির কচকচি চলছে চ্যানেলে চ্যানেলে। বাবা ভলিউম বাড়িয়ে সেদিকে মন দেন। সেই সুযোগে বাকি কীর্তনের দায়িত্ব মা কাঁধে তুলে নেন, 'আসলে তোকে নিয়ে টেনশন হয় বাবার। পরের মাসে এতগুলো খরচ...'

'তার জন্য বাবার টেনশনের কী হয়েছে? আমি বলেছি তো...'

মা একটু ইতস্তত করে, ঢোঁক গিলে বলে, 'তুই আর ক-টা টাকাই বা রোজগার করিস... তোর একার পক্ষে...'

'মানেটা কী?' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে অঙ্কিতা, 'বললাম টাকাটা জোগাড় করে ফেলব, তাও এই কম রোজগারের খোঁটাটা না দিলেই চলছিল না তোমার?'

'তোকে কিছু বলা মানেই তোর মনে হয় খোঁটা দেওয়া হচ্ছে।' টিভির ভলিউম কমিয়ে বাবা মুখ তোলেন, 'এই বাজারে একটু বুদ্ধি করে না চললে...'

'মানে? বলতেটা কী চাইছ?'

'কুমারেশের টাকাপয়সার অভাব নেই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কী র‍্যাঙ্কে চাকরি করে খোঁজ নিয়ে দেখ...'

'আমি বুদ্ধি করে বিয়ে করতে পারব না। বুলশিট...' টেবিলের উপরে একটা ঘুসি মেরে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল অঙ্কিতা। পেছন থেকে মায়ের মিহি গলা শুনতে পায়, 'ভালোবেসে বিয়ে করেও তো দেখলি... সেই তো...'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অঙ্কিতা। পেছন ফেরে না। পাথরের মূর্তির মতো সেভাবেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ কানে আসে, টিভিতে সন্ধের চিৎকার, পাশের বাড়ির পাম্প চলার শব্দ।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় অঙ্কিতা। আলোটা নিভিয়ে বিছানার উপরে চুপ করে শুয়ে থাকে। কয়েক সেকেন্ড পর চোখের কোলে বেয়ে নেমে আসা জলের রেখাটা মুছে নেয়।

ছোড়দাদুর কথা হঠাৎ করেই মনে পড়ে যায়। ওর ছোটবেলার কথা ভাবলেই দাদুর কথা মনে পড়ে। অঙ্কিতার মনে হয় এখনও যেন পাশের বারান্দায় বসে বছর ষাটের ঋজু মানুষটা সুর করে গাইছেন—মোরা তুলব না ধান পরের গোলায়। মরব না আর ক্ষুধার জ্বালায় মরব না।

দাদুর সারা গায়ে ধানের গন্ধ লেগে থাকত। সোনালি সোনালি ধুলোর মতো মনে হত রোদে পোড়া বুকের লোমগুলোকে। কাঁধের গামছাটা ভারি

নরম ছিল। সে গামছা দিয়ে কতবার ওর মুখ মুছে দিত দাদু।

আবার হাতের উলটোদিক দিয়ে চোখের জল মোছে অঙ্কিতা। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে মন্ত্রটা, 'জান কবুল আর মান কবুল।'

নাহ, লাভ হয় না। এসব চাষাদের মন্ত্র। খাদ্য আন্দোলনের মন্ত্র। বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। এমনকী অফিসের বাইরে ওই হাতকাটা চাষিটাও আর এসব গান গায় না।

টুংটুং শব্দ করে একটা মেসেজ ঢোকে অঙ্কিতার ফোনে, বাসু স্যার মেসেজ করেছেন, 'তোমার ইংক্রিমেন্টের জন্য তদ্বির করছি খুকি। মনে হয় হয়ে যাবে।'

অঙ্কিতার ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটে। উল্টো মেসেজ পাঠিয়ে দেয়, 'একটু দেখুন স্যার, হাঁড়ি চলছে না।'

ফোনটা পাশে সরিয়ে রেখে একটা বালিশ মাথার নিচে টেনে নেয় অঙ্কিতা। তারপর পাশ ফিরে জানলার দিকে চেয়ে শোয়। ভারি অসহায় লাগে ওর নিজেকে। এই কর্পোরেট নাকি একটা কয়লা খনির সিঁড়ির মতো। এখানে কায়দা করে উপরে উঠতে হয় নাহলে কয়লার বিষাক্ত গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে আসে।

চোখ বুজতে অঙ্কিতার মনে হয় সত্যি বিষাক্ত গ্যাসে ওর দম বন্ধ হয়ে আসছে। অনেক বছর ধরে একটু একটু করে ওর নিঃশ্বাস ভোরে উঠছে কালো ধোঁয়ায়। ছটফট করতে থাকে অঙ্কিতা, আর মৃদু কানে আসে সেই মাটিতে বাটি ঘষার ঘড়ঘড় শব্দটা।

(৩)

রাত সাড়ে বারোটা বাজে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় ওদের দু-জনের ছায়াটাই রাস্তার উপরে প্রলম্বিত হয়েছে। দু-জনের হাতেই বিয়ারের বোতল। এর আগে আরও তিনটে ঠিক ওই সাইজের বোতলই শেষ করেছে অঙ্কিতা। তারপর গরম লাগতে রুমেলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছে ফাঁকা রাস্তায়।

রাস্তায় গাড়িঘোড়া এখন প্রায় চলছে না বললেই চলে। রুমেলার ফ্ল্যাটটা

সল্টলেকের একেবারে মধ্যিখানে। এ পাড়ার বেশিরভাগ বাড়িই অবস্থাপন্ন বড়লোকেদের। একটি মাত্র ফ্ল্যাট। এখানেই ভাড়া থাকে রুমেলা। সপ্তাহান্তে একবার করে বর আর বাচ্চার কাছে যায়। সোমবার সকাল সকাল আবার অফিসমুখো।

অঙ্কিতা বুঝতে পারে ক-বোতল বিয়ার শেষ করে নেশাটা গাঢ় হয়েছে ওর। পা'টা স্বাভাবিক ছন্দে চলছে না। নেহাত সল্টলেকের রাস্তা একেবারে ঢোঢা ফাঁকা। নইলে যেকোনও সময় গাড়ির তলায় যেতে পারত।

'তোর আর টেনশনের কী আছে এখন? স্যার তো বলেছে ইংক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করে দেবে... আর বলেছে যখন...'

গরম লাগছিল বলে উপরের জামাটা খুলে ফেলে বাড়িতে পরার ট্যাঙ্ক টপ গলিয়ে নিয়েছিল অঙ্কিতা। রাতের হাওয়া শরীরে লেগে শিরশিরে একটা অনুভূতি হচ্ছে। সেটা মাখতে মাখতেই বলল, 'ধুর, লাভ হবে না ওতে... শুতে হবে...'

'আর ইউ নাটস? বাসুস্যারের নামে একটা খারাপ কথা শুনিনি কোনওদিন। বিবিবাচ্চাওয়ালা আদমি...'

'জানি, কিন্তু ওর উপরে আর একটা বাঞ্চত বসে আছে। কী যেন নাম শালার, এস টি জোশী না কী...'

'সে কী বলেছিল তোকে?'

'অফিসে ডেকে শুতে বলেছিল, আর কী বলবে...' রাস্তার উপরেই একদলা থুতু ফেলে অঙ্কিতা, 'ও শালা চেয়ারে থাকতে আমার কিছু হতে দেবে না, না এপ্রেইজাল, না ইংক্রিমেন্ট, না ঝাঁটের বাল...'

'তুই এক কাজ কর, টিম চেঞ্জ করে নে।'

'নিয়ে? অন্য এইচআর বলবে কলিগের সঙ্গে কোল্ড ওয়ারে যেতে চাই না। তুমি নিজের মতো বুঝে নাও...'

কথা বলতে বলতে রাস্তার ধারে একটা রেলিংয়ে ঘেরা ছোট জলাশয়ের ধারে এসে পড়ে ওরা। নরম ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে এখানে। শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে।

কাঠের রেলিং ধরে কোনওরকমে বসে পড়ে অঙ্কিতা, বসতে বসতে বলে, 'নিজের মতো বুঝে নাও... এরা কেউ শালা কাউকে নিয়ে ভাবে না।'

বোতলে ঠোঁট ডুবিয়ে বড় চুমুক দেয় রুমেলা, তারপর সামনে জলের দিকে চেয়ে বলে, 'আমরা ছোটবেলায় সেই একটা ভালুকের গল্প পড়েছিলাম মনে আছে? যেখানে ভালুকটা শুয়ে থাকা বন্ধুর কানে কানে বলেছিল দরকারের সময় যে পালিয়ে যায় তাকে বন্ধু বলে না... এ শালারা সে গল্পটা পাল্টে দিয়েছে...'

অঙ্কিতা হাঁটুর উপর থুতনি রেখে বসে বলে, 'ছোটবেলার সব গল্প আর শিক্ষাই পাল্টে দিয়েছে এরা। আমার দাদু বলত, জানিস?'

'কী বলত?'

'পয়সা আর লোভ মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। ছবি আঁকার স্বাধীনতা, গান গাওয়ার স্বাধীনতা, সারাদিন বয়ফ্রেন্ডের কোলে মাথা দিয়ে ঘুমানোর স্বাধীনতা, কিংবা ধর এইরকম খোলা আকাশের নিচে রাতবিরেতে বসে থাকার স্বাধীনতা। ওদের মতে সবকিছুরই একটা কারণ থাকতে হবে, সব কাজের শেষে একটা পয়সা কামানোর হিসেব থাকতে হবে। অনর্থক কিছুই করব না, অনর্থক অন্যের সাহায্যই তো আরই নয়...'

ওর দিকে মুখ ফেরায় রুমেলা, 'স্বাধীনতাহীন মানুষ স্বার্থপর হয়। আর যত বেশি স্বার্থপর হয় তত এদের এই বিরাট সিস্টেমটার সঙ্গে খাপে খাপ মিলে যায়। তোর-আমার মতো।'

বোতলটা শেষ করে একটু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অঙ্কিতা, 'আমিও কবে শালা এরকম হয়ে গেলাম, না রে? দাদু দেখলে খুব কষ্ট পেত। আসলে বিয়েটা ওইভাবে ভেঙে যেতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। বাবারও তেমন রোজগার নেই, এদিকে শরীরের পেছনেও অতগুলো করে টাকা প্রতি মাসে... তাও...'

অঙ্কিতার মুখের সামনে চুলের গোছা এসে পড়েছে। সেগুলো সরিয়ে আবার ঠোঁট ভেজায় ও, 'তাও আমার বাপ-মায়ের কাছে বোঝা হয়ে গেলাম। ওদের একটা পয়সাওয়ালা মেল অ্যাডভাইজার চাই। মেয়েমানুষ আর যাই

হোক ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি হতে পারে না। কাল শালা হেব্বি কথা শুনিয়ে দিয়েছি মুখের উপর...'

'তুই বাবা-মাকে খুব ভালোবাসিস, নারে?' রুমেলার কথাগুলো যেন ম্যাজিকের মতো কাজ করে। অঙ্কিতা কাঁদে না। সৌম্যর হাতে মার খাওয়ার পর থেকেই ফ্যাচফ্যাচে কান্নাকাটি টাইপের নরম অনুভূতিগুলো ফুরিয়ে গেছে ওর। তাও আজ এই পুকুরের ধারে বসে রাতের ঠান্ডা হাওয়া যেন ওর চোখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে যায়। চাঁদের আলোয় চিকচিক করে ওঠে ওর মুখ, 'খুব...'

রুমেলা ধীরে ধীরে ওর মাথাটা বুকে টেনে নেয়। নিরাপত্তার উষ্ণতা গ্রাস করে ওকে। ও একটা হাতে রুমেলার কোমর জড়িয়ে ধরে। শরীরটা ফুঁপিয়ে ওঠে দু-বার।

'আয়াম সো ফাকিং টায়ার্ড অফ অল দিস, ভালো লাগছে না আমার আর...' ফোঁপাতে ফোঁপাতেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

'লোকটার নাম কী বললি যেন?' রুমেলা নিচু স্বরেই প্রশ্ন করে।

'কোন লোক?'

'ওই বাঞ্চতটার...'

'এস টি জোশী...' নামটা বলে মুখ তুলে হাসে অঙ্কিতা, 'রাগের মাথায় মালটাকে নিয়ে একটা ছড়া বানিয়েছিলাম, জানিস। এস টি জোশী, তোর মুখে পোঁদ ঘষি, তোর ভুঁড়ি বাড়ছে ঘুষে, মর নিজের ধন চুষে...'

'খুব সুন্দর। আয় এবার।' কথাটা বলেই ওর হাত ধরে টান দেয় রুমেলা। ওকে যেন এক দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে মেয়েটা।

'যাঃ শালা! আবার কোথায় যাব?' অঙ্কিতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

'আয়, তারপর দেখছি কোথায় যাওয়া যায়।'

রুমেলার মনে হয় নেশা চড়ে গেছে। অঙ্কিতাও খুব একটা আপত্তি করে না। মেয়েটার উপর ওর নিজে থেকেই একটা ভরসা আসে। কর্পোরেট জগতে এরকম একটা মানুষ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

খানিকটা হাঁটার পর একটা তিনতলা জমকালো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দু-জনে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। রাত গভীর হয়েছে বলে বাড়ির বেশিরভাগ

আলোই নিভে গেছে। তাও বোঝা যায় বাড়ির মালিক নেহাত কম খরচ করেননি।

‘এ কোথায় আনলি শালা?’ অঙ্কিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

‘তোর জোশীবাবুর বাড়ি।’

চোখ বড় বড় করে বাড়ির বাইরে নাম ফলকটা লক্ষ করে অঙ্কিতা। সত্যি ওই নামটাই লেখা আছে বাইরে। থতমত খেয়ে বলে, ‘এ শালা এখানে থাকে নাকি? কিন্তু আমি কী করব?’

নিচু হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা লাল ইট তুলে নেয় রুমেলা। তারপর সেটা অঙ্কিতার দিকে এগিয়ে দেয়, ‘নে, এটা দিয়ে লিখে দে।’

‘কী লিখব?’

‘তোর ওই ছড়াটা...’

অঙ্কিতার চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে উঠল, ‘ধুর, এসব ছেলেমানুষি।’

‘উঁহু, ছেলেমানুষি না, স্বাধীনতা। একটা পারভার্ট লোকের দরজায় যদি খিস্তি লিখতে না পারিস তাহলে আর কিসের স্বাধীনতা?’

অঙ্কিতা আবার প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই হেসে ফেলে। সত্যি, কাল সকালে মদের নেশা নেমে গেলে আর এসব ছেলেমানুষি করা হবে না।

দু-পাশে তাকিয়ে একবার ভালো করে দেখে নেয় ও। নাঃ সিসি টিভি জাতীয় কিছু দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কেউ জানতেও পারবে না। রুমেলা একটু পিছিয়ে দাঁড়ায়।

উৎসাহে লাল ইট দিয়ে গোটা ছড়াটা পাঁচিলের উপরে ফলাও করে লিখে দেয় অঙ্কিতা। লিখতে লিখতে তার মুখ আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেন অনেক দিন পরে মনের উপর জমা হওয়া মেঘটা সরে যায়।

লেখা হয়ে যেতে একটু পিছিয়ে এসে ছড়াটা বেশ কয়েকবার পড়ে অঙ্কিতা। রুমেলাও ওর কাঁধে হাত রাখে, বিড়বিড় করে বলে, ‘কাল সকালে বাড়ির পাঁচিল দেখে মুখের কী হাল হবে ভাব বাঞ্চতটার...’

অনেকদিন পর মনটা ভারি খুশি খুশি লাগে অঙ্কিতার। ইটের রং লাগা হাতে রুমেলার হাত জড়িয়ে ধরে সে।

আজও অঙ্কিতা অফিসে ঢোকার মুখে সেই ভিখারিটা পথ আটকেছিল, 'ধার দিবেন?'

ঝোঁকের মাথায় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ফেলেছে অঙ্কিতা। দিয়েই হাত কামড়েছে। আগে ভালো খবরটা আসুক তারপর নাহয় হাত লম্বা করবে। কাল রাতে বাসুদা বলেছে আজকের মধ্যে ওর কনফারমেশনের মেইল ঢুকবে। তাতেই টাকাপয়সা বাড়বে কি না বোঝা যাবে। আগে থেকে এত নেচে পরে কিছুই না হলে?

অফিসে বেশ কয়েকবার বাসুদার রুমে ডাক পড়েছে। ওকে দেখেই হেসে বাসুদা বলেছে, 'না, না এখনও কোন মেইল আসেনি। তখন কিন্তু ছাড়া মিষ্টি ছাড়া অ্যালাউ করব না...'

সারাদিন দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করল অঙ্কিতা। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা যত এগোল ততই খারাপ হয়ে যেতে লাগল মনটা। তবে কি আজ আসবে না? কালও যদি না আসে? তার পরের দিন?

ব্রেকের সময়ে বারান্দায় গিয়ে ভিখারিটাকে আবার লক্ষ করে। ব্যাটা দুপুরের ঘুম দিয়েছে শান্তিতে। লোকটাকে দেখে আজকাল হিংসা হয়। ভালো খবর, খারাপ খবর কিছুই আসার নেই ওর। ওরই নিশ্চিন্তের জীবন।

ঘড়িতে রাত দশটা বাজতে মাথাটা গরম হয়ে গেল অঙ্কিতার। বাসুদা ঘণ্টাখানেক আগেই শুকনো মুখে বেরিয়ে গেছে অফিস থেকে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে তার নম্বরটা ডায়াল করল ফোনে, দু-বার রিং হতেই ওপাশ থেকে তেমনই বিষণ্ণ গলা শোনা গেল, 'না অঙ্কিতা, নট ইয়েট...'

'আই নো, আমি জাস্ট জানতে চাই আদৌ ওটা আসবে না আপনি মিথ্যে আশা দেখিয়ে...'

ওপাশের লোকটার গলা আগের মতোই শান্ত শোনায়, সহানুভূতির স্বর মেশে তাতে, 'তোমাকে আশা দেখিয়ে আমার কী লাভ বলো?'

'আমি জানি না, দেখুন স্যার টাকাপয়সার আমার ভীষণ দরকার। অ্যান্ড আই নিড ইট রাইট নাও। আপনি যেভাবেই হোক...'

কথাটা বলতে গিয়েও থেমে যায় অঙ্কিতা। বেপরোয়া হয়ে বাজে একটা দাবি করে ফেলেছে সে। ওপাশের গলাটা আবার শোনা যায়, 'তুমি বেরচ্ছ এখন?'

'আরও ঘণ্টাখানেক পরে বেরব। ব্রেকে বাইরে এসেছি।'

'ওকে, আজ ঠান্ডা মাথায় বাড়ি যাও। কাল যেভাবেই হোক কিছু একটা জানাচ্ছি আমি তোমাকে...'

ফোনটা মুখের উপরেই কেটে দেয় অঙ্কিতা। আবার টেবিলের দিকে ফিরতে গিয়ে দেখে রুমেলা দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। চোখের দৃষ্টিতে একটা বিরক্তির ভাব, ওর দিকে একপা এগিয়ে এল সে, 'অকারণেই লোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিস তুই...'

'অল দ্যাট আই ক্যান এফোর্ড রাইট নাও...'

কথাটা বলে এগিয়ে আসছিল অঙ্কিতা। ওকে হাত ধরে থামিয়ে দেয় রুমেলা, 'তুই জানিস কেন তোর মাইনে বাড়ে না? তোর কাজের জন্য না, সমস্যা হল তোর এই অ্যাটিটিউড...'

'অ্যাটিটিউড? আই সি? কাকে গালাগাল করেছি আমি?

'গালাগাল করাটা বড় কথা নয়। তোকে কতবার বলেছি কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড-এর নিয়ম হচ্ছে যার নিচে আছিস তার নিচে থাকাটা ভালো করে শিখতে হবে। সবসময় অতটা অবাধ্য হলে চলে না। আর পাঁচটা মানুষের থেকে এগিয়ে যেতে গেলে নিজের স্কিল ছাড়া নিজেকেও ব্যবহার করা শিখতে হবে...' রুমেলার গলায় আজ কাঠিন্য এসে মিশেছে। এই মানুষটাকে চেনে না অঙ্কিতা।

'ওসব ঢলানি আমাকে দিয়ে হবে না ভাই। আমার বাপ-মা আমাকে ওই শিক্ষা দেয়নি...'

'সেই বাপ-মাই তোকে খোঁটা দিতে তো ছাড়ে না...'

কাঁধ ঝাঁকায় অঙ্কিতা, 'আই ডোন্ট কেয়ার। আমি আনফেয়ার গেম খেলি না...'

ওর দিকে একপা এগিয়ে এসে ওকে রেলিংয়েই চেপে ধরে রুমেলা, ‘এই দুনিয়ার কোন লড়াইটা ফেয়ার গেম অঙ্কিতা? কোটিপতির ছেলে, যারা কোনওদিন কোনওভাবে ডিপ্রাইভড নয় তারা কাস্ট সার্টিফিকেট ব্যবহার করে না? সেটা ফেয়ার গেম? যার বাপের পয়সা আছে, কিংবা মামা-কাকা আছে তাদের সাদা খাতায় চাকরি হয়ে যায় না? সেটা ফেয়ার গেম? কোনও মেয়ে নিজের রূপ ব্যবহার করে ভিক্টিম-প্লে করে না? দুনিয়ার কোনও ছেলে তার অবাধ্য বউকে শুধু গায়ের জোর আছে বলে, আর বউ ফিনান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় বলে মেরে লাল করে দেয় না? সেটা ফেয়ার গেম? এই পৃথিবীতে সব থেকে বড় বোকামি কি জানিস অঙ্কিতা? একটা চোট্টামিতে ভরা গেমে একা সৎ প্লেয়ার হয়ে বোকাচোদামি করা...’

অঙ্কিতার মুখ নেমে আসে। উসকোখুসো চুলগুলোকে দু-হাতে সরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মাথা নাড়িয়ে বলে, ‘জানি, এতগুলো বছর ধরে সেটাই দেখে আসছি। কিন্তু কোথাও একটা আটকে যাই আমি...’

‘কোথায়?’

ভেবেচিন্তে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় খুব ক্ষীণ একটা গড়গড় আওয়াজ ভেসে আসে। নিচে সেই ভিখারি লোকটা আবার মাটিতে বাটি ঘষছে। এত রাতে অফিসের সামনের রাস্তাটা শুনশান হয়ে গেছে। সেখানে কার থেকে ভিক্ষা চাইছে আবার?

অঙ্কিতার মাথাটা ধরে গেছে। ও আর দাঁড়ায় না। এক ছুটে বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসে।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন ও অফিস থেকে বের হয় তখন রাত ঘন হয়ে গেছে। বাইরে পার্কিংয়ের কাছে ওর স্কুটিটা দাঁড়িয়েছিল। মাথায় হেলমেট গলিয়ে সেটা স্টার্ট করতে যায়, কিন্তু স্টার্ট হয় না।

বারবার চাবি ঘুরিয়েও স্টার্ট হচ্ছে না স্কুটিটা। অঙ্কিতার মাথাটা গরমই ছিল, এতক্ষণে আগুন জ্বলতে শুরু করে তাতে।

‘ফাক...’ শব্দটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে স্কুটির গায়ের সজোরে একটা লাথি মারে অঙ্কিতা। সিমেন্টের মেঝের উপরেই সশব্দে উল্টে পড়ে যায়

সেটা। রাগের মাথায় আবার লাথি মারতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে একটা গাড়ির আওয়াজ পেয়েই থমকে যায়।

গাড়িটা এতক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিল সেটা খেয়াল করেনি ও। মুখ তুলে দেখে বাসু স্যার দরজা খুলে নেমে আসছে গাড়ি থেকে। এতক্ষণ তার মানে অফিসের আশপাশেই ছিলেন ভদ্রলোক? ওর রাগটা একটু প্রশমিত হয়। স্যারের সামনে এতটা মেজাজ হারানো ঠিক হয়নি।

'মানুষের উপর রাগ, যন্ত্রের উপর দেখালে চলে?' হাসতে হাসতেই ওর দিকে এগিয়ে আসেন বাসু, 'রাগ, দুঃখ, অভিমান আর একটা মানুষই নিতে পারে। যন্ত্র নয়...'

অঙ্কিতা একটা করুণ হাসি হাসে, 'আমার অভিমান দেখানোর কেউ নেই তো, তাই আর কী...'

'চারপাশে তাকালেই দেখতে পাবে...'

স্কুটিতে আর একবার চাবি ঘোরানোর চেষ্টা করল অঙ্কিতা, বাসু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওটা আজ থাক না হয়, তোমার অভিমানের প্রেশার নিতে পারবে না। তার বদলে একটা মানুষ তোমার সামনে আছে যখন...'

রাস্তার আওয়াজগুলো হুট করেই নিভে আসে। একটু দূরে ভিখারির ছাউনিটা দেখা যাচ্ছে। এখন কোনও আওয়াজ আসছে না সেখান থেকে। ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা।

অঙ্কিতা একটু থতমত খেয়ে বলে, 'মানে?'

বাসু স্যারের মুখে একটা নরম হাসি ফোটে, 'দেখ, আমি জোর করার মতো মানুষ নই... জোর করে তোমার হাতটা অবধি ধরব না। ইটস জাস্ট...' মাথা চুলকে গাড়ির উপরে একটা চাপড় মারে বাসু, 'তুমি একটা ডিভোর্সী মেয়ে। অলরেডি ফাস্ট্রেটেড... আমার নিজের জীবনে হাজারটা ফ্রাস্ট্রেশন। আমাদের দু-জনের কারওরই তো কোনও ক্ষতি হবে না। আই মিন ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ, তাই না...'

অঙ্কিতার গলকণ্ঠটা একবার ওঠানামা করে, সে বিড়বিড় করে বলে, 'আপনার বউ বাচ্চা আছে স্যার...'

‘গড়িয়াহাটের কাছে একটা রেজিস্টার্ড ফ্ল্যাটও আছে। আই গেস তোমার ওটা ভালো লাগবে। যে হাসপাতালে তোমার বাবার অপারেশন হওয়ার কথা সেখানে কিছু চেনাজানাও আছে। বলো তো তাদের নম্বরটা...’

‘গো ফাক ইয়োর মাদার...’ দু-হাতে একটা ধাক্কা মেরে মানুষটাকে সরিয়ে দেয় অঙ্কিতা। সোনালি চশমার আড়ালে লোভে চকচক করছে দুটো চোখ। কেমন স্যাঁতস্যাঁতে সরীসৃপের স্পর্শ লোকটার সমস্ত শরীরে।

হেঁটেই আবার অফিসে ঢুকে আসছিল অঙ্কিতা, পেছন থেকে বরফের মতো ঠান্ডা গলার আওয়াজ ভেসে এল, ‘ইউ সি বউ-বাচ্চা ছাড়া আরও একটা দরকারি অ্যাসেট আছে আমার কাছে। আই থিঙ্ক ইউ উইল লাভ টু সি ইট...’

নিজের মোবাইলে একটা ভিডিও খুলে ওর দিকে ফিরিয়ে চালিয়ে দেয় বাসু। প্রথমে আওয়াজ শুনতে পায় অঙ্কিতা। তারপর দৃশ্য ভেসে ওঠে। ভিডিওতে নিজেকেই দেখতে পায় ও। মাঝরাতে মদের বোতল হাতে একটা তিনতলা বাড়ির বাইরের পাঁচিলে নোংরা ছড়া লিখছে ও।

‘এটা রুমেলা...’ মুহূর্তে অঙ্কগুলো স্পষ্ট হয় মাথার ভিতরে, ‘ব্লাডি বিচ...’ নিজের হাতেই নিজের কপাল চাপড়ায় অঙ্কিতা।

‘সি, আমি বা অন্য কেউ তোমাকে কুপ্রস্তাব দিয়েছি এর কোনও প্রুফ নেই। অ্যান্ড গেস ওয়াট, কুপ্রস্তাব দেওয়াটা আইনি অপরাধ না। ইনটারনেটে দু-দিন বাওয়াল করতে পারবে ম্যাক্সিমাম। বাট ইউ নো ওয়াট আই ক্যান ডু উইথ দিস ফুটেজ? তোমার এই চাকরি, সেই চাকরি সব খেয়ে নিতে পারি... আই ক্যান টার্ন ইউ ইন্টু আ ফাকিং বেগার উইথ দিস...’

অঙ্কিতার কানের পাশটা গরম হয়ে ওঠে। ভিডিওটা একটু আগে বন্ধ হয়ে গেছে। ব্ল্যাঙ্ক স্ক্রিনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ও, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ায়।

‘সি আমার তোমার সাথে শত্রুতা নেই। আমি জাস্ট তোমাকে এই শিক্ষাটুকু দিতে চাই। এখানে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। দ্যাটস দ্য মান্ত্রা। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট?’

লোকটার মুখের ঝাঁজ হুট করেই কমে আসে। স্নেহশীল পিতার মতো

ওর মাথায় একটা হাত রাখেন বাসু, 'বাট নো হারি মাই লেডি। কোনও তাড়াহুড়ো নেই। আপাতত চলো, তোমাকে বাড়ি অবধি ছেড়ে দিই...'

ওর হাত ধরে নিজের গাড়ির দিকে টান দেয় বাসু। অঙ্কিতা হালকা বাধা দেয়, 'না টাইম লাগবে না, আমি এখনই ভেবে বলছি...'

বাসু একটু অবাকই হয়, 'এখনই? রিয়ালি?'

পাথরের মতো বলে অঙ্কিতা, 'হ্যাঁ, জাস্ট একটু একা থাকতে দিন আমাকে...'

'বেশ, টেক ইয়োর টাইম। আমি গাড়িতেই ওয়েট করছি...'

ধীরে ধীরে হেঁটে রাস্তার একটা ধারে এসে বসে পড়ে অঙ্কিতা। রাতটা কি এক ধাক্কায় আরও অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে? সমস্ত চরাচর ডুবে গেছে নৈঃশব্দ্যে। পাশেই এতবড় অফিসের ভিতরে যে এতগুলো মানুষ আছে তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। অঙ্কিতার ঠিক পাশেই সেই ভিখারির বস্তার ছাউনিটা। তারও কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ওর হঠাৎ মনে পড়ে যায় সৌম্যর কথা। দিনের পর দিন ওর গলা টিপে ধরে, কিংবা চুলের মুঠি ধরে অকথ্য যৌন অত্যাচার করত ওর হাসব্যান্ড। এ লোকটা ততটা খারাপ নয়। এ ওর কাছে একটা অপশন দিয়েছে, একটা লাইফলাইন। ওর তো হারানোর কিছু নেই।

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে অঙ্কিতা। চুলগুলো মাথার পেছনে বেঁধে নেয়। কোমরে ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এমন সময় বস্তার ছাউনির ভেতর থেকে সেই বাটি ঘষার শব্দটা আবার ভেসে আসে। লোকটা ঘুমায়নি?

ঘড়ঘড়... ঘড়ঘড়... একটানা নিরবচ্ছিন্ন আওয়াজ...

কিন্তু এখন সে ভিক্ষা চাইছেটা কার কাছে?

হুট করে একটা পুরনো কথা মনে পড়ে যায় অঙ্কিতার। এই বাটি ঘষার আওয়াজটা ও আগেও শুনেছে। আজ থেকে অনেক বছর আগে। অবিকল এই একই আওয়াজ। এই প্রথম অঙ্কিতা বুঝতে পারে—আওয়াজটা বাটি ঘষার নয়...

কয়েক সেকেন্ড পরেই বস্তার ছাউনি থেকে একটা হাত বেরিয়ে আসে।

অঙ্কিতার হাতে কিছু একটা গুঁজে দিয়ে আবার ছাউনির ভিতরেই মিলিয়ে যায় হাতটা।

—

বাসুর গাড়িটা তখনও পার্কিংয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাচের দরজায় টোকা দেয় অঙ্কিতা। দরজা খুলে একগাল হাসে বাসু, 'সো ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড?'

চাঁদের আলো খেলা করছে অঙ্কিতার মুখে, সেক্টর ফাইভের এই ইট-পাথরের জঞ্জালের ভিতরেও এত চাঁদের আলো আসে এতদিন খেয়াল করেনি বাসু। অঙ্কিতা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বাসুর মুখের দিকে। একটু আগে ওর চোখ থেকে চশমাটা খসে পড়ে গেছে। ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না লোকটার মুখটা। সৌম্য বসে আছে কি? নাকি কুমারেশ? নাকি নুড স্টাডি করতে চাওয়া সেই আর্টিস্ট লোকটা? রুমেলা?

চোখে একবার হাত ঘষে ও। বাসু মুচকি হেসে বলে, 'তো ভেবে কী ঠিক করলে?'

মেয়েটার শান্ত ধীর গলা শোনা যায়, 'ভেবে দেখলাম জানেন... এই দুনিয়ার সব রাজা, জমিদার, অত্যাচারী শাসক, ফ্রাস্ট্রেটেড মিসোজিনিস্টদের আসলে একইরকম দেখতে হয়... আর তাদের একটাই ওষুধ...'

অঙ্কিতার অন্য হাতে ধরা কাস্তের কালো ফলাটার উপরে রাস্তার হলদে আলো ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সেটার দিকে চেয়ে বাসু হো হো করে হেসে ওঠে, 'খুন করবে তুমি আমাকে? ওই চাষার অস্ত্র দিয়ে? ও তিন মাস হল বসে আছে এখানে। এতদিনে ও কাস্তে ভোঁতা হয়ে গেছে...'

অঙ্কিতার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি খেলে যায়। তার একটা হাত বিদ্যুৎশিখার মতো উঠে এসে বাসুর চুলের মুটি খামচে ধরে। এই প্রথম, গনগনে আগুনের মতো গলায় বলে, 'আপনি জানেন না, কিন্তু আমার দাদু ছিল, আমি জানি। চাষি চাষ ছেড়ে দিক আর যাই করুক না কেন, কাস্তেতে শান দিতে ভোলে না...'

বাসুর মুখ থমথমে হয়ে যায়। কোনওরকমে বাধা দিতে যাচ্ছিল সে কিন্তু

তার আগেই ধারালো কাস্তের ফলা নেমে আসে তার গলার উপর। একবার, দু-বার, বারবার। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তের স্রোতে ভিজে যায় দামি গাড়ির মখমলি সিট। কিছুটা রক্ত গড়িয়ে আসে বাইরের রাস্তায়। প্রত্যেকটা কাস্তের কোপে অঙ্কিতার গলা দিয়ে এক অদ্ভুত উন্মাদনার শব্দ বেরিয়ে আসে। ও জানে না কার উপর নেমে আসছে কোপগুলো...

খানিকক্ষণ পর বাসুর আলগা দেহটা খসে পড়ে যায় গাড়ির বাইরে।

ভিখারিটা এতক্ষণ ছাউনির ঠিক বাইরেটায় বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিল সমস্ত ঘটনাটা। অঙ্কিতা কাস্তেটা ধরেই পিছিয়ে এসে বসে পড়ে তার পাশে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। সমস্ত গায়ে রক্তের ছিটে। বুক জুড়ে নেমে আসছে শান্তির ঢেউ। যেন অনেকদিনের লুকিয়ে রাখা একটা সমুদ্রস্রোত বালির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে দিচ্ছে এক ইট-কাঠ-পাথরের শহর। বহু বছর পরে এই প্রথম ওর শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে...

কয়েক সেকেন্ড ওর দিকে চেয়ে থাকে ভিখারিটা। তারপর দ্রুত উঠে পড়ে। একহাতেই তড়িঘড়ি বস্তাগুলো খুলতে খুলতে বলে, 'আমার আর এখানে থাকা হবেনি ম্যাডাম। পুলিশ আসবে, আপনাকে ধরবে। কিন্তু খুনের অস্তর খুঁজে পাবেনি... হেঁহেঁ...'

এতক্ষণে হুঁশ ফেরে অঙ্কিতার। অবাক হয়ে তাকায় লোকটার দিকে, নরম প্রশমিত গলায় বলে, 'কিন্তু কে আপনি?'

লোকটা আবার আগের মতোই হেঁহেঁ করে হাসে, 'সেইটে কি বড় কতা হইল ম্যাডাম?'

অঙ্কিতা হতবাক হয়ে দেখে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বস্তার চাদর খুলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফেলেছে লোকটা। সমস্তটা গুটিয়ে এক জায়গায় এনে একটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'বড় কথা হইল এই গোটা শহরটা একটা মস্ত বড় জন্তর। এই জন্তরে আপনাকে ঢুকতিই হবে, কোনও ছাড়ন নেই...' ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে লোকটা, 'কিন্তু জন্তর যদি বিগড়ে যায়, যদি জন্তর মানুষ মারে, তাহলে সে যত বড়ই হোক, সেইটাকেই ফলানো ধানের মতো উপড়ি ফেলতি হবে। যে যাই বলুক ম্যাডাম, দুনিয়ায় এমন

কোন জন্তর নেই যার দাম জ্যান্ত মানুষের থিকে বেশি। আর...'

অঙ্কিতা কিছু জিজ্ঞেস করে না। উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে স্পর্শ করে একবার। সে এতক্ষণে তার মালপত্র কাঁধে ফেলে হাঁটতে শুরু করেছে। বাকি কথাটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে আসতে থাকে, 'আর মনে রাখবেন ম্যাডাম। সব মানুষই হল চাষার বংশধর। আর চাষারা কাস্তেয় শান দিতি ভোলে না... আপনি ভুলবেননি তো ম্যাডাম?'

'না, ভুলব না...' স্থবির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই দু-পাশে মাথা নাড়ে অঙ্কিতা। লোকটার মিলিয়ে আসা শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ওর রক্তের ছোপ লাগা ঠোঁটের কোনায় একটা পুরনো মন্ত্র ফুটে ওঠে, 'জান কবুল আর মান কবুল...'

প্রফেট

প্রফেট হবার আগেই জগদীশ পালিয়ে গেছিল।

একদিন রাতে আমাকে বা আর কাউকে না জানিয়েই গ্রাম ছেড়েছিল অন্ধকারে গা বাঁচিয়ে। ওর মা-বাপ ততদিনে আর কেউই বেঁচে নেই। ফলে সে কোথায় পালিয়েছে কী বৃত্তান্ত সেই নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায়নি। কিন্তু আমি জানতাম, আর কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে পারলেই ও প্রফেট হতে পারত।

তারপর এই বাইশ বছর তার আর কোনও খোঁজ পাইনি আমি। সত্যি বলতে জগদীশের কথা সারাজীবনে আর কোনওদিন মনেও পড়ত না আমার, যদি না মেয়ের জন্য অতগুলো ভারী খেলনা কিনতাম।

আমরা যারা ছোট থেকে গুছিয়ে আজগুবি গল্প বলতে পারা মা পেয়েছি, তাদের রূপকথার ঘোর ভাঙতে দেরি হয় ঢের। ততদিনে আমাদের মা গত হয়েছেন। অন্য কোথাও রূপকথার খোঁজ করতে করতে অবশেষে হতক্লান্ত আমরা মাতৃবিয়োগের যন্ত্রণার কাছে হাঁটু মুড়ে বসি। তার কাছে ভিক্ষা চাই আর একটি রূপকথার। গলা ফেড়ে তাকে জিজ্ঞেস করি, 'তাহলে কি আমাদের ভিতরেই বেঁচে আছে মা?'

কিন্তু আমরা কবেই বা মায়ের মতো করে গল্প বলতে পেরেছি নিজেদের? নিজেদের বুকে মুখ গুঁজে নিজেরা কবেই বা নিরাপত্তার আশ্রয় পেয়েছি? পেয়েছি শুধু ভয়...

লোকে বলে মা মারা যাওয়ার পর থেকেই নাকি আমার মাথাটা খারাপ

হয়ে গেছিল। বোকাগুলো জানে না, এ দুনিয়ার সব লোকেরই মা মারা যাওয়ার পর থেকে মাথা খারাপ হয়ে যায়। মাতৃহীন গোটা জীবনটাই কেবল একটা অস্থিরতা আর অস্বস্তি!

বরং আমি মা-কে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম নিজের মধ্যে। মা বলেছিল আমাদের গ্রামের এককোণ দিয়ে বয়ে যাওয়া অম্বি নদীর নিচে নাকি এক তিমি মাছের হাঁয়ের মতো পুরনো কুয়ো আছে, একদিন সেখান থেকে এক রাজকন্যা বেরিয়ে আসবে। আরেকটু বড় হয়ে ভেবেছি একদিন না একদিন বিদেশের বিজ্ঞানীরা অমৃত বলে কিছু একটা আবিষ্কার করবে। আমার বাবা-মা বেঁচে থাকবে আজীবন। আরেকটু বড় হতে ভেবেছি দেশে শ্রমিক বিপ্লব আসবে, সেই বিপ্লবের মিছিল থেকে হাতছানি দেবে লাল আবির মাখা স্বপ্নকুমারী, তার কপালে লাল আবির আর সিঁদুর মাখামাখি হবে আঙুলের স্পর্শে, নাহ্, এসব কিছুই হয়নি। এসব কিছু হবার আগেই জগদীশ প্রফেট না হয়ে পালিয়ে গেছিল।

শিলিগুড়ি থেকে ফিরছিলাম। শিয়ালদা স্টেশনে নামতেই কুলিগুলো ঘিরে ধরল, 'লাগেজ সো রুপিয়া বাবু, ডিকি তক উঠিয়ে দেব...'

ফালতু পয়সা খরচ আমার ধম্মে নেই। কিন্তু আমার মেয়ে অনিন্দিতার জন্য গুচ্ছের খেলনা কিনেছি। কাল সকালেই ফোন করে হুমকি দিয়েছিল সে, 'আমার জন্য ডোরেমন পুতুল আনবে কিন্তু বাপি, আর তাড়াতাড়ি আসবে, আই মিস ইউ...'

সেইসব খেলনাতেই ভারী হয়ে আছে সুটকেসটা। কিছুটা এগনোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে একটা কুলি আয়েস করে বসে সিগারেট টানছিল। তাকেই হাঁক পাড়লাম, 'এই কুলি, ট্যাক্সি অবধি কত নেবে?'

লোকটা আমার দিকে একবার উদাসীন দৃষ্টি বুলিয়ে বলল, 'দুটো লাগেস, দুশো টাকা!'

'চলো...'

লোকটার গলা শুনে বোঝা যায় তার পেটে শিক্ষাদীক্ষা আছে। চেহারাপাতিও

একেবারে কুলিসুলভ নয়। তামাটে চামড়া। সমস্ত গা ঘামে ভেজা। পরনে একটা লালচে স্যান্ডো গেঞ্জি। মাথায় পাগড়ি জাতীয় একটা কাপড় গোল করে জড়ানো।

লোকটা সুটকেসদুটো মাথার উপর তুলে নিল। তারপর সামনের দিকে হাঁটা শুরু করতে করতে বলল, 'আপনি ধীরে ধীরে আসুন। হারিয়ে ফেলবেন না।'

লোকটার কথা শুনে বোঝা যায় তার মাতৃভাষা বাংলা নয়। তবে বহু বছর এদেশে থেকে থেকে ভাষাটা রপ্ত হয়ে গেছে।

আমি তার পিছন পিছন যাচ্ছিলাম। খানিকদূর এগিয়ে যেতেই খেয়াল করলাম ব্যাপারটা। লোকটার স্যান্ডো গেঞ্জির ফাঁক গলে কাঁধের কাছে একটা উল্কি দেখা যাচ্ছে।

ঠিক এমন একটা উলকি বাইশ বছর আগে দেখেছি আমি। আমার প্রিয় বন্ধুর কাঁধে। অবশ্য দুটো মানুষ একই উলকি করে থাকতে পারে, কিন্তু এ লোকটার মুখটাও যেন চেনা চেনা লাগছে আমার। যেতে যেতেই তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা নাম কী তোমার?'

'জগদীশ যাদব স্যার...'

'বকুলপুর গ্রামে বাড়ি ছিল তোমার?'

কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। কথাটা শোনা মাত্র একটা অদ্ভুত কাজ করে ফেলল জগদীশ। লাগেজদুটো একরকম ছুঁড়েই মাটিতে নামিয়ে রাখল সে। তারপর আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল সামনের দিকে।

শিয়ালদা স্টেশনে তখন গিজগিজ করছে সদ্য ট্রেন থেকে নাম মানুষের ভিড়। প্রথমটা হকচকিয়ে গেছিলাম। হঠাৎ করে হল কী লোকটার?

পিছন পিছন দৌড়াব!

সে ক্ষমতা আমার ছিল না। তবে হঠাৎ করে সুটকেস ফেলে দৌড়াতে দেখে আশপাশের লোকজন ওকে পকেটমার বা ছিনতাইবাজ গোছের কিছু একটা ঠাওরে নিল। ভিড়ের মধ্যে থেকেই জনাদশেক লোক প্রায় ধাক্কা মেরে

প্ল্যাটফর্মের উপর ফেলে দিল জগদীশকে। মুহূর্ত কাটার আগেই সম্মিলিত জনতার কিল চড় লাথি এসে পড়ল ওর শরীরে। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল লোকটা।

'শালা পকেটমারি করিস, আজ দেখাচ্ছি মজা!'

'হার ছিনতাই করে ভেগেছে, মার শালাকে...'

'এই বিহারী মালগুলোর জন্যেই... হয় গাঁটিয়া ভাজে, নাহয় গাঁট কাটে!'

আমি কোনওরকমে ছুটে গিয়ে যখন তাদের নিরস্ত করলাম। ততক্ষণে ওর শরীরের উপর অফিসযাত্রীদের ফ্রাস্ট্রেশনের ঝড় বয়ে গেছে।

'আরে পকেটমার হবে কেন, ও আমার বন্ধু...'

'বন্ধু!' ভিড়ের মধ্যে হোমরাচোমরা গোছের একজন ভুরু তুলে তাকাল আমার দিকে, 'বন্ধু তো পালাচ্ছিল কেন?'

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, 'ক-টা টাকা ধার নিয়েছিল তো, তাই আমাকে দেখেই...'

'এইসব বিহারী ফিহারিদের ধার-বাকি দেন কেন? এ শালারা এরকমই।'

গোলগোল চোখ করে সামনে এগিয়ে গেল লোকটা। মারধরের চোটে ততক্ষণে জগদীশের নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। আমি একরকম ঘেঁটি ধরে তাকে তুলে শিয়ালদা স্টেশনেরই একটা বেঞ্চে নিয়ে এসে বসালাম। তার ঠোঁটের কোল বেয়ে সরু রক্তের ধারা নেমেছে। নিজের পেট চেপে ধরে হাঁসফাঁস করছে লোকটা।

'আর কতদিন পালিয়ে বেড়াবি জগু? সব ছেড়ে শেষে স্টেশনের কুলি!'

আমার কথাটা কানে গেল না লোকটার, তেমন হাঁপাতে হাপাতেই বলল, 'আমাকে দুশোটা টাকা দেবেন বাবু?'

'কী হবে তাতে?'

'মদ খাব...

পকেট থেকে শ'পাচেক টাকা বের করে ওর পকেটে গুঁজে দিলাম। মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'থাকিস কোথায় এখন?'

'স্টেশনের কাছেই একটা বস্তিতে...'

‘সংসার?’

দু-দিকে মাথা নাড়ায় জগদীশ, ‘করিনি।’

‘আমাকে দেখে পালালি কেন?’

জামার হাতায় ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মোছে জগদীশ, ‘এ দুনিয়ায় কারও সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখি না। যোগাযোগ রাখলেই শালা ক্যাচাল হয়... বিশেষ করে গ্রামের লোক চিনে ফেললেই ভয় লাগে...’

হাত বাড়িয়ে ওর ডানহাতটা নিজের হাতে তুলে নিই আমি। মোট বইতে বইতে কড়া পড়ে গেছে। নখের মাথাগুলোও প্রায় মিশে গেছে চামড়ার সঙ্গে। অথচ এই হাতেই...

‘তোর সেই ক্ষমতাটা...’

আমি কথা শেষ করার আগেই টেনে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয় জগদীশ, ‘ওসব আর পারি না। মদের টাকা দিয়েছেন, সুটকেস বয়ে দেব। চলুন...’

আমার বুকের ভেতর একটা পুরনো নদী বইতে বইতে যেন হঠাৎ করে স্থির হয়ে গেল। আমার ছেলেবেলার গ্রামের বন্ধু জগদীশ। আর কেউ না জানুক, আমি জানতাম, একদিন জগৎজোড়া প্রফেট হওয়ার সব মালমশলা যার মধ্যে মজুত ছিল সে আজ স্টেশনে মধ্যবিত্ত বাঙালির মোট বয়, আর রাত হলে দুশোটাকার বাংলা মদ খায়?

জগদীশ উঠতে যাচ্ছিল। ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম আমি, ‘চল আমার সঙ্গে...’

‘কোথায়?’

‘আমার বাড়ি, এতদিন পর দেখা হল, তোকে শিয়ালদা স্টেশনেই আমি ছেড়ে দেব ভেবেছিস? তাছাড়া সংসার করিসনি যখন দু-তিনটে দিন আমার বাড়িতে কাটিয়ে আসতে অসুবিধা কী তোর?’

অবশ্য জগদীশ যে সংসার করবে না সে আমি আগেই জানতাম। প্রফেটরা সংসার করে না। আমার মায়ের গল্প মিথ্যে হতে পারে না। ওই বিশেষ ক্ষমতাটা এখনও বয়ে চলেছে জগদীশের হাতের শিরায়। যে ক্ষমতার প্রথম পরিচয় পেয়েছিলাম আজ থেকে বাইশ বছর আগে, আমাদের স্কুলের মাঠে...

(২)

জগদীশের বাপ বিহারী হলেও ওর জন্ম বকুলপুরেই। ফলে ভোজপুরির থেকে বাংলার দিকেই একটু বেশি ঝুঁকেছিল ওর জিভটা। তিনবছর বয়সে ওর মা বসন্তে ভুগে মারা যায়। সেই থেকে বাপের কাছেই মানুষ। তারও শরীরটা ভালো যেত না। জগদীশ আর আমি স্কুলে হরিহর আত্মা ছিলাম। অন্য ছেলেপুলের দল বিশেষ একটা আমাদের সঙ্গে মিশত না।

তখন ক্লাস ইলেভেনের প্রায় শেষের দিক। সিদ্ধেশ্বরীর মাঠে স্কুলের টিফিনবেলায় বউ বসন্ত খেলতাম আমরা। আমি আর জগদীশ ছাড়া সেখানে আমাদের ক্লাসেরই আরও কিছু ছেলেপেলে ভিড় করত। জগু চিরকালই বউ হত।

ছোট থেকেই রোগে ভোগার ফলে খুব বেশি দৌড়াদৌড়ি করার মতো শারীরিক জোর তার ছিল না। তাছাড়া হাজার হোক জাতে বিহারী ছিল বলে ছেলেপিলের দল ওকে একটু আলাদা করেই রাখতে চাইত।

যে দিনের কথা বলছি সেদিনও জগদীশ বউ হয়েই মাঠের এক কোণে ইট পেতে বসেছিল। আর সেদিনই আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম জগদীশ বড় হয়ে একদিন প্রফেট হবে।

স্কুলে আমি আর অরূপ বরাবর হয় ফার্স্ট নইলে সেকেন্ড হতাম। বছর বছর একটা চাপা রেষারেষি চলত আমাদের মধ্যে। দু-জনেই দু-জনকে ভেতরে ভেতরে সহ্য করতে পারতাম না।

যেদিনের কথা হচ্ছে তার দিনকয়েক আগেই রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমি হয়েছি ফার্স্ট আর অরূপ সেকেন্ডের বদলে বেশ খানিকটা নিচে নেমে গেছে। ফলে সেদিন রাগটা একটু বেশি চাগাড় দিয়েছিল তার। আমার দম কাটেনি, তা সত্ত্বেও দু-হাতে আমায় চেপে ধরে একরকম ঠেলেই মাটির উপর ফেলে দিল অরূপ। মাথাটা ঢুকে গেল মাটিতে পড়ে থাকা একটা পাথরে। আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠল। মাথাটা ঝনঝন করল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। মুহূর্তে পৃথিবীটা নিভে এল চোখের সামনে।

চোখ যখন খুললাম তখন আশপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বোধহয় আমি মরে-টরে গেছি ভেবেই ভয়ে বন্ধুবান্ধবরা সব ছুটে পালিয়ে গেছে।

মাথায় অসহ্য ব্যথা, তা সত্ত্বেও কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে দেখলাম একমাত্র জগদীশ আমার ঠিক পাশটায় চুপ করে বসে আছে। টিফিনবেলা, দুপুরের রোদ নামছে ধুলো মেখে। মাঠের শেষ প্রান্তে উঁচু গাছপালা দুপুরের হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে মন দিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করছে সে।

আমি একবার মাথার পেছনে হাত বুলিয়ে দেখলাম রক্ত বেরোচ্ছে কি না। নাঃ বেরোচ্ছে না। কিন্তু এত অসহ্য যন্ত্রণা যে মনে হচ্ছে পরমুহূর্তে মাথা ছিঁড়ে যাবে। উঠে বসতে গিয়েও যন্ত্রণায় কঁকিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম মাঠের উপরে।

আমার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জগু বলল, 'টিফিনবেলা শেষ হয়ে আসছে রে সোমু, চ, স্কুলে ফিরতে হবে...'

আমি ধুঁকতে ধুঁকতেই ঘাড় নাড়লাম, 'আমি মনে হয় আর উঠতে পারব না রে জগু। আমার মাথাটা...'

'ব্যথা করছে?'

'ভীষণ! মনে হয় ভেতরে ভেতরে রক্ত বেরিয়ে...'

জগদীশকে একটু বিরক্ত দেখায়। আমাকে এই আহত অবস্থায় ফেলে সে পালাতে পারেনি, আবার এতক্ষণ বসে থাকার পরেও যে আমি উঠে আবার স্কুলে যেতে পারব না সেটাও হিসেবের মধ্যে রাখেনি।

'তাহলে কী করব? স্কুলে গিয়ে বলি?'

'না না। গার্জেন কল হবে...' আমি দু-হাতে মাথা চেপে ধরেই বলি, 'বাড়িতে গেলে ব্যথার উপরেই আবার পিটিয়ে সোজা করে দেবে...'

'তাহলে উপায় কী?'

আমি হাত নাড়াই, 'তুই চলে যা, আমি এখানে একটু শুয়ে থাকি...'

খানিকটা বিরক্ত হয়েই জগদীশ চলে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে যায়, তারপর হুট করে আমার হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তুই আমায় কথা দে সোমু। আজকের ঘটনাটা তুই কাউকে বলবি না...'

'আমি না বললেই বা কী? ওরা চারজন তো জানে। ওরা বলে বেড়াবে।'

দু-দিকে মাথা নাড়ায় জগু, 'ওটার কথা বলছি না, এখন যেটা করব সেটা...'

কথাটা বলে হঠাৎই জগদীশের হাতটা উঠে আসে আমার মাথায়। খুব আলতো করে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে সে। জ্বর হলে যেমন মা হাত বুলিয়ে দেয়, কিংবা ভালো রেজাল্ট করে বাড়ি ফিরলে যেভাবে পিঠে হাত রাখে বাবা। ঠিক তেমন করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে জগদীশ।

প্রথম প্রথম ভারি অস্বস্তি লাগে আমার। বয়েজ স্কুলের মাঠে শুয়ে থাকা একটা ছেলের কপালে আর একটা ছেলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে—এ জিনিস অন্য কেউ দেখতে পেলে অপদস্থ হওয়ার আর সীমা থাকবে না। হাত দিয়ে ঠেলে জগুর হাতটা সরিয়ে দিতে যাব, ঠিক সেই সময়ে, থেমে গেলাম। সেই অস্বস্তির মধ্যেই খেয়াল হল—আমার মাথার ব্যথাটা কমে আসছে ধীরে ধীরে। সঙ্গে গা বমিবমি ভাবটাও। ব্যথা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগেও যন্ত্রণায় আমার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি বমি হয়ে যাবে। জগদীশ হাতের স্পর্শে সেই যন্ত্রণা যেন কপালে লেগে থাকা ছাইয়ের টিপের মতো মুছে ফেলছে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। মায়ের কথা মনে পড়ে গেছিল সেদিন। স্কুলে ক্লাস থ্রির পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে একটা বই পেয়েছিলাম—প্রভু যিশুর জীবন। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাকে কোলের কাছে শুইয়ে সেই বইটা পড়ে শোনাত মা। তাতে লেখা ছিল প্রভু যিশুরও নাকি এমন একটা ক্ষমতা ছিল, কেবলমাত্র মাথায় হাতের স্পর্শ করে মানুষের রোগ-জরা-যন্ত্রণা সারিয়ে দিতে পারতেন তিনি। তবে কি আমার ক্লাসের বন্ধু রোগাপটকা বিহারী জগদীশের সেই একই ক্ষমতা আছে? সেও কি তবে...

কয়েকে সেকেন্ড পরেই মাঠের উপর উঠে বসলাম। ততক্ষণে যন্ত্রণার বদলে আমার শরীরে জেগে উঠেছে অপার বিস্ময়ের অনুভূতি। জগদীশের মাথার পেছনে যেন রোদ পড়ছে না। একটা বলয় ঢেকে রয়েছে ওকে। ওর কপালে

জমা হয়েছে বিন্দুবিন্দু ঘাম, ঠিক যিশু খ্রিস্টের মুকুটের মতো। গায়ের থেকে এক সাইজ বড় ঢিলে পোশাক, মাথার উসকোখুসখো চুল, লম্বাটে দড়ির মতো রোগা চেহারা...

সেদিন এতটাই হকচকিয়ে গেছিলাম যে তাকে আর আলাদা করে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে মাকে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখলাম পাড়ার লোক জড়ো হয়েছে আমাদের দরজায়। অনেকদিন থেকেই বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না। রাত হলেই ধুম জ্বর। সেই জ্বর সেদিন দুপুরেই চিরকালের মতো সেরে গেছে।

মাকে আর জিজ্ঞেস করা হয়নি জগদীশ সত্যি যিশু খ্রিস্টের মতো প্রফেট কি না। আমি নিজে আরও প্রমাণ পেয়েছিলাম বেশ কিছুদিন পরে। হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে আরও অনেকের কাছে প্রমাণও করতে পারতাম। কিন্তু তার আগেই পালিয়ে গেল জগদীশ...

(৩)

'লোকটা কে গো বাবা?' অনিন্দিতার মনের ভেতর যে প্রশ্নটা গত দিন দুয়েক ধরে দলা পাকাচ্ছে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। ছোট থেকেই দেখেছি জগদীশের ভিতরে এমন কিছু আছে যাতে বাচ্চারা সহজেই ওর বন্ধু হয়ে যায়। বিশেষ করে অনিন্দিতার মতো মিশুকে বাচ্চার তো ওকে পেলে কথাই নেই।

'আমার ছোটবেলার বন্ধু। তোর সঙ্গেও তো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে...' আমি ওর কপালে হাত রেখে বলেছি। ও নতুন খেলনাগুলো বিছানার উপরে সাজাতে সাজাতে উপরে নিচে মাথা নেড়েছে, 'কাকুটা খুব ভালো বাবা। আমাকে কত গল্প শুনিয়েছে...'

'তাই নাকি? কীসের গল্প বলেছে তোকে?'

প্রশ্ন শুনে অনিন্দিতার চোখ গোলগোল হয়ে যায়, 'জানো বাবা, কাকু অনেক ভূতের গল্প জানে!'

'সে কী! কীরকম ভূত?'

অনিন্দিতা মনে মনে হিসেব করে গুছিয়ে নিয়ে আঙুলের কড় গুনে বলে, ‘বেম্মদত্যি, মেছো, বাঁশভূত, কানাভুলো... আর...’ একটানা কথাগুলো বলতে গিয়ে কাশির দমক উঠে আসে অনিন্দিতার গলা বেয়ে। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে আসে মুখ দিয়ে।

কাবেরি ছুটে এসে ওর মাথাটা বুকে টেনে নেয়, ‘তোমাকে বারণ করেছি না একসঙ্গে অতগুলো কথা বলতে?’

রক্তের ছোপ লাগে আমার বছর এগারোর বাচ্চা মেয়েটার গালে। রুমালটা লাল হয়ে যায়। নিজের বুকে হাত রেখে কোনওরকমে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করে সে। আমি ওকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিই।

‘কোথায় ব্যথা হচ্ছে মা?’ ওর প্রায় বন্ধ হয়ে আসা চোখের দিকে চেয়ে আমি প্রশ্ন করি।

‘আমার বুকে খুব ব্যথা করে বাবা।’ ওর গলা থেকে ক্ষীণ শব্দ বেরোয়।

কাবেরি ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে, শাড়ির খুঁটে চোখের জল মোছে। আমি বিছানায় ওর পাশে বসতে বসতে বলি, ‘তোকে বলেছিলাম না, বড় কিছু করতে গেলে কষ্ট সহ্য করতে হয়?’

‘স্নো হোয়াইটের মতো?’ যন্ত্রণাক্লিষ্ট গলাতেই প্রশ্ন করে অনিন্দিতা।

‘একদম, স্নো হোয়াইটের মতো...’

‘কিন্তু আমি স্নো হোয়াইট হব না বাবা...’

‘সেকি! কেন হবি না?’

‘ও ওর বাবাকে মাকে ভালোবাসত না। আমি তো তোমাদেরকে খুব ভালোবাসি বাবা...’

কাবেরি চোখ থেকে জল মোছে। ছোট থেকেই মেয়েটা আমার ন্যাওটা। বাবা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই চেনে না সে। কাজের সূত্রে দূরে কোথাও গেলে খানিকটা ওর জন্যেই বেশিদিন থাকতে পারি না আমি। আমাকে বেশিক্ষণ না দেখলেই কান্নাকাটি শুরু করে। কান্নাকাটি থেকে শুরু হয় কাশি, সেখান থেকে রক্তবমি।

‘তুমি এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো তো, সেই কখন উঠেছ ঘুম থেকে...’

ওর মা কপালে হাত বুলাতে বুলাতেই বলে। অনিন্দিতার চোখে ধীরে ধীরে বুজে আসে।

আমাদের একতলার ঘরটা ফাঁকাই থাকে। গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহার করি আমরা। আপাতত দিনতিনেক সেখানেই রয়েছে জগদীশ। অনিন্দিতা রাতে একরকম জেদ করেই আমাদের কাছে শোয় না। তিনতলায় ওর সাজানো গোছানো একটা ঘর রয়েছে। সেখানেই থাকে সারাদিন। আমরা রাতটুকুনি দোতলায় থাকি। বাকি দিনটা ওর সঙ্গেই কাটাই।

যে তিনদিন জগদীশ এখানে এসে রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ সময়টাই ও কাটিয়েছে অনিন্দিতার ঘরে। অনিও সুস্থ থাকলে ওকে ছাড়তে চায়নি।

'তুমি সত্যি কষ্ট সারিয়ে দিতে পারো?' জগদীশের দিকে তাকিয়ে অবুঝ গলায় প্রশ্ন করেছে অনিন্দিতা।

বিমর্ষ মাথা নেড়েছে জগদীশ, 'আমি পারি না রে খুকি, আগে পারতাম...'

'কেন পারো না?'

জগদীশ হেসে উত্তর দিয়েছে, 'তুমি ছোটবেলায় যা পারতে এখনও কি আর তাই পারো খুকি? আগে তো স্কুলে যেতে, এখন আর যাও?'

মুহূর্তে পুতুলের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে উত্তর দিয়েছে অনিন্দিতা, 'বাবা বলেছে আমার শরীর ঠিক হয়ে গেলেই আমি স্কুলে যাব। তার মানে তুমিও আবার পারবে আমাকে সারিয়ে দিতে?'

জগদীশ উত্তর দেয়নি। কথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। কখনও ওর আঁকার খাতায় ছবি এঁকে দিয়েছে, সেই ছবির নিচে নম্বর দিয়েছে অনি, কখনও আবার রসিয়ে রসিয়ে বলেছে ওর বাবার ছেলেবেলার গল্প। কবে ওর বাপ কান ধরে স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়েছিল, কবে বাড়িতে মার খাবার ভয়ে পুকুরপাড়ে কচুবনের ভিতর লুকিয়েছিল, সব গল্প। শুনতে শুনতে অনিন্দিতা কখনও খিলখিল করে হেসেছে। কখনও শরীরের সব জোর একত্র করে জগদীশের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়েছে। আবার কখনও ক্লান্ত হয়ে ওর হাতের উপরে মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাড়ি ফিরে ওর বন্ধ চোখের পাতার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে অনিন্দিতার শরীর থেকে যাবতীয় যন্ত্রণা যেন ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে জগদীশ। সত্যি কি ক্ষমতাটা হারিয়ে গেছে ওর? চেষ্টা করলে কি পারবে না আর একবারও?

নাকি ও নিজের জন্য ভয় পাচ্ছে? প্রফেটরা কি নিজেদের কথা ভাবে?

(৪)

গানু যাদবের ছেলে জগদীশের যে একটা কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে সে ব্যাপারটা কাউকে জানাতে আমাকে মানা করেছিল জগদীশ। কিন্তু খানিকটা আমারই কল্যাণে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের লোকমুখে। কেন জানবে না? এমন একটা বিরল ক্ষমতা কি ঘরে ঘরে হয়? প্রথমে স্কুলের ছেলেদের মুখে, তারপর বাড়ি বাড়ি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে অবশ্য কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি।

স্কুলেই একদিন তাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ রে, তুই সেদিন যেটা করলি সেটা শিখলি কোথা থেকে?'

দু-দিকে মাথা নাড়ে জগু, 'শিখিনি, আমি জানি না কী করে হয়...'

'ছোট থেকেই পারিস?'

'উঁহু, এই মাসখানেক হল... একটা স্বপ্ন দেখি বারবার...'

'কী স্বপ্ন?'

ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভেবে জগু বলে, 'মনে হয় আকাশ থেকে কে যেন নেমে এসে আমায় কী একটা দিয়ে আবার আকাশের দিকে উড়ে চলে যাচ্ছে। কী দিয়েছে সেটা দেখার আগেই ঘুম ভেঙে যায়...'

আমার সেই মায়ের বলা যিশুর গল্পটার কথা মনে পড়ে যায়। যিশুকেও তো এমন করে নির্দেশ পাঠাতেন ভগবান। কে বলতে পারে সেটা স্বপ্ন ছিল না?

জগদীশকে নিয়ে গ্রামে সত্যিকারের হইচই যখন পড়ল তখন আমরা স্কুল পেরিয়ে কলেজে উঠেছি। পাশের গ্রাম থেকে ঝেঁটিয়ে লোকজন দেখতে এল

তাকে। তারা সবাই লোকমুখে শুনেছে বকুলপুরের একটা বাচ্চা সদ্য ইস্কুল পাশ করা ছেলে, নাকি মানুষের মাথায় হাত বুলিয়ে রোগ সারিয়ে দিচ্ছে। সে গুজবের ফয়সালা হতেই সভা বসল।

জগদীশের বাবা গানু যাদব থেকেও নেই। ঘর থেকেই বেরোয় না সে। এদিকে সে নিজে মুখচোরা গোছের। ততদিনে আমি গ্রামের একটা হোমরাচোমরা গোছের হয়ে উঠেছি।

আমারই তত্ত্বাবধানে সভায় জোগাড় করে আনা রোগে ভোগা গ্রামবাসীদের মাথায় হাত বোলাল জগদীশ। কিন্তু লাভ হল না তাতে কিছু। সুস্থ হওয়া কিংবা যন্ত্রণা লাঘবের সাম্যন্য চিহ্নও দেখা গেল না তাদের শরীরে। গুজব ছড়ানোর জন্য গ্রামের মাতব্বরদের দু-কথা শুনিয়ে রোগীর বাড়ির লোক ফিরে গেল।

সেদিন রাতে জগুদের বাড়ির ছাদে বসেছিলাম আমরা। আমরা দু-জন। আমার কাঁধ ঝুঁকে পড়েছিল। ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছিলাম। আকাশে ঝুলে থাকা চাঁদের দিকে উড়ে যাচ্ছিল সেই ধোঁয়া। মায়ের কোলে শুয়ে শোনা সেই গল্পটার কথা, বইতে আঁকা যিশু খ্রিস্টের ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বারবার। তবে কি সত্যি জগদীশের ক্ষমতাটা কাকতালীয়? সিগারেটের ধোঁয়াটা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে? ছড়িয়ে পড়ছে? নাকি বিশেষ কোনও গন্তব্য আছে তাদের?

'তোর জন্য এতগুলো লোকের কাছে নাককাটা গেল আমার।' জগদীশ ছাদের মেঝেতে পা ঘষতে ঘষতে বলল। মুখে স্পষ্টতই বিরক্তির ছাপ ওর।

'ওরা আজ বিশ্বাস করেনি, কাল করবে।'

'তুই কী করে জানলি?'

'সব প্রফেটদের সঙ্গে এইটাই হয়। প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অপমান অপদস্থ করে। তারপর ধীরে ধীরে একটা মিরাকেল চোখের সামনে দেখে...'

আমার কথা শুনে এবার কিছুটা রেগেই যায় জগদীশ, 'তুই এই এক ধানাইপানাই এবার বন্ধ কর তো। আমি ওসব কিছু নই...'

‘নোস? সিদ্ধেশ্বরীর মাঠের কথা ভুলে গেলি? আমাকে, বিতনুকে, ঘেঁটুদের আধমরা কুকুরটাকে, স্কুলের দারোয়ানের বউটাকে তুই শুধু মাথায় হাত বুলিয়ে সারিয়েছিস এটা অস্বীকার করতে পারবি?’

কথাগুলো বলতে গিয়ে গলা আটকে যায় আমার। একটা সরু বিদ্যুতের রেখা মাথার ভিতর খেলে যায়। একটু আগে যে নামগুলো আমি বলেছি তাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। চেয়ার থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় নীচ থেকে একটা চাপা চিৎকার ভেসে এল।

এই ক-দিনে জগুর বাপের শরীরটা আরও খারাপ হয়েছে। মনে হয় আর বেশিদিন বাঁচার সম্ভবনা নেই ভদ্রলোকের। ভেসে আসা আওয়াজটা শুনে মনে হল আজ রাতটুকু কোনওরকমে চলে গেলেই রক্ষে।

দু-জনে মিলে নিচে নেমে দেখলাম অবস্থাও সঙিন। শরীরের মাঝের অংশ থেকে বিছানার বাইরে ঝুলছে। কোমর থেকে উঠে আসা যন্ত্রণায় থেকে থেকে থরথর করে কেঁপে উঠছে শরীরটা। মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ছে টপটপিয়ে। বুঝলাম বুকের ভিতর আটকা পড়া প্রাণটা শরীর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে।

জগু এগিয়ে যায় বাপের দিকে। দু-জনে মিলে ধরাধরি করে শরীরটা খাটের উপরে তুলে দিই। জগু বাপের পাশে বসে পড়ে আসতে আসতে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে তার মাথায়। বুড়োর গোঙানি একটু একটু করে কমে আসতে থাকে তাতে। বেশ বোঝা যায় ম্যাজিকের মতো শরীরের ভিতর থেকে রোগ সরে যাচ্ছে তার। আমি আর অবাক হই না। এই ক-দিনে এ জিনিস দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

‘তুই এখন আয় বরং...’ আমার দিকে চেয়ে বলে জগু, ‘বাবা আজ রাতটা চলে যাবে...’

‘বাপের উপর কাজ করে, কিন্তু অচেনা লোকের উপর কাজ করে না...’ আমি মাটির দিকে চেয়ে বিড়বিড় করি, ‘তুই মানেটা বুঝতে পারছিস?’

‘পারছি না, তুই এখন আয় সোমু। এইসব নিয়ে আমি আর...’ বিরক্ত হয়ে আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দেয় জগু।

'শুধু একটা মিরাকেল ঘটাতে হবে...' আমার চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 'তুই যাদের ভালো করে চিনিস, যাদের ভালোবাসিস শুধু তাদের উপর কাজ করে তোর ম্যাজিক... একটা মিরাকেল ঘটাতে পারলেই...'

এতক্ষণে ছেলেটার রাগ আর বিরক্তি সপ্তমে উঠেছে মনে হয়। কপালের শিরা দপদপিয়ে ওঠে। হঠাৎই আমার দিকে আক্রমণাত্মকভাবে এগিয়ে আসে জগু, আমার জামার কলার খামচে ধরে সে, 'অনেকদিন থেকে এইসব নউটাংকি সহ্য করছি। লোকে ঠিকই বলে, মা মরে যাওয়ার পর থেকেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তোর। একদিন স্কুলের মাঠে কী বাঁচিয়েছিলাম বলে পেয়ে বসেছিস, না? তুই যা বলবি তাই করতে হবে আমাকে?'

'হ্যাঁ করতে হবে...' আমি ধাক্কা মারি ওকে, 'দুনিয়ায় আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে, তারা কেউ এই ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। তুই জন্মেছিস, তার একটা কারণ থাকবে না?'

'থাকলে থাকবে, আমার কারও বাঁচা-মরায় কিছু যায়-আসে না।'

'তোর মুখে এই কথা মানায় না...' আমি ভর্ৎসনা করি তাকে।

আমার কাঁধে এবার সজোরে ধাক্কা মারে সে, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা তুই এখানে থেকে... তোর কোনও কথা আমি শুনব না...'

'শালা স্বার্থপর কোথাকার... দুনিয়ায় এত মানুষের এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত রোগ। তোর হাতে সবাইকে ভালো করে দেওয়ার ক্ষমতা আর তোর কিছু যায়-আসে না, না?' কথাগুলো একদলা থুতুর মতো ধেয়ে যায় ওর দিকে।

'আর আমার? আমার কষ্টটার কী হবে?' কথাটা যেন বলতে চায়নি জগদীশ। ঝগড়ার মুখে একরকম জেদের বশেই বলে ফেলেছে সে।

'তোর কষ্ট বলতে? তোর আবার কীসের...'

'প্রফেট না? খুব প্রফেট সাজানোর শখ হয়েছিল আমাকে? দেখ এবার...'

কথাটা শেষ না করেই ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দেয় জগদীশ। তারপর গায়ের জামাটা খুলে ফেলে একটানে। জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় ঘরের এককোণে। তারপর বন্য পশুর মতো ডুকরে ওঠে।

আমার চোখ ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে ওর বুকের উপরে। জগদীশের সমস্ত শরীর জুড়ে অসংখ্য কাটাকুটি দাগ। যেন ধারালো ছুরি কিংবা কাঁটা লাগানো মুগুর দিয়ে কেউ বারবার ওর বুক ক্ষতবিক্ষত করেছে। দাগগুলোর কয়েকটা পুরনো, কয়েকটা অপেক্ষাকৃত নতুন। একটা থেকে এখনও রক্তও গড়িয়ে পড়ছে। যেন এইমাত্র কেউ ব্লেড চালিয়েছে তার বুকের মাঝবরাবর।

'কী... এগুলো কী করে...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে গর্জন করে ওঠে, 'কারও যন্ত্রণা মুছে দিতে পারি না আমি সোমু। কেবল নিজের শরীরে নিয়ে নিতে পারি... যতবার কারও রোগ সারিয়েছি, ততবার সেই যন্ত্রণা আমাকে শেষ করে দিয়ে গেছে... বাড়ি ফিরে... বাড়ি ফিরে আমি...'

বাকি কথাগুলো বেরয় না ওর গলা দিয়ে। যন্ত্রণা মেশানো কান্নায় ওর গলা বুজে আসে। শরীরের শক্তি যেন কমে আসছে ওর। ধীরে ধীরে মাটির উপরে বসে পড়ে ও।

ওর বাপের বিছানার পাশে পড়ে থাকা তুলো আর ওষুধ দিয়েই বুকের ক্ষত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করি আমি। ছুঁয়ে দেখি ওর বাকি কালচে হয়ে যাওয়া দাগগুলো। কোনওটা গভীর, আবার কোনওটা কেবল চামড়ার উপর বারবার আঁচড়ের দাগ। সেগুলো স্পর্শ করতেই আমার শরীর কেঁপে ওঠে। ঈশ্বরের হাতের স্পর্শ! স্যালভেশন!

বিড়বিড় করি আমি, 'মার্ক ১০:৪৫, For even the Son of Man did not come to be served–but to serve–and to give his life as a ransom for many.' কে বলেছে তুই প্রফেট নোস জগু? নিজেকে এতটা কষ্ট দিয়ে তুই এতগুলো মানুষের যন্ত্রণা...'

'আমি পারব না, আমি পারব না আর...' একটা লাথি মেরে আমাকে ঘরের উল্টো দিকে ছিটকে ফেলে দেয় দুবলা ছেলেটা। কোমরে চোট লাগে আমার। তাও সরীসৃপের মতো হাতে ভর দিয়ে তার কাছে এগিয়ে যাই আমি। আবার একটা লাথি ছিটকে আসে আমার দিকে, 'আমি পারব না আমি পারব

না, তুই একটা পাগল সোমু, তোর মা মরে যাওয়ার পর থেকে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে...'

আমি বিকারগ্রস্তের মতো ওর পা জড়িয়ে ধরি, 'মানুষের খুব কষ্ট রে জগু। তুই বাঁচা ওদের, নিজের বুকে টেনে নে সবটা... তোকে সবাই মনে রাখবে, তুই এই ঘরে এই বুড়োটার সঙ্গে ধুঁকতে ধুঁকতে...'

আমার মুখে আরও কয়েকটা লাথি কশায় জগু। আমার রক্তাক্ত ঠোঁট তখনও বলে চলেছে, 'শুধু একটা মিরাকেল... সবার সামনে একবার একটা মিরাকেল...'

আমার ধারণা ভুল ছিল। সেদিন রাত কাবার হবার আগেই জগুর বাপ মারা যায়। ঠান্ডা দেহ পরদিন সকালে আমরা গ্রামের কয়েকটা ছেলে মিলে দাহ করি। জগু ওর বাপের মুখে আগুন দিতে পারেনি। কারণ সে রাতের পর ওকে আর বকুলপুরে দেখা যায়নি।

প্রফেট হবার আগেই জগু কোথায় যেন পালিয়ে গেছিল।

(৫)

রাত দশটা বেজেছে। মোটামুটি এর মধ্যেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ি আমরা। একটু আগে তিনতলার ঘরে অনিন্দিতাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি আমি। নিচে চলে আসার আগে আমার হাত জড়িয়ে ধরেছে ও, নরম গলায় বলেছে, 'আমাকে একবার তোমাদের গ্রাম দেখাতে নিয়ে যাবে বাপি?'

আমি হেসে উত্তর দিয়েছি, 'কেন নিয়ে যাব না? কিন্তু গ্রাম দেখার এত আগ্রহ কেন? জগদীশকাকুর গল্প শুনে?'

হেসে ঘাড় নাড়ায় ফুলের মতো মেয়েটা, 'জগদীশকাকু তোমার সব সিক্রেট বলে দিয়েছে আমাকে, সব...'

আমার মুখে অজান্তেই হাসি খেলে যায়, 'তাই নাকি? কীরকম সিক্রেট?'

'এই যে তুমি ছেলেবেলায় মায়ের জন্য মন কেমন করলে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে।'

‘ধুর, মিথ্যে বলছে, আমি কখনও কাঁদি?’

‘কে বলেছে কাঁদ না? আমি নিজে দেখেছি। কাল রাতে ছাদের কোণে বসে কাঁদছিলে যে, ভেবেছিলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তাই না?’

আমি মুখ সরিয়ে নিই। অনিন্দিতা আমার কবজির কাছটা চেপে ধরে, ‘তোমার কষ্ট হয় কেন বাপি? আমার জন্য?’

‘তোর জন্য কষ্ট হবে কেন?’

‘এই যে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না, আমাকে তখন মিস করবে ভেবে...’

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি আমি। ধমকের গলায় বলেছি, ‘তোকে এসব কথা কে বলেছে? খুব পেকেছিস না?’

অনিন্দিতা আর কিছু বলেনি। ও তেমন করে কিছু বলেই না কোনওদিন। শুধু চুপ করে যায়। তখন ওর চোখ কথা বলে। ওর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা আলগা হাসিটা কথা বলে। সেদিকে আজ আমি তাকাতে পারিনি। নেমে এসেছি নিচে।

‘চেনা নেই, জানা নেই, খামোখা লোকটাকে বাড়িতে এনে রেখেছ...’ বালিশে ওয়ার গলাতে গলাতে বলল কাবেরি। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলি, ‘চিনি না কে বলেছে? জগু আর যাই হোক, ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া...’

‘তাছাড়া কী?’

‘আমাদের মেয়েকে বাঁচাতে হলে একমাত্র ওই পারবে কাবেরি... আর সব কিছু তো চেষ্টা করে দেখলাম...’

কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর আসে না। কাবেরি পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে, ‘বিয়ের আগেই শুনেছিলাম আমার শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর থেকেই তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছিল। আজ এত বছর পরে বুঝতে পারছি...’

ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিই আমি, ‘পাগলামো মনে হচ্ছে তোমার? আমি নিজের চোখে ওকে ওইসব করতে দেখেছি। শুধু আমি কেন, গ্রামের আরও অনেকে দেখেছে। ও নিজের উপর একটু বিশ্বাস রাখতে পারলে, আর একটু যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলেই এতদিনে...’

'বেশ, সব মেনে নিলাম। কিন্তু আজ এত বছর পরেও সে ক্ষমতা ওর আছে তাই বা তুমি জানলে কেমন করে?'

'আছে, আছে, আমি জানি। নইলে ও কেন সংসার করল না বলতে পারো? সামান্য একটা কুলিগিরি করে জীবন কাটাচ্ছে কেন বলতে পারো?'

'কেন?'

'কারণ ও আর যন্ত্রণা পেতে চায় না। ওর ভিতরে একটা নরম মন আছে। ও ভালোবাসে, এমন কেউ কষ্ট পেলে ও সহ্য করতে পারে না। তাই সংসার ধর্ম করতে চায়নি...'

'সেইজন্য তুমি ভেবেছ তোমার মেয়েকে ভালোবেসে ফেলে ওর রোগটা সারিয়ে দেবে আর নিজে মরবে?'

'প্রফেটরা মরে না কাবেরি। রোগ ওদের শেষ করতে পারে না। তুমি দেখো ও ঠিক আমাদের মেয়েকে...'

আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার পাশ ফিরে শোয় কাবেরি, 'ডাক্তার বলেছে আর কয়েকটা মাস। মনের জোর দরকার আমাদের অনেকটা। তুমি আমাকে আর একবার যন্ত্রণা দিও না গো...'

ঘড়ির কাঁটার টিকটিক শব্দ ভেসে আসে। বাইরের আকাশে চাঁদ জেগে আছে আজ। অনির খেলনা রাতবাতিটার মতো দেখাচ্ছে আজ চাঁদটাকে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয় দূর থেকে একটা পরিচিত সুর ভেসে আসছে। গ্রামে থাকতে শুনেছিলাম কি? আমার মা গুনগুন করত বোধহয় এই সুরটা... কতদিন হল মাকে মনে পড়ে না আমার। এখন মায়ের কথা ভাবলে বরঞ্চ অনির মুখটা মনে পড়ে। মায়ের কোলের গন্ধটা ওর শরীরে কী করে এল কে জানে। হঠাৎ ইচ্ছা হল অনির কোল ঘেঁষে শুতে। আমি কি আবার বাচ্চা হয়ে যাচ্ছি?

আমার ফেলে আসা বন্ধু, স্কুলের মাঠ, গাছে বাঁধা টায়ারের দোলনা, ঘেঁটুদের পুকুরপাড়টা কি ডাকছে আমাকে?

আমি জানি জগু সারিয়ে তুলবে আমার মেয়েকে। ও এই তিনদিনে খুব ভালোবেসে ফেলেছে অনিকে। ওকে এভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে

পড়তে দিয়ে ও কিছুতেই পালিয়ে যেতে পারে না।

উঁহু, প্রফেটরা, পালিয়ে যায় না। ফিরে আসতেই হয় ওদের। আমার মা বলেছিল...

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। মাঝরাতে একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। ভালো করে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ। আওয়াজ আসছে একটা। সিঁড়ির উপর মৃদু পায়ের আওয়াজ তুলে তিনতলায় উঠছে কেউ। কে হতে পারে?

আমি দ্রুত খাট থেকে নেমে চটিটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাইরের আলোটা জ্বলছে না। কেবল একটা অবয়ব অন্ধকারের বুক চিরে ফুটে রয়েছে। একটা মানুষ সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে তিনতলার দিকে।

টেবিল থেকে টর্চটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চেয়ে দেখলাম কাবেরি এখনও পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। ওর ঘুম গভীর।

ছায়ামূর্তিটার পেছন পেছনে তিনতলার ঘরে উঠে এলাম আমি। অনির ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সেটা আলতো হাতের ঠেলায় খুলে ফেলল লোকটা। তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মনে হয় কিছু একটা ভাবছে আগন্তুক। আমি যে ওকে ফলো করে এসেছি তা লোকটা এখনও বুঝতে পারেনি।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে এলাম। অনির ঘরের জানলাটা বেশ বড়। সেটা দিয়ে ভরাট চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভিতর। আমার এগারো বছরের অসুস্থ মেয়েটার ঘুমন্ত মুখ সেই জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনিন্দিতার খাটের পাশে বসে পড়েছে লোকটা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে আমার মেয়ে। ঘরের ভেতর জ্বলতে থাকা নীল যে বেবি ল্যাম্পের আলোয় ভারী মায়াবী দেখাচ্ছে ওর মুখটা। বুকটা ওঠানামা করছে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ একটা চাপা কান্নার শব্দ ভেসে এল। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে

বসা মানুষটা কাঁদছে। ঠিক এমন করে বাইশ বছর আগে তাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। আজ মানুষটা বদলে গেছে, কিন্তু কান্নার শব্দটা...

চাপা যন্ত্রণার নিঃশ্বাস যেন ঘরের বাতাসটাকে ভারী করে তুলেছে। সেই বাতাসের ভেতর আমার গলাটা নিজের কানেই অলৌকিক শোনাল, 'আর কষ্ট পেতে দিস না ওকে জগু, সুস্থ করে দে ওকে...'

এতক্ষণে ঠিক পেছনেই আমার অস্তিত্ব টের পায় লোকটা। চকিতে ফিরে তাকায় আমার দিকে। ঘরে এখনও আলো জ্বলছে না। তাও দু-জনেই দু-জনকে চিনতে পারি।

জগুর গলায় শুকনো কান্নার ছাপ, 'আমি জানি তুই কেন আমাকে নিয়ে এসেছিস এখানে...'

আমি উপরে নিচে মাথা নাড়াই, 'একদিন না একদিন তোকে জানাতেই হত। কিন্তু এও জানতাম আমার মেয়েকে ভালোবেসে ফেলতে বেশিদিন লাগবে না তোর... ওকে সুস্থ করে দে জগু, ও খুব কষ্ট পাচ্ছে...'

জগুর গলাটা এবার বদলে যায়, 'আমি কাউকে সুস্থ করতে আসিনি আজ। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ওকে শেষবারের মতো দেখতে এসেছিলাম...' আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়ায় জগু।

আমার দুটো হাতের সজোরে ধাক্কা ওকে দেওয়ালের উপর ছিটকে ফেলে দেয়। মুখ দিয়ে যন্ত্রণামাখা শব্দ বেরিয়ে আসে। আমি আড়চোখে একবার অনিন্দিতার দিকে তাকাই। এখনও ঘুমিয়ে আছে সে।

শ্বাপদের মতো হিংস্র গলায় বলি, 'ঈশ্বর নিজে যাদের মসিহা করে পাঠায় তাদের পালিয়ে যাওয়ার উপায় থাকে না জগদীশ, আমার মেয়েকে না সারিয়ে তুই আজ কোথাও যেতে পারবি না...'

'আমি কোন মসিহা নই...' কাঁদো কাঁদো গলায় আর্ত চিৎকার করে ওঠে জগদীশ, 'কষ্ট হয় আমার, খুব কষ্ট হয়... আমার শরীরে কী যন্ত্রণা...'

দু-হাতে আমার জামা খিমচে ধরে সে। ওর আঙুলের চাপে আমার চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসতে চায়। তাও আমি চেপে ধরে থাকি ওকে, 'যন্ত্রণা পেতে হয় বন্ধু, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যারা প্রফেট হয়েছে তাদের

সবাইকে যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। হয়নি? বল? তোদের ছাদে বসে রাতের পর পর তাদের গল্প পড়ে শোনাইনি আমি তোকে?'

দু-হাতের চাপে আমাকে সরানোর চেষ্টা করে জগু, 'তুই একটা মাথাখারাপ পাগল সোমু, আর এসব ছেঁদো কথা, আমি প্রফেট কি না তাতে তোর কিচ্ছু যায়-আসে না, তুই শুধু তোর মেয়েকে বাঁচাতে চাস... আর কার কী ক্ষতি হল তাতে তোর কিছু যায় আসে না...'

'না, যায়-আসে না...'

'কিন্তু আমার যায়-আসে, শিয়ালদা স্টেশনের কুলি হই আর যাই হই। আমি আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাই...'

'কী আছে তোর জীবনে বেঁচে থাকার মতো? কে আছে?'

অদ্ভুত হাসি খেলে যায় জগদীশের মুখে। একটা হাত বুকপকেটে ঢুকিয়ে একটা পুরনো ছবি বের করে আনে সে। তারপর সেটা তুলে ধরে আমার মুখের সামনে। চাঁদের আলো যেন নিজে থেকেই বেড়ে ওঠে। সেই আলোয় দেখতে পাই একটা তেলচিটে ফটোগ্রাফ। তিনটে মানুষের ছবি। বাবা-মা আর মেয়ে। এর মধ্যে একজনকে আমি চিনি। বাকি দু-জনকে চিনতে অবশ্য অসুবিধা হল না।

'তুই বিয়ে করেছিস জগু?'

'আমি পালাতে পারিনি রে... পালাতে পালাতে ক্লান্ত হয়ে... এরা কেউ আমার সঙ্গে থাকে না। মাসে একবার টাকা পাঠিয়ে দিই। একবার করে দেশে ফিরে মেয়েকে দেখে আসি। কিন্তু ওদের জন্য বাঁচতে ইচ্ছা করে সোমু। ওদের জন্য কষ্ট পেতে ইচ্ছা করে না...'

ছবিটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই আমি, বিকারগ্রস্তের মতো বলি, 'হোক সংসার। প্রফেটরা সংসার করলেও সংসারের কথা ভাবে না। তুই হয় আজ আমার মেয়েকে সারিয়ে তুলবি নাহলে... একটা মিরাকেল জগু, আজ থেকে বাইশ বছর আগে পারিসনি, কিন্তু আজ পারবি... ওইটুকু মেয়েটা মরে যাবে ধুঁকতে ধুঁকতে? একটা মিরাকেল জগদীশ...' অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়তে পড়তে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কথাগুলো।

'আমি...' এতক্ষণে জগদীশের চিৎকার আকাশ ছুঁয়ে ফেলে, মনে হয় গোটা বাড়িটাই কেঁপে ওঠে সে চিৎকারে, 'প্রফেট নই!'

অনিন্দিতার পুরনো কাঠের ব্যাটটা কখন ওর হাতে উঠে এসেছে খেয়াল করিনি। মাথায় তীব্র যন্ত্রণার স্রোত আছড়ে পড়তে পড়তে অনুভব করি আমাকে সেইভাবেই মাটির উপরে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জগদীশ...

(৬)

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম জানি না। চোখ যখন খুললাম তখন ঘণ্টাখানেক সময় পেরিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে সাদা আলো আসছে না, মানে ভোর হয়নি এখনও।

মাথার পেছনটা চেপে ধরে কোমরে ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে বিছানার দিকে একবার তাকালাম। অনি আগের মতোই ঘুমাচ্ছে। এত চিৎকারে একবারও চোখ মেলে চায়নি। ওর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে নাকের কাছে হাত রাখলাম। বেঁচে আছে মেয়েটা।

ঘরের ভেতরটা বড্ড দমবন্ধ লাগছে। ওষুধ আর অস্থির নিঃশ্বাসের শব্দ ঘিরে রেখেছে ভিতরের বাতাসটাকে। ছাদের খোলা হাওয়ায় একবার দাঁড়াতে পারলে বেশ হত।

মাথার পেছনে হাত বোলাতে বোলাতেই দরজা পেরিয়ে ছাদে এসে দাঁড়ালাম। সত্যিই একটা ঝিমঝিমে নরম খাওয়া খেলা করছে ছাদময়। মাথাটা একটু পরিষ্কার হল আমার।

পরিচিত চাঁদটা আমার দিকে চেয়ে হাসছে। একটু আগে মায়ের গলায় শোনা যে সুরটা কানে আসছিল সেটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সবকিছু বড্ড নিস্পন্দ, নির্বাক!

একটা যন্ত্রণা দলা পাকাচ্ছে আমার মনের ভেতর। অনিন্দিতা আর ভালো হবে না কোনওদিন। প্রত্যেকটা রাতে ওইটুকু ফুটফুটে মেয়েটাকে রক্তবমি করতে, যন্ত্রণা পেতে দেখতে হবে আমাকে, একদিন হয়তো সেই কাশির আওয়াজও থেমে যাবে। ওর বাবা ওর জন্য কোনও দেবদূত এনে দিতে

পারেনি। কিংবা সবটাই হয়তো ওর বাবার পাগলামো।

ছাদের কিনারে শরীর এলিয়ে দিলাম। আর একবার পাশ ফিরলেই গিয়ে পড়ব নিচে। নিচের মাটিটা ডাকছে আমাকে। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মাথায় ব্যাটের বাড়ি মেরেছে জগু। মাথার ভেতরটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে মনের ভিতর।

বাইশ বছর পর এই প্রথম মনে হল আমার—মা ভুল বলেছিল। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমার মাথার ভিতরে...

'বাপি...' পাশ থেকে ভেসে এসেছে গলার আওয়াজটা। দীর্ঘ যন্ত্রণাময় শ্বাসমাখা একটা ডাক। আমি ফিরে তাকালাম না। আকাশে চাঁদের আলো, তাতে চোখের জল ঝিকমিক করে উঠবে। মেয়েটা কবে যেন বড় হয়ে বাপের চোখের জল চিনে নিতে শিখেছে।

'তুমি এখানে এসে শুয়েছ কেন? কী হয়েছে বাপি?' কথাটা বলতে বলতেই সে এসে বসল আমার পাশে।

'কিছু না, এমনি শুয়ে আছি একটু। তুই ভিতরে যা...'

কয়েকটা সেকেন্ড চুপ করে থাকলাম দু-জনে। আবার টেনেটেনে নিঃশ্বাসের শব্দ। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

একটা নরম স্পর্শে বুঝলাম আমার মাথাটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে ও। তারপর হাত থেকে নামিয়ে রেখেছে নিজের কোলে। ওর কোল জুড়ে রক্তের গন্ধ। শুকনো রক্তের খসখসে স্পর্শ পেলাম স্কার্টে।

আমার শরীর মনের যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে উত্তরোত্তর। মাটিটা আরও বেশি করে ডাকছে। আর মাত্র একবার পাশ ফিরলেই...

'তোমার কী কষ্ট হচ্ছে বাপি? শরীর খারাপ লাগছে?'

রাতের হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েটার গলার আওয়াজ আমার শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিল। আবার জিজ্ঞেস করে সে, 'কী কষ্ট হচ্ছে বলো না বাপি, কোথায় ব্যথা হচ্ছে তোমার?'

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। শরীরটা কেঁপে উঠেছিল একবার। আবার স্থির হয়ে গেলাম।

ঠিক এইসময়ে একটা অদ্ভুত কাজ করল অনিন্দিতা। প্রকৃতির কোন খেয়ালে জানি না, ওর হাতটা উঠে এল আমার মাথায়। কোমল স্পর্শে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে। আর আমি অবাক হয়ে খেয়াল করলাম আমার শরীর মনের ব্যথা কমে যাচ্ছে একটু একটু করে!

হ্যাঁ, ওর হাতের স্পর্শে, ওর গলার 'বাপি' ডাকে সত্যি সত্যি ম্যাজিকের মতো কমছে আমার ব্যথাটা। বাইশ বছর আগে যেমন করে কমিয়েছিল আমার বন্ধু।

অবাক বিস্ময়ে এই প্রথম আমি ওর মুখের দিকে চাইলাম। বিস্তীর্ণ কালো আকাশের প্রায় সবটা ঢেকে দিয়েছে আমার ছোট্ট অসুস্থ মেয়েটা।

আমার চোখের জলটা খেয়াল করে আর একটা হাত বাড়িয়ে জলটা মুছে দিল সে। নরম হাসি হেসে ফিসফিস করে বলল, 'কষ্ট পেও না বাপি, দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে...'

শরীর মনের সমস্ত যন্ত্রণা মুহূর্তে মুছে গেল আমার। মাতৃহারা শিশুর মতো অনিন্দিতার কোমর আঁকড়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম আমি।

জগদীশ পারেনি। সে পালিয়ে গেছিল। কিন্তু সেদিন রাতে আমার এগারো বছরের অসুস্থ মেয়ে অনিন্দিতা, প্রফেট হতে পেরেছিল...

ফুটোস্কোপ

(১)

ভোরের দিকে একটা আচমকা চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল নির্মলের। পাশের ঘরে নির্মলের দশ বছরের ছেলে পার্থ ঘুমাচ্ছে। সে ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝেই এমন চাপা চিৎকার করে। আশ্চর্যের কিছু না। পাশেই তন্দ্রিমা শুয়ে। সে এখনও গভীর ঘুমে তলিয়ে। পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল নির্মল, কী একটা মনে পড়তে থেমে গেল; একটু আগে যে আওয়াজে ওর ঘুম ভেঙেছে সেটা আর্তনাদ নয়। একটা মিহি হাসির শব্দ। এত রাতে এমন খোনা গলায় কে চিৎকার করবে? পার্থর গলা এরকম নয়, তাহলে কি...

সাতপাঁচ ভেবে উঠে পড়ে নির্মল। ঘর থেকে বেরিয়েই একটা লম্বা প্যাসেজ। সেটা পেরোলেই দুটো পাশাপাশি ঘর। তার একটা পার্থর। এতদিন মা বাবার কাছেই শুতো সে। আগের বছর এই ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে।

হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেদিকেই এগিয়ে যায় নির্মল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। অন্যদিন সাধারণত সেটা ভেজানো থাকে। একটু খটকা লাগে নির্মলের।

দরজার দিকে কয়েক'পা এগোতেই ঘরের ভিতর থেকে একটা হিলহিলে গলা শুনতে পায়। মৃদু স্বরে ছড়া কেটে একটা পরিচিত কবিতা আবৃত্তি করে চলেছে কেউ, একটা চাপা হিংসা আর শয়তানি খেলা করছে সে গলায়—

আয় তোর মুন্ডুটা দেখি, আয় দেখি 'ফুটোস্কোপ' দিয়ে
দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।

শিরদাঁড়া ঠান্ডা হয়ে যায় নির্মলের। এ গলা পার্থর হতেই পারে না। তবে

কি বাইরে থেকে কেউ ঢুকেছে ওর ঘরে? ও বাইরে থেকেই হাঁক দেয়, 'পার্থ, কী করছিস তুই ভিতরে? কে আছে তোর সঙ্গে?'

হালকা গোঙানির আওয়াজ আসছে কি? কবিতাটা এখনও শোনা যাচ্ছে আগের মতোই। যেন ভিতরের লোকটা শুনতেই পায়নি সে কথা।

কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খোলে, কোন্ দিকে থেকে যায় চাপা;
কতখানি ভস্ ভস্ ঘিলু, কতখানি ঠক্ ঠকে ফাঁপা।

এবার জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা মারে নির্মল, 'দরজা খুলুন, নাহলে কিন্তু আমি...'

আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে— চোপ্ রও ভয় পাস্ কেন?

গোঙানির শব্দ বেড়ে ওঠে। মুখবাঁধা অবস্থায় কেউ যেন চিৎকার করার চেষ্টা করছে। দরজায় সজোরে লাথি মারে নির্মল। কানের পাশ গরম হয়ে ওঠে ওর। বুকে কান্নার ঢেউ ধাক্কা মেরে যায়, 'ছেড়ে দিন, আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন...'

কাৎ হ'য়ে কান ধ'রে দাঁড়া, জিভ্‌খানা উল্টিয়ে দেখা,
ভালো ক'রে বুঝে শুনে দেখি— বিজ্ঞানে যে রকম লেখা।

গলাটা সংকেত দিয়ে যায়, ভিতরে খারাপ কিছু হতে চলেছে। কিংবা হয়ে গেছে। একটা ধাতব শব্দ শোনা যায় ঘরের ভিতর। গোঙানির আওয়াজ চরমে পৌঁছায়। কবিতার ফাঁকে ফাঁকে একটা হাসির আওয়াজ এসে মিশতে শুরু করেছে এতক্ষণে। শীতল, শয়তানি হাসি... শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'পার্থ...'

মুন্ডুতে 'ম্যাগনেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট্' করে
ইঁট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'ষে, দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে।

মড়মড় করে ঘাড় ভাঙার একটা শব্দ আসে ঘরের ভিতর থেকে। চিৎকারের আওয়াজ বেড়ে উঠেই আবার থেমে যায়...

(২)

'বাবা, ও বাবা, শুনছ?'

মাঝরাতে রনির ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নময়ের। ঘুম চোখেই

কোনওরকম উঠে বসল। রনির মুখটা আতঙ্কে পাংশু হয়ে আছে। স্বপ্নময়ের মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে ক্রমাগত ঠ্যালা দিয়ে চলেছে সে।

'ওঠো না, ও বাবা, শুনছ?'

রাত আড়াইটার কাছাকাছি বাজে। টিকটিক করে আওয়াজ হয়ে চলেছে টেবিলের পাশে রাখা ঘড়িটায়। বাইরে কাচের জানলার পাশে ছাতিম গাছের দুলন্ত পাতার ছায়া এ ঘরের মেঝের উপরে এসে পড়েছে।

স্বপ্নময় মুখের উপর দু-বার হাত বুলিয়ে নিয়ে একটু বিরক্ত গলাতেই বলল, 'হ্যাঁ কী হল আবার? টয়লেটে যাবি?'

বছরখানেক আগে নার্ভের রোগ ধরা পড়ে রনির। তখনও বকুলের সঙ্গে ডিভোর্সটা হয়নি স্বপ্নময়ের। নার্ভের রোগ ওদের জিনে আছে, ফলে অতটা গুরুত্ব দেয়নি দু-জনে। কিন্তু মাসখানেক পরে একদিন স্কুলে দৌড়াতে গিয়ে আচমকাই পড়ে যায় রনি। স্কুল থেকেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে তিনি কিছু সন্দেহ করে কয়েকটা টেস্ট করতে দেন। ডিজিটি করে দেখা যায় রনির রোগটার নাম জেনেটিক পারকিনসন। জটিল নার্ভের রোগ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা একটা করে রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলে। রনির পা দুটো তারপর থেকেই ধীরে ধীরে অচল হয়ে পড়ে। আপাতত হুইলচেয়ারে করে এদিক ওদিক যেতে পারে, কিন্তু রাতে হুট করে হিসি পেয়ে গেলে বাবাই ভরসা।

'না যাব না...'

'তাহলে?'

'আমার খুব ভয় করছে বাবা...'

স্বপ্নময়ের বিরক্ত ভাবটা আরও বেড়ে ওঠে, 'তোকে এত রাতে জেগে থাকতেই বা কে বলেছে?'

'ঘুমিয়েই তো ছিলাম। ঘুম ভেঙে গেল তো...'

'কী করে ভেঙে গেল?'

'ওই যে দরজার দিক থেকে আওয়াজ হল একটা...'

'কই আমার তো ঘুম ভাঙেনি...'

রনির গলায় এবার আকুতি ঝরে পড়ে, 'আমি সত্যি বলছি বাবা, ওখানে

কেউ দাঁড়িয়ে আছে...'

'সে আবার কী কথা?' ঘরের দরজাটা বন্ধ। জানলা দিয়ে আসা বাইরের আলো সেখানে ভালো করে পৌঁছায় না। সেই জমাট অন্ধকারের দিক থেকে একবার মুখ ঘুরিয়ে নেয় স্বপ্নময়, আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলে, 'কেউ দাঁড়িয়ে নেই... তুই ঘুমা...'

দেখার অবশ্য দরকার ছিল না। রনির মাঝরাতে এরকম দরজার পেছনের অন্ধকার দেখে ভয় পাওয়া নতুন কিছু নয়। মাসে দু'তিনবার রাতে ঘুম ভেঙে এই একই দাবি জানায় সে। কথাটা বলে স্বপ্নময় পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

বাবার কথায় মনে একটু ভরসা পায় ছেলেটা। আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলে, 'আচ্ছা বাবা, ফুটোস্কোপ বলে সত্যি কিছু আছে?'

'ফুটোস্কোপ! সেটা আবার কী?'

'ওই যে স্কুলে কবিতা পড়াচ্ছিল। সবাই হাসছিল, আমার কিন্তু ভয় লাগছিল, জানো? আয় তোর মুন্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে... ওরকম সত্যি কিছু হয়?'

'ধুর, ওরকম কিছু...' কথাটা বলতে গিয়েও থেমে যায় স্বপ্নময়। অনেককাল আগে পড়া কোন একটা খবরের কথা মনে পড়ে যায় ওর। কিন্তু ওসব কথা রনিকে বলা কি ঠিক হবে? কিশোর মন... আবার বলতেও ইচ্ছা করছে।

খানিক ভেবেচিন্তে মনস্থির করে নেয় স্বপ্নময়। গল্পের মতো শুনিয়ে দিলে ক্ষতি কী? তাছাড়া ছেলেটার মাথায় যখন ভাবনাটা এসেছে... ওর দিকে ঘুরে শোয় স্বপ্নময়, মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে ওর, 'আমি ছোটবেলায় একবার কাগজে একটা খবর পড়েছিলাম, জানিস?'

'খবর? কী খবর?'

এতক্ষণে ছেলেকে একটু ভয় দেখানোর মওকা পাওয়া গেছে। রনির দিকে ফিরে স্বপ্নময় বলল, 'একবার একটা লোক এই কবিতাটা পড়ে পাগল হয়ে গেছিল। নিজের ছেলেকে মাথায় বাড়ি মেরে ঘাড় মটকে খুন করেছিল...'

'সে কী! কেন?'

'ওই যে, মাথার ভিতরে কী থাকে, কতটা বুদ্ধি, কতটা বোকামো, কতটা

গুণ, কতটা রাগ, দুঃখ, অভিমান... ভেবেছিল মাথা ফাটিয়ে ফেললেই বুঝি সব জানা যাবে।'

'সত্যি?'

'তাই তো মনে পড়ছে। কোন কাগজে পড়েছিলাম সেটাও ভুলে গেছি। তবে পরে পুলিশ নাকি গ্রেফতার করেছিল লোকটাকে। লোকটা অবশ্য বলেছিল খুনটা ও আদৌ করেনি। অন্য কেউ ঘরে ঢুকে ওই কবিতাটা আবৃত্তি করতে করতে... পুলিশ বুঝতে পারে লোকটা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলছে। একটু চাপ দিতেই দোষ স্বীকার করে লোকটা। ঘটনাটা ঘটার সময় ওর পাশে ওর স্ত্রী...'

কথাটা বলতে বলতে রনির মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে স্বপ্নময়। গল্প বলতে শুরু করার মিনিটখানেকের মধ্যে গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে ছেলেটা। ওর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেয় স্বপ্নময়। কপালে একটা চুমু খায়। তারপর সেদিকে ফিরেই শুয়ে পড়ে।

বালিশের উপরে কান রেখে চোখ বন্ধ করতেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ওর মনে হয় খুব মৃদু স্বরে সেই কবিতাটা এখনও যেন শুনতে পাচ্ছে ও। বালিশের ভিতরে লুকানো একটা টেপ রেকর্ডারে সেটা চালিয়েছে কেউ। ও চমকে ওঠে।

উঠে বসতেই আওয়াজটা মিলিয়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে বালিশটা একবার ঘেঁটে দেখে স্বপ্নময়। নাঃ, তুলো ছাড়া আর কিছুই নেই তার ভিতরে। তাহলে...

ঘরের আলোটা কমে এসেছে নাকি? বাইরে থেকে... ও বুঝতে পারে এতক্ষণ জানলার দিয়ে যে বাইরের আলো আসছিল ঘরের ভিতরে সেটা আসছে না। কেউ কি এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়?

কী মনে হতে ঝট করে জানলার দিকে ফিরে তাকায় স্বপ্নময়। নাঃ, কেউ নেই সেখানে। কেবল আগের মতোই ছাতিম গাছের পাতাগুলো দুলছে। আগের থেকে একটু জোরে...

(৩)

সন্ধের দিকে ছাদে বসেছিল রনি। রোজ এই সময়ে বাবা ওকে ছাদে বসিয়ে

দিয়ে যায়। ও চুপ করে তাকিয়ে আকাশ দেখে। কখনও একটা একটা করে তারা গোনে। কখনও উড়ে যাওয়া বাদুড়ের ডানার দিকে চেয়ে থাকে একটানা।

মাঝে মাঝে দূর আকাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া জেট প্লেনের দেখা পাওয়া যায়। মনে হয় যেন আকাশের বুকে কোনও অভিযানে চলেছে যেন প্লেনটা। ছুটে যাচ্ছে তারা থেকে তারায়।

এখানে বসে থাকতে থাকতে মায়ের কথা মনে পড়ে রনির। মাকে শেষ দেখেছিল ছ-মাস আগে। মাঝে মাঝে অন্য সব ব্যথার মতো মাকে মনে পড়াটা বেড়ে ওঠে। কেবল অন্য ব্যথাগুলো বাবাকে বলা যায়, এই মন কেমনটা লুকিয়ে রাখে রনি। ও জানে এ ব্যথাটার কোনও মলম নেই বাবার কাছে।

বাবা অবশ্য ওকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না। ইদানীং তো আরই চোখের বাইরে করতে চায় না। কেবল এই সন্ধের সময়টুকু ওকে একা থাকতে দেয়, ভাবতে দেয়। বাবা জানে এইসময় ও মায়ের কথা ভাবে...

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল রনি, হঠাৎ খেয়াল হয় অনেকক্ষণ ধরে একটা শব্দ হচ্ছে পেছনে।

চমকে আশপাশে তাকায়। মনে হয় একটা ভারী ধাতব কিছুকে ছাদের মেঝের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। অন্ধকারে ভরে আছে ছাদটা।

হুইলচেয়ারটা ঘুরিয়ে সেদিকে তাকায় রনি। থমথমে গলায় ডেকে ওঠে, 'কে?'

উল্টোদিক থেকে কোনও আওয়াজ আসে না। যেন ও ঘুরে তাকাতেই থেমে গেছে আওয়াজটা। মনের ভুল ভেবে মুখ ঘুরিয়ে আবার উল্টোদিকে ফিরতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা মৃদু শব্দ কানে আসে। খুব নিচু স্বরে একটা সুর ভাঁজছে কেউ। মেয়েলি গলা। প্রায় হাওয়ার শব্দের সঙ্গে মিশে আছে। চারপাশ এত নিস্তব্ধ না হলে হয়তো শোনাই যেত না।

একটা শিরশিরানি ভয় রনির পা বেয়ে উপর দিকে উঠতে থাকে। কেউ একটা আছে ছাদে। কেউ অন্ধকার থেকে লক্ষ রাখছে ওর দিকে। সে-ই তাহলে ধাতব কিছু টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ছাদ দিয়ে?

চিৎকার করতে গিয়েও পারে না রনি। বুঝতে পারে ভয়ে আর উত্তেজনায় ওর শরীর কাজ করা বন্ধ করতে শুরু করেছে। একটা অস্থির হাওয়া ছোটাছুটি

করতে শুরু করেছে ছাদময়। কার যেন গন্ধ মিশে আছে তাতে।

চোখটা সেদিক থেকে নামিয়ে নিতে যাচ্ছিল রনি। মেঝের দিকে তাকাতেই ওর হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। বাইরের আলো ক্ষীণ হয়ে এসে ছাদের মেঝেতে পড়েছিল এতক্ষণ। তাতে ওর নিজের শরীরের আউটলাইন আবছা দেখতে পাচ্ছিল। এখন মাটির দিকে তাকাতে বুঝতে পারল সেই ছায়াটা পালটে গেছে। সেখানে এখন ওর বদলে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের ছায়া। অর্থাৎ ওর পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। পেছন ঘুরে তাকালেই তাকে দেখতে পাবে।

চিৎকার করতে চেয়েও ওর গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না।

তেমনই ক্ষীণ নিঃশ্বাসের শব্দ। সেই সঙ্গে পুরনো সুরটা। থেমে থেমে একটা পরিচিত কবিতা আবৃত্তি করছে মানুষটা।

রনি বুঝতে পারে পায়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। হুইল চেয়ারের হাতলের উপর ওর হাতটা অবশ হয়ে পড়ে আছে। চাইলেও নড়াতে পারবে না।

ছায়াটার দিকে চেয়ে রনি দেখে এতক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার হাত ওপরের দিকে উঠে এসেছে। হাতে ধরা একটা মোটা ব্যাট জাতীয় কিছু। রনির মাথার ঠিক পেছন বরাবর হিংস্র শ্বাপদের মতো অপেক্ষা করছে সেটা। ধীরে ধীরে সেটা নেমে আসতে থাকে ওর মাথার উপর... আর কয়েক সেকেন্ড...

'বাবা...' শরীরের সমস্ত জোর একত্র করে কোনওরকমে চিৎকার করে ওঠে রনি। ফাঁকা ছাদে প্রতিধ্বনিত হয়ে নিচ অবধি ছুটে যায় সেই ডাক।

পরমুহূর্তে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। হুড়মুড়িয়ে দিয়ে ছাদে উঠে আসে স্বপ্নময়। হন্তদন্ত হয়ে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে রনির হুইল চেয়ারের কাছে এগিয়ে আসে।

'আমার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে বাবা...' ওকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে ওঠে রনি। অস্থির নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

এগিয়ে এসে হুইলচেয়ারের পেছন দিকটা খতিয়ে দেখে স্বপ্নময়। ওর মুখে আশ্বাসের হাসি খেলে যায়। নরম গলায় বলে, 'কেউ নেই তোর পেছনে, শুধু শুধু ভয় পেয়েছিস...'

'না, আমি দেখেছি একটা লোক... একটা মেয়ে...'

'লোক না মেয়ে?'

'লোক, কিন্তু গলাটা বুড়িদের মতো... বলছিল...'

'কী বলছিল?'

'...ওই কবিতাটা' আয় তোর মুন্ডুটা দেখি... ওইটা...'

ছেলের কাঁধে একটা হাত রাখে স্বপ্নময়, 'কবিতাটা নিয়ে বড্ড ভাবছিস তুই, নারে?'

'আমি সত্যি বলছি বাবা, লোকটা...'

স্বপ্নময় কিছু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওর পকেটে ফোনটা বেজে ওঠে। নাম্বারটা দেখে ওর ভুরু কুঁচকে যায়, বকুল ফোন করছে। কিন্তু কেন? রনিকে নিয়ে দু-কথা শোনানোর না থাকলে সচরাচর তো সে ফোন করে না। কয়েক সেকেন্ড সেদিকে চেয়ে থেকে ফোনটা রিসিভ করে, 'হ্যাঁ, বলো...'

'রনিকে তোমার কাছে রেখে আসাই উচিত হয়নি...'

'মানে?'

'বাচ্চা-কাচ্চা যখন মানুষ করতে পারবে না তখন দায়িত্ব নিয়েছিলে কেন? তার থেকে আমার কাছে থাকলে অন্তত...'

'আরে বলতে চাইছটা কী?'

'উল্টোপাল্টা গল্প বলে ভয় দেখিয়েছ রনিকে। দু-দিন হল দুঃস্বপ্ন দেখছে। ওর মনে হচ্ছে কেউ ওর উপর নজর রাখছে, ছেলের খবর কতটা রাখো তুমি?'

'তোমাকে ও বলেছে এসব?' রনির দিক থেকে একবার মুখ ফিরিয়ে নেয় স্বপ্নময়।

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে। দেখো, যদি একান্তই ওকে সামলাতে না পারো...'

'আমরা বাপবেটা সামলে নেব, তোমাকে এত মাথা ঘামাতে হবে না...'

'এত অ্যারোগেন্স তোমার আসে কী করে। নেহাত ও তোমার কাছে থাকতে চেয়েছিল তাই কাস্টডি ছেড়ে দিয়েছি, নাহলে...'

'ঠিক আছে, রাখছি এখন...'

'পারলে একটু ভাল রাখার চেষ্টা করো ওকে, এমনিও তো ছেলেটা আর বেশিদিন...'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোনটা কেটে দেয় স্বপ্নময়। রনি এখনও অন্ধকারের মধ্যে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করছে। ওর সামনে গিয়ে ছাদের মেঝেতেই বসে পড়ে সে। তারপর মুখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ রে ব্যাটা, আমি বাবা হিসেবে কেমন বল তো?'

'আমি তো অন্য বাবা দেখিনি, তাই বলতে পারব না...'

'মাকে তো দেখেছিস, মায়ের কাছে থাকতে ইচ্ছা করে না তোর?'

'মাঝে মাঝে করে...' রনি ভেবে বলে।

'তখন কী করিস?'

'আর একটু বেশি করে তোমার কাছে থাকি...'

স্বপ্নময় হেসে ফেলে। ছেলের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। তারপর দূর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে দু-জনে। হালকা হালকা মেঘের ছেঁড়া চাদরে চাঁদটা অর্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে। শার্সি দেওয়া জানলা দিয়ে যেন উঁকি মেরে ওদের দেখতে চাইছে সে।

'আজ খুব ভয় পেয়ে গেছিলি, নারে?' ছাদের অন্ধকারের দিকে চোখ নামিয়ে স্বপ্নময় জিজ্ঞেস করে।

রনি এবার নরম করে হাসে, 'পা দুটো ঠিক থাকলে এত ভয় পেতাম না জানো। এক দৌড়ে...'

ওর হাতের উপর স্বপ্নময়ের হাতের চাপ বেড়ে ওঠে, 'দৌড়াতে পারিস আর না পারিস, বাবা থাকতে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তোর, সে যেই হোক...'

কথাটা বলে একটু থমকায় স্বপ্নময়। সে জানে অন্য যাই থাক না কেন যে বিশেষ আততায়ী একপা একপা করে এগিয়ে আসছে রনির দিকে। তাকে তার বাবাও আটকাতে পারবে না। সময় হলে সামনে থেকেই হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে।

'নিচে যাবি? চল...'

'হ্যাঁ চলো...'

দু-পা এগোতে গিয়েও থেমে যায় স্বপ্নময়। ওর পায়ে কিসের একটা স্পর্শ লাগে। নিচু হয়ে জিনিসটা দেখতেই ওর বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

'এটা তুই এনেছিস এখানে?' জিনিসটা হাতে তুলে ধরে রনিকে জিজ্ঞেস করে স্বপ্নময়।

একটা পুরনো লোহার খিল। আগে নিচের দরজা আটকানো হত এই খিল দিয়ে। বছরখানেক হল আর কাজে না লাগায় ছাদের এককোণে পড়ে থাকে নোংরার মধ্যে। সেটা ছাদের মাঝামাঝি এল কী করে?

রনিও অবাক হয়েছে, খিলটা ভালো করে দেখে বলে, 'আমি কেন আনব?'

'তাহলে?'

খিলটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ থম মেরে সেদিকে চেয়ে থাকে স্বপ্নময়। চাঁদের হালকা আলো প্রতিফলিত হচ্ছে তার উপরে। ধার বরাবর চকচক করছে। এতটা চকচকে থাকার তো কথা নয়...

সেটা ছাদের এককোণে সরিয়ে রেখে ছেলেকে কোলে নিয়ে নিচে নেমে আসে স্বপ্নময়...

(৪)

কাগজটা ইন্দ্রনীল ঘোষালের সামনে ফেলে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল স্বপ্নময়, 'এই দেখ, এইটুকুনি খবর মোটামুটি জানা যাচ্ছে। এর থেকে বেশি আর কিছু লেখেনি...'

পুরনো জেরক্স করা কাগজটা মুখের সামনে এনে ভালো করে পড়ে দেখে ইন্দ্রনীল। তিরিশ বছর আগের একটা খুনের খবর। ব্যাঙ্ক কর্মী নির্মল মুখার্জি নিজের দশ বছরের ছেলেকে প্রথমে ঘাড় ঘুরিয়ে তারপর ভোঁতা কিছু দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে খুন করেন। খুনটা যে তিনিই করেছেন সেটা প্রথমে ভদ্রলোক স্বীকার করেননি। তার নিজের জবানবন্দি অনুযায়ী দরজার বাইরে থেকে একটা বিড়বিড় করে আবৃত্তির শব্দ শুনতে পান। ঘরে ঢুকে দেখেন ছেলে মৃত। পরে অবশ্য সত্যি কথা স্বীকার করেন। ব্যস, এটুকুই... খবরটা এতই ছোট করে লেখা যে নামধাম ছাড়া তাদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।'

খবরের উপর মোটামুটি একরকম চোখ বুলিয়ে মুখ তোলে ইন্দ্রনীল, 'সুকুমার রায়ের কবিতার সঙ্গে খুনের ব্লেন্ডিংটা অড সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য এত সকালে হঠাৎ আমার কাছে...'

স্বপ্নময় এতক্ষণ থম মেরে বসেছিল। এবার বলে, 'বাবার জবানবন্দিটা ইন্টারেস্টিং না?'

'নো ডাউট...'

'পুরো খবরটা পড়ে তোর মনে হল লোকটা খুন করেছে?'

'না করার তো কারণ দেখছি না...'

'ধরে নিলাম বাবাই করেছে, কেন করেছে? আই মিন কারণটা গেস কর...'

একটু ভেবে কাঁধ ঝাঁকায় ইন্দ্রনীল, 'ধর কিছু একটা রাগের মাথায় মেরে ফেলেছে। ইনটেনশনাল মার্ডার নয় হয়তো...'

স্বপ্নময় একটু নড়েচড়ে বসে, 'বেশ, তাই হল না হয়। রাগের মাথায় হিট অফ দ্য মোমেন্ট দুম করে মেরে দিল। তারপর কী হবার কথা?'

'রিয়ালাইজ করবে যে নিজের ছেলেকে খুন করে ফেলেছে...'

'এক্ষেত্রে সেটা হয়নি। প্রথমে ঘাড় ঘোরানো হয়েছে, তারপর মাথায় বেশ কয়েকটা বাড়ি মারা হয়েছে। এই খুন হিট অফ দ্য মোমেন্টে আদরের কাউকে মেরে ফেলা নয়। প্রতিহিংসামূলক...'

'বাবার নিজের ছেলের প্রতি কী প্রতিহিংসা থাকতে পারে।'

স্বপ্নময় কী যেন ভেবে ঘাড় নাড়ায়, 'আমার জানি না কেন মনে হচ্ছে লোকটা আদৌ ছেলেকে খুন করেনি...'

'সিরিয়াল কিলার গোছের কিছু? কিন্তু...' খবরটা আবার হাতড়ায় ইন্দ্রনীল, 'এই তো লেখা আছে পুলিশ ফোর্সড এন্ট্রির কোনও চিহ্ন পায়নি... সিরিয়াল কিলারের আইডিয়া তারা সবার আগে খারিজ করে দিয়েছে... তাহলে?'

জানালা দিয়ে দুপুরের আলো আসছে। ঘরের ভেতরে একটা বড় সাইজের আয়না আছে। তাতে দুপুরের রোদ পড়ে ছিটকে যাচ্ছে ঘরময়। একদিকে টিভিতে একটা নিউজ চ্যানেল খোলা আছে। তাতে কোনও সেলিব্রিটির বাড়িতে চুরির খবর চলছে নিচু স্বরে।

ইন্দ্রনীলের এই অফিসটা নতুন। আগে অফিসের বালাই ছিল না। ঘুরে

ঘুরেই কাজ করতে হত। সাংবাদিকতার কাজ। বছরখানেক সেই চক্করে থেকে ঘেন্না ধরে গেছিল। খামোখা কর্পোরেট বসের চরণামৃত খাওয়া দু-বেলা।

তার পয়সাকড়ির অভাব নেই। ভেবেছিল নিজের মতো কিছু একটা করবে। তাতে পয়সা আসুক না আসুক, অভিজ্ঞতাটা যেন কাজে লাগে। সেই ধান্দায় কয়েক বছর শখের থিয়েটার করার চেষ্টা করেছিল। তাতে মন বসেনি। কিছুদিন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেরিয়ে আবার সাংবাদিকতা শুরু করবে কি না ভাবছে এমন সময় গোয়েন্দাগিরির ভূত চাপে মাথায়।

সেই থেকে এই ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিটা একরকম শখ করেই খোলা। তেমন একটা কেসও আসে না। আজ সকালেই ফোন করেছিল স্বপ্নময়। ওর কলেজ জীবনের বন্ধু। ঠিক কেস নয়, তবে কী একটা দরকারে যেন ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'সব বুঝলাম, কিন্তু একটা আনরিলেটেড পুরনো খুন নিয়ে তুই এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?' ইন্দ্রনীল কাগজটা ওর হাতে ফেরত দিয়ে জিজ্ঞেস করে।

এই আলোয় ভরা ঘরেও স্বপ্নময়ের মুখে ছায়া নামে। বড় করে শ্বাস নিয়ে বলে, 'সেটার জন্যই তোর কাছে আসা। সত্যি কথা বলতে ব্যাপারটা অন্য কাউকে বলতে আমার ভরসা হচ্ছে না...'

'বেশ, বল...'

'কয়েকদিন ধরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে আমার। কেবল মনে হচ্ছে এই কবিতাটা...'

'কবিতাটা কী?'

'মনে হচ্ছে এই ঘটনাটা আবার ঘটবে। আমার বাড়িতে...'

চমকে ওঠে ইন্দ্রনীল। চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসে বলে, 'মনে হওয়ার কারণ?'

'কেউ নজর রাখছে আমাদের উপর...'

'মানে?'

কাঁধ ঝাঁকায় স্বপ্নময়, 'মানেটা বুঝিয়ে বলা মুশকিল। হয়তো আমাদেরই মনের ভুল। রনি মাঝে মাঝে বলে জানলা দিয়ে কে যেন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে...'

‘আরে ও বাচ্চা ছেলে, মনে হতেই পারে। তার মধ্যে আবার তোর মতো একটা ঘোড়েলের কাছে মানুষ হচ্ছে। এর মধ্যে আশ্চর্যের কী আছে?’

‘ব্যাপারটা যদি শুধু ওর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে আমি এত ঘাবড়াতাম না... কিন্তু...’

‘কিন্তু?’

‘আমারও আজকাল কেমন যেন...’

হাতের পেনটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে ইন্দ্রনীল, ‘দেখ, যদি সত্যি কোনও খারাপ ইনটেনশন নিয়ে কেউ তোদেরকে ফলো করে সেক্ষেত্রে আমি তোকে হেল্প করতে পারি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তোর ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল। গত ক-মাসে কম ট্রমা তো যায়নি তোদের উপর দিয়ে। বকুলের সঙ্গে ডিভোর্সটা, প্লাস রনির অসুখ, সব মিলেমিশে...’

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় স্বপ্নময়। খোলা জানলার দিকে এগিয়ে গিয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে, ধীর গলায় বলে, ‘রনির শরীরের কন্ডিশন ভালো না। হাতেও জোর পাচ্ছে না ইদানীং। আমি ভাবছি...’

ইন্দ্রনীলও উঠে ওর দিকে এগিয়ে আসে। সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ‘ডাক্তার কী বলছে এখন?’

সিগারেট ধরায় স্বপ্নময়। লাইটারটা পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, ‘পরশু একটা টেস্ট আছে। পরদিন রিপোর্ট দেবে সেটার। ওটা না পেলে কিছু বলা যাচ্ছে না।’

কথাটা শেষ না করেই ইন্দ্রনীলের দিকে ফিরে তাকায় স্বপ্নময়, ‘ঠিকই বলেছিস। হয়তো কিছুই না, শুধু এই স্ট্রেসটা থেকেই বাড়াবাড়ি হয়ে...’

ফোনটা বেজে ওঠে স্বপ্নময়ের। সেটা হাতে নিয়ে দেখে বাড়ি থেকে ফোন আসছে। রনি করছে নিশ্চয়ই। ঘড়ি দেখে স্বপ্নময়। ওকে দেখাশোনা করে যে মেয়েটা সে এখনও বাড়িতেই আছে। তবে দুপুরের দিকটা মাঝে মাঝেই টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

‘হ্যাঁ, বল ব্যাটা...’

ওপাশ থেকে কোনও কথা আসে না। ঘড়ঘড় করে একটা আওয়াজ শোনা

যায় কেবল। স্বপ্নময় জানলার দিকে আর একটু সরে আসে, 'একটু জোরে বল, ঠিক শুনতে পাচ্ছি না...'

ঘড়ঘড় আওয়াজটা থেমে গিয়ে এবার একটা গলা ভেসে আসে, 'আয় দেখি বিশ্লেষ ক'রে- চোপ্ রও ভয় পাস্ কেন?'

সেই হিলহিলে সরীসৃপের মতো গলা। ছন্দ করে যেন গানের সুরে গেয়ে চলেছে কবিতাটা।

'রনি...' গলাটা কেঁপে যায় স্বপ্নময়ের। আর কোনও দিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজার দিকে দৌড় দেয় সে...

(৫)

বিকেলের দিকটা বাড়ির সামনে পার্কে বেড়াতে আসেন বৃদ্ধ কৌশিকবাবু। পার্কের ভিতরে ঢুকেই বড় করে কয়েকটা নিঃশ্বাস নেন। তারপর কোনওদিকে না তাকিয়ে হনহন করে হাঁটতে থাকেন। এই সত্তর বছর বয়সেও পার্কের অন্যান্য কচিকাঁচাদের থেকে জোরে হাঁটতে পারেন তিনি। তবে শরীর পাকাপোক্ত থাকলেও বছরখানেক হল স্মৃতিশক্তি কিছুটা ক্ষয়ে আসতে শুরু করেছে। সেই নিয়ে খানিক মন খারাপও হয় মাঝে মাঝে। আহা এতদিন চাকরির কত বাহারি অভিজ্ঞতা, সব ঝাপসা হয়ে যাবে?

তবে হাঁটা ছাড়াও এ পার্কে ঘুরতে আসার আরও একটা কারণ আছে তার। পার্কের লাগোয়া পুলিশ স্টেশন। ঘুরতে আসার পথে মাঝেমধ্যেই ছোকরা কিছু পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কৌশিক ব্যানার্জিকে দেখলেই একগাল হেসে মাথা ঝোঁকায় তারা। চোখে মুখে একটা সম্ভ্রম খেলে। সেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে মন্দ লাগে না তার। যে চল্লিশ বছর পুলিশে সার্ভিস করেছেন তাতে ওই একটি বস্তুই অফুরান কামিয়েছেন তিনি—সম্ভ্রম।

'ইয়ে আপনি কৌশিক ব্যানার্জি তো?'

লাঠি ঠুকঠুক করে একমনে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক। পেছন থেকে নিজের নাম শুনে ফিরে তাকালেন। একটা বছর ত্রিশেকের ছোকরা পিছু ডেকেছে তাকে। ছিপছিপে চেহারা। মুখটা ভারি মোলায়েম। রিমলেস চশমা ঝুলছে

চোখে। আজকালকার খবরের কাগজের ছেলেগুলোকে এরকম বোকাসোকা গোছের দেখতে হয়।

‘হ্যাঁ বলুন...’ একটা আপাত তাচ্ছিল্যের স্বরেই বললেন কৌশিক ব্যানার্জি।

‘আমার নাম ইন্দ্রনীল ঘোষাল। তিরিশ বছর আগের একটা কেসের ব্যাপারে একটু দরকার ছিল আমার...’

‘আপনি সাংবাদিক?’ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন কৌশিকবাবু।

‘আজ্ঞে, ওইরকমই কিছু বলতে পারেন...’

‘বলতে পারি কি পারি না সেটা তোমার প্রশ্নেই বোঝা যাবে। কেস নম্বর আছে?’

‘আজ্ঞে তা আছে...’

‘তো থানায় গিয়ে খোঁজ করো...’ দৃশ্যতেই বিরক্ত হন ভদ্রলোক। আবার হাঁটতে শুরু করেন।

ছেলেটা তার পিছু নেয়, ‘তার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কেসটা এত ছোট করে লেখা আছে যে প্রায় কিছুই জানা যায় না, তাই ভাবলাম...’

‘ভাবলে তিরিশ বছর পরে এই সত্তরের বুড়োর মাথার ভেতর একটু উঁকি মেরে দেখি। বুদ্ধি বলিহারি তোমাদের। আমাদের সময়ে এসব ন্যালাখ্যাপা সাংবাদিক হত না। যাও, যাও...’

কথাটা বলে হাঁটার জোর বাড়াতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ। ছেলেটার মুখের দিকে চোখ পড়তে থেমে যান। খানিকটা মায়া লাগে তার। ভারী মিষ্টি মুখটা। কে জানে দূর থেকে কত আশা করে এসেছে। কতই বা মাইনে হবে এদের? খুব একটা বেশি বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া এই সুযোগে নিজের স্মৃতিশক্তিটাও একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।

পার্কেরই একটা বেঞ্চে বসে পড়েন ভদ্রলোক। লাঠিটা পাশে রেখে মুখের ঘাম মুছে বলেন, ‘বলো, কোন কেস?’

‘আজ্ঞে আপনি এই কেসে স্পেশাল এসপি ছিলেন। নির্মল মুখার্জি বলে এক ভদ্রলোক তার একমাত্র ছেলেকে একটি বিশেষ কায়দায় খুন করেন। প্রথমে মাথা ঘুরিয়ে...’

‘নির্মল মুখার্জি...’ ঝাপসা হয়ে যেন নামটা মনে পড়ে বৃদ্ধের, লাঠিটা

হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বলেন, 'মাথা ঘুরিয়ে ব্যাটের বাড়ি মেরে খুন, তাইতো? ভারি বিশ্রী ব্যাপার। আমি আমার পুলিশ জীবনে কোনও বাপকে এমন করে খুন করতে দেখিনি।'

ইন্দ্রনীল পকেটের ভিতরে রাখা ফোনের রেকর্ডিং বাটনটা অন করে দেয়, 'এক্স্যাক্টলি, আপনাদের কোনও সিরিয়াল কিলারের কথা মাথায় আসেনি?'

উপরে নিচে মাথা নাড়েন ভদ্রলোক, 'সেটাই সবার আগে মাথায় এসেছিল। ইনভেস্টিগেশন শুরু করার সময় আমরা একরকম নিশ্চিত ছিলাম যে বাইরে থেকে কোন আততায়ী এসে কাজটা করেছে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। বাড়ির দরজা জানলা, ঘরের ভিতরে কোনও ফোর্সড এন্ট্রি ছিল না। সে রাতে ওই বাড়িতে বাইরে থেকে কেউ আসেনি। বাবা-মা আর ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না...'

'কিন্তু নির্মল মুখার্জি নিজের ছেলেকে খুন করবেন কেন?'

ঠোঁট উল্টান ভদ্রলোক, 'সেটা আমরা বের করতে পারিনি। তবে ছেলেটা এমনিতেই অসুস্থ ছিল...'

'অসুস্থ! কীরকম?'

বৃদ্ধ স্মৃতি হাতড়ান, 'খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। ছোটবেলায় একবার গাছ থেকে পড়ে গেছিল। মাথায় চোট লাগে। ঘিলুতে আঘাত লেগে কীসব বিগড়ে গেছিল মাথায়। তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই পাগলামি করত। বাড়ি থেকে পালিয়ে যেত, ভাঙচুর করত, দিনের পর দিন এসব আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়? তাই হয়তো কোনদিন রাগের মাথায় নির্মলবাবু...'

'আর ওর মা?'

'মা...' ঝাপসা হয়ে আসা স্মৃতির হাঁড়িতে আবার হাতা ডোবান ভদ্রলোক, 'মায়ের বেশি ন্যাওটা ছিল ছেলেটা। মাও ভালোবাসত খুব। অবশ্য ভালোবাসবে নাই বা কেন, শান্তশিষ্ট, হাবগোবা ছেলে। পড়াশোনায়ও মন ছিল ভীষণ। আমি মনে হয়...'

ইন্দ্রনীল বুঝতে পারেন স্মৃতির সমুদ্রে পথ হারিয়েছেন বৃদ্ধ। সে প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে, 'আচ্ছা নির্মল মুখার্জি তো জেলে। ছেলেটি মৃত। ওর স্ত্রী কোথায় আপনি জানেন?'

মাথা নাড়ান বৃদ্ধ, 'উঁহু, তা বলতে পারব না। মহিলাকে আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম। তেমন কিছুই বলতে পারেননি। এতটাই শোকাহত ছিলেন যে মুখ খোলানোই যায়নি। জেলে থাকাকালীন স্বামীকে দু-একবার দেখতে এসেছিলেন। তারপর আর কোনও ট্রেস নেই...'

'ভদ্রলোকের বয়ানে একটা কবিতার উল্লেখ ছিল, মনে আছে আপনার?' ইন্দ্রনীল ঘোষাল উৎসাহী গলায় জিগেস করে।

'ছিল? কী জানি...' একটা বাঁকা হাসি খেলে বৃদ্ধের মুখে, 'কী জানো, ফাঁসির দড়ি গলার সামনে ঝুললে অনেক গল্প-কবিতাই বলে অপরাধীরা। আমরা ওসব অত মনে রাখি না...'

পরের প্রশ্নটা করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নেয় ইন্দ্রনীল। ভেবেচিন্তে শেষে করেই ফেলে প্রশ্নটা, 'আচ্ছা ধরুন আজ তিরিশ বছর পরে কেউ ওই একই কায়দায় খুন করতে চায় একটা বাচ্চা ছেলেকে। এমনকী হতে পারে মিস্টার মুখার্জি কিংবা তার স্ত্রী সিরিয়াল কিলার হয়ে ফিরে এসে...'

'কোন কাগজের সাংবাদিক বললে যেন?' ওর প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে কৌশিকবাবু...

'আজ্ঞে ইয়ে...' খাবি খায় ইন্দ্রনীল, 'অনলাইন পোর্টাল। ওই চটপটা নিউজ টাইপের...'

'চটপটা! সেটা আবার কী...' হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকান ভদ্রলোক, 'সত্যি করে বলো তো তুমি আদৌ সাংবাদিক না শখের উপন্যাস ফুপন্যাস লিখছ, অ্যাঁ? তিরিশ বছর পরে আবার সিরিয়াল কিলারের পিন্ডি পাকাতে এসেছ এখানে?'

বিপদ বুঝে উঠে পড়ে ইন্দ্রনীল। ওর কাঁচুমাচু মুখটা এখন আগের থেকে কিছুটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অপরিচিত কৌতূহলের কয়েকটা রেখা খেলা করছে মুখময়।

কিছু একটা ফুটে উঠতে গিয়েও উঠছে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দেয় সে। নাঃ ভালো করে আবার শুনতে হবে পুরোটা...

জানলার পাশটায় বসেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল স্বপ্নময়। মাঝরাতে ঘুমটা নিজে থেকে ভেঙে গেল। বন্ধ কাচের পাল্লা স্পর্শ করে আছে মাথাটা। উঠে বসে ও।

ইদানীং রাতে খুব একটা ভালো ঘুম হয় না স্বপ্নময়ের। মাথার ভেতরটা কেমন গুলিয়ে ওঠে বারবার। সারাক্ষণ মনে হয় আশপাশে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ বাড়ির সর্বত্র দৃষ্টি রেখে চলেছে। জানলার পাশে বসে সেসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল এতক্ষণ।

চোখ মুছে চারদিকে ভালো করে তাকায় সে। নীলচে রাতবাতির আলোয় ঘরটা আবছা দেখা যায়। একটু দূরে বিছানার উপর উল্টোদিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে রনি। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আর ডাকেনি।

দেওয়ালে ঝুলন্ত রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িতে রাত তিনটে বাজে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় স্বপ্নময়। তারপর রনির ঠিক পাশটায় এসে শুয়ে পড়ে। বড় করে নিঃশ্বাস নেয়। বাঁদিকে তাকিয়ে একবার হাত রাখে ঘুমন্ত রনির পিঠে। হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙে যায় রনির। সেও হাত বাড়িয়ে বাবার হাতের উপর হাত রাখে। খটকা লাগে স্বপ্নময়ের।

রনির হাতটা ভাঁজ হয়ে ওর হাতের উপর পড়ে আছে। যদি ও উল্টোদিকে মুখ করে শুয়ে থাকে তাহলে কিছুতেই ভাঁজ করে ওর হাতে হাত রাখা সম্ভব নয়।

ভালো করে সামনে থাকাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে স্বপ্নময়। রনি ওর উল্টোদিকে ফিরে নয়, ওর দিকে ফিরেই শুয়ে আছে। কেবল ওর মাথাটা ঘাড় ছেঁড়া পুতুলের মতো সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঘোরানো। এবং যন্ত্রের মতো একটু একটু করে সেটা ফিরছে স্বপ্নময়ের দিকে। ক্রমশ ছেলেটা সামনের দিকে মাথা ঘোরায়।

কিন্তু মুখ কোথায়? রক্ত, চোখ, মুখ, নাক দলা পাকিয়ে যাওয়া একটা মাংসপিণ্ড। সেই ঘেঁটে যাওয়া অদ্ভুত মুখে কেবল কয়েকটা দাঁতের সারি চিনে

নেওয়া যায়। ভালো করে তাকালে বোঝা যায় সে দাঁতের সারি হাসছে... কাঁপা কাঁপা স্বরে সেই মাংসপিণ্ড উচ্চারণ করে, 'বাবা, আমার খুব ভয় করছে বাবা...'

চিৎকার করে উঠতে ঘুমটা ভেঙে যায় স্বপ্নময়ের।

ওর চিৎকারে রনিও ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, 'কী হল বাবা? খারাপ স্বপ্ন দেখেছ?'

হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলের মুখের দিকে তাকায় স্বপ্নময়। তারপর ছিটকে সরে আসে বিছানা থেকে, 'তু... তুই...'

'আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বাবা... তোমার ডাকে...' একটু করুণ হাসি হাসে রনি। বিছানার উপর সোজা হয়ে বসতে বসতে বলে, 'আমার মতো তুমিও ভীতু হয়ে গেলে বাবা। বাপ ছেলেতে কী মিল বলো?'

একটা হাহাকারের স্রোত বিছানার উপর টেনে আনে স্বপ্নময়কে। ছেলেকে সজোরে বুকের মাঝখানে আঁকড়ে ধরে, 'আসলে আমার মাথাটা...'

'আমাকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে আনবে?' যেন ওকে সান্ত্বনা দিতেই নরম গলায় বলে রনি।

দু-হাতে মুখ মোছে স্বপ্নময়, 'এত রাতে?'

'ভালোই তো, কেউ দেখতে পাবে না যে আমি হাঁটতে পারি না।'

জামাটা গায়ে গলিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে অন্য হুইলচেয়ারে বসিয়ে বাইরে নিয়ে আসে স্বপ্নময়।

ওদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে। ঝিমঝিম করে একটা হাওয়া বইছে তার উপর দিয়ে। রাস্তার দু-দিকে সারবাঁধা ফ্ল্যাটবাড়ি অন্ধকারের চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

রাস্তার একধার দিয়ে হুইলচেয়ার ঠেলতে ঠেলতে স্বপ্নময় বলে, 'ভাবছি এই বাড়িতে আর থাকব না...'

'কেন?'

'কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে এখানে। আমরা দু-জনেই কেমন ভীতু হয়ে গেলাম।'

রনি কী যেন ভেবে বলে, 'আমার খালি মনে হয় জানো, ওই দরজাটার পেছনে অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগেও মনে হচ্ছিল...'

'তাই ঘর থেকে চলে এলি?'

'এই হাওয়াটা ভালো লাগে আমার। ভয়টা কমে যায়, তোমার কমে না?'

স্বপ্নময় কিছু উত্তর দেয় না। হাতের মৃদু চাপে হুইলচেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে।

'আমি আর ভালো হব না, তাই না বাবা?'

'কে বলেছে তোকে?' প্রতিবাদ করে স্বপ্নময়, 'এ সপ্তাহের রিপোর্টটা এখনও আসেনি। ওটা এলে তারপর...'

'মায়ের সঙ্গে এত ঝগড়া করো না তুমি। আগে তিনজনে কত হাসাহাসি করতাম মনে আছে? কী লাভ বলো তো?'

'তোকে এত কথা কে ভাবতে কে বলেছে? আর তোর মা-ই থাকতে চায়নি আমাদের সঙ্গে, আমি কাউকে কোথাও যেতে বলিনি।'

মুখে হাওয়া এসে লাগে রনির, 'আমি থাকতে দু-জনে একসঙ্গে হাসতে, না থাকলে একসঙ্গে কেঁদো, তাহলেই হবে...'

থেমে যায় স্বপ্নময়। ছেলের সামনে এসে দাঁড়ায়। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে ওর, 'মায়ের কাছে যাবি রনি? এক্ষুনি?'

রনি হাসে, ওর দিকে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'চলো ঘরে ফিরে যাই, আর হাওয়া ভালো লাগছে না...'

মাথা নামিয়ে আবার পিছনের দিকে সরে আসতে যাচ্ছিল স্বপ্নময়। থেমে যায়।

দূরে একটা অন্ধকার গলির ঠিক বাইরেটায় একটা মানুষের অবয়ব যেন কখন এসে দাঁড়িয়েছে। একপাশে জ্বলতে থাকা স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোটা এসে পড়েছে সেই অবয়বের মুখের উপর। লোকটার কপাল থেকে নাক অবধি ঢাকা একটা সাদাটে মুখোশে। কেবল ঘন কালো দুটো চোখ ফুটে আছে কোটর থেকে।

লোকটার হাতে ধরা একটা লম্বাটে গোছের লোহার খিল। সেটা মাথার উপর তুলে ধরে যেন হাওয়াতেই চালিয়ে দেয় লোকটা। মুখে একটা হাসি

ফুটে ওঠে তার। তারপর আঙুল তুলে ঠোঁটের সামনে রাখে। যেন ইশারায় চুপ করতে বলে স্বপ্নময়কে।

ভয়ে পা দুটো জমে গেছিল স্বপ্নময়ের। মাথার ভিতর সাহস ফিরে আসতেই সেদিক লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করে সে। মুহূর্তে যেন হাওয়াতেই মিলিয়ে যায় মুখোশে ঢাকা অবয়বটা... রাতের কুয়াশা গ্রাস করে নেয় তাকে।

স্বপ্নময় থমকে দাঁড়ায়। কয়েক সেকেন্ড সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে আসে রনির কাছে।

'কে ছিল বাবা?'

'কেউ না...' হাসার চেষ্টা করে স্বপ্নময়, 'তোর মতো আমিও অন্ধকারে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি...'

(৭)

দমবন্ধ করা অস্থিরতা চেপে ধরছে ইন্দ্রনীলকে। এই ক-দিনে আর তেমন যোগাযোগ করেনি স্বপ্নময়। সম্ভবত নিজের সমস্যার কিছু সমাধান যে ওর কাছে আছে, সেটা আর বিশ্বাস করে না সে।

সেদিন অমন হুট করে বাড়িতে ছুটে যাওয়ার পর ওকে একবার ফোন করেছিল ইন্দ্রনীল। বাড়িতে নাকি তেমন কিছুই ঘটেনি। আজ রনির টেস্টের রিপোর্ট আসার কথা, সেটার কী খবর হল সেটা জানতে ফোন করেছিল একবার। ফোন ধরেনি।

এই ক-দিনে নির্মল মুখার্জির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কয়েকবার করেছে ইন্দ্রনীল। কিন্তু উপায় করে উঠতে পারেনি। দু'এক জায়গায় চিঠি লিখেছিল। তার উত্তর আসার তেমন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

স্বপ্নময়ের বাড়ির আশপাশেও কয়েকবার ঘুরঘুর করেছে। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়েনি। বাড়ির বেশ কয়েক জায়গায় একটা সারভিলেন্স কোম্পানিকে দিয়ে সিসিটিভি বসিয়েছিল স্বপ্নময়। তারাও জানিয়েছে অস্বাভাবিক কিছুই ধরা পড়েনি তাতে। সবটাই হয়তো বাপ-ছেলের মনের ভুল। কিন্তু তাও কী যেন একটা ধাঁধা লেগে আছে ইন্দ্রনীল ঘোষালের মনে। ওর মন বলছে এই কেসের সবটা হ্যালুসিনেশন নয়...

স্টাডিরুমে বসে একগাদা কাগজপত্রের মধ্যে নিজেকে পাগল পাগল লাগছিল ওর। শেষে মাথাটা একটু হালকা করতে ল্যাপটপটা খুলে বসল। ফেসবুকে গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে স্ক্রল করল কয়েকবার। করতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলল। চটপটা নিউজের কয়েকটা উদ্ভট খবর ভাসছে স্ক্রিনে। খবরের নামটা দেখতেই মনে পড়ে গেল বুড়োর কথা।

মনে পড়তেই একবারের জন্য ভুরু কুঁচকে গেল ইন্দ্রনীল ঘোষালের। সেদিন বেঞ্চ থেকে উঠে আসার সময়ে বারবার মনে হচ্ছিল কোথায় একটা যেন গন্ডগোল আছে বুড়োর কথায়। তারপর আর ভেবে দেখা হয়নি...

ফোনটা বের করে রেকর্ডিংটা চালিয়ে টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল ইন্দ্রনীল। একটানা বলে চলেছেন বুড়ো। থেমে থেমে, ধীর অথচ ভরাট গলায়...

মাথায় চোট... পাগলামি, ভাঙচুর... ছেলের উপর রাগ, সেই থেকে...

হঠাৎ... ইন্দ্রনীলের মাথাটা টেবিলের উপরে সোজা হয়ে গেল। আবার প্রথম থেকে চালিয়ে শুনল সমস্তটা। তারপর আর একবার। হ্যাঁ, এতক্ষণে গন্ডগোলটা খেয়াল হয়েছে ওর।

অদ্ভুত ব্যাপার! বুড়ো একটাই বাচ্চার ব্যাপারে যে ইনফরমেশন দিচ্ছেন সেগুলো একটা আর একটার বিপরীত। মায়ের ন্যাওটা শান্তশিষ্ট ছেলে, অথচ ছেলেবেলায় গাছ থেকে পড়ে গেল! মাথায় চোট পেয়ে পাগলামি করা বিকারগ্রস্ত ছেলে, অথচ পড়াশোনায় ভীষণ ভালো। ঠিক যেন একই মানুষের দুটো সত্তা। অথবা...

অথবা উল্টোটা...

এক ঝটকায় উঠে বসল ইন্দ্রনীল। ওর চোখের সামনে আলো ফুটতে শুরু করেছে। নাঃ। মনস্থির করার আগে একবার যাচাই করে দেখতে হবে...

দ্রুত ফোনটা নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল ইন্দ্রনীল। কয়েকবার রিং হতে ওপাশ থেকে বৃদ্ধের গলা শোনা গেল, 'হ্যালো...'

'ইন্দ্রনীল ঘোষাল বলছি স্যার, সেদিন পার্কে কথা হচ্ছিল আপনার সঙ্গে, মনে আছে...'

'সেই চটপটা নিউজ? তুমি তো আচ্ছা ত্যাঁদড় ছেলে...'

'নির্মল মুখার্জির স্ত্রী তাঁর দুই ছেলের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসতেন?'

'ছোটটিকে, বললাম তো সেদিন। বড়টি গাছ থেকে পড়ে... সে পাগলাটে ছিল বলেই লোকে টোন-টিটকিরি কেটে...'

'বড় ছেলেটা এখন কোথায় আছে জানেন?'

'সে মনে হয় একটা অনাথ আশ্রমে ট্রান্সফার হয়েছিল। সেটার নাম আমি ভুলে গেছি, তবে যতদূর মনে পড়ছে...'

অনাথ আশ্রমের নামটা লিখে নিয়ে ফোনটা রেখে দেয় ইন্দ্রনীল। গুগলে টাইপ করে ফোন নম্বর জোগাড় করা অসুবিধের কিছু হবে না।

উৎসাহের আতিশয্যে টেবিলের উপরে চাপড় মারে। সেদিন মস্ত একটা ভুল করেছিল ও। কৌশিক ব্যানার্জির সঙ্গে কথা শুরু হবার সময় 'একমাত্র ছেলে' কথাটা অজান্তেই বলে ফেলেছিল। বুড়ো বয়সে স্মৃতি কিছুটা থাকলেও সে স্মৃতির উপর বিশ্বাস থাকে না। অবচেতনে যেটা সত্যি বলে জানতে পেরেছেন তার বাইরে কিছু ভাবতেই পারেননি বৃদ্ধ। তাঁর অবচেতন মন তাঁকে ভুলিয়ে দিয়েছিল যে নির্মল মুখার্জি, তাঁর স্ত্রী আর ছোট ছেলে ছাড়াও সেদিন ও বাড়িতে আরও একজন ছিল...

(৮)

ঘরে ঢুকে হাতের কাগজটা টেবিলের উপরে রাখে স্বপ্নময়। একগাল হাসে। তারপর এগিয়ে আসে রনির দিকে।

'ওটা কী গো? আমার রিপোর্ট?' উৎসাহী গলায় জিগেস করে রনি।

'চিন্তার কিছু নেই। ঠিক আছে সব...'

রনির মুখে হাসি ফুটতে গিয়েও ফোটে না, 'আজ দুপুরেও একটা ফোন এসেছিল, জানো?'

'ফোন?' জামাটা ছেড়ে হ্যাঙ্গারে ঝোলাতে ঝোলাতে বলে স্বপ্নময়, 'কী বলছে?'

'ওই কবিতাটা, ওটা শুনলে আমার খুব ভয় করে...'

ছেলের চুল ঘেঁটে দেয় স্বপ্নময়, 'ধুর ওটা একটা মামুলি কবিতা...'

'আর ওই যন্ত্রটা?'

'কোন যন্ত্র?'

'ওই যে ফুটোস্কোপ...'

বিছানার উপরে রনির ঠিক পেছন বসে পড়ে স্বপ্নময়, 'আমার কী মনে হয় জানিস, ফুটোস্কোপটা না কোনও যন্ত্র নয়। একটা মানুষ। তাহলেও দেখ, কবিতাটার মানে মিলে যাচ্ছে। একটা মানুষ যে অনেকটা ডাক্তারের মতো কাজ করে। কেবল তার চিকিৎসার ধরনটা আলাদা...'

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না বাবা...'

'ডাক্তার বলেছে তুই আর ঠিক হবি না। ছ-মাসের মধ্যেই...'

রনি ঘুরে তাকায় ওর বাবার দিকে। দু-চোখে সমস্ত অভিব্যক্তি উধাও হয়েছে তার। বাবার শরীর বেয়ে ওর দৃষ্টি নেমে আসে হাতের দিকে। ও চমকে যায়।

বাবার হাতের পাশে একটা মোটা লোহার খিল। একটা হাত ওর মাথায়—অন্য হাতটা সেই খিলের উপর খুব ধীরে ধীরে বোলাচ্ছে স্বপ্নময়...

(৯)

'হ্যালো! বকুল বিশ্বাস বলছেন?'

অন্যদিন ফোনটা সাইলেন্ট করেই শোয় বকুল। আজ কী যেন কারণে করতে ভুলে গেছিল। রাত একটার দিকে সেটা বেজে উঠতেই কেটে দিতে যাচ্ছিল। শেষে দোনোমন করে ধরেই ফেলে—

'হ্যাঁ, কে বলুন তো?'

'আপনার হাসব্যান্ড এখন...'

বিরক্ত হয়ে একবার মাথার চুল খামচে ধরে বকুল, 'দেখুন আমার হাসব্যান্ডের সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। ওনাকে যোগাযোগ করতে চাইলে...'

'ওনার ফোন বন্ধ...'

'ঘুমাচ্ছেন হয়তো। কাল সকালে করবেন...'

ফোনের ওপাশের লোকটা ওকে কথার মাঝেই থামিয়ে দেয়, 'না সেটা সম্ভব নয় ম্যাম। আমার মনে হচ্ছে আজ রাতেই উনি একটা অঘটন ঘটাতে

চলেছেন। পুলিশকে আমি জানিয়েছি, কিন্তু ওরা পৌঁছতে পৌঁছতে... আর ওদেরকে আপনার থেকে ভালো কেউ চেনে না। আপনি প্লিজ নিচে নেমে আসুন।'

'মানে? আপনি আমার বাড়ির নিচে?' বকুলের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

'হ্যাঁ, গাড়িতে আছি। আপনি তাড়াতাড়ি আসুন...'

'ওয়াট দ্য হেল! কে আপনি?'

'উনি একটা হেল্পের জন্যও আমার কাছে এসেছিলেন। আমি সব বলব আপনাকে। কিন্তু প্লিজ এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ুন। মিস বিশ্বাস আপনার ছেলের ভীষণ বিপদ, যে কোনও মুহূর্তে...'

'কী হয়েছে ওর?'

আর অপেক্ষা করে না বকুল। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গাড়িটা সত্যি দেখতে পায়। ওর পায়ের তলায় যেন লাভা ঢেলে দিয়েছে কেউ। কোনওরকমে ফ্ল্যাটের তালাটা লাগিয়ে লিফটে নিচে নেমে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে এসে বসে ও।

'কী হয়েছে রনির?' ইন্দ্রনীল ঘোষালের গাড়ির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠতেই ওর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় বকুল।

'এখনও কিছু হয়েছে কি না জানি না। কিন্তু উই ক্যান্ট টেক রিস্ক...'

'আমি কিছুই...'

'বলছি...' গভীর রাতে ফাঁকা বাইপাসের রাস্তার উপর গাড়ি চালাতে চালাতে ইন্দ্রনীল বলতে শুরু করে, 'আপনার এক্স হাসব্যান্ড স্বপ্নময় ঘোষ যে অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড সেটা আপনি জানতেন?'

'হ্যাঁ, ও নিজেই বলেছিল আমাকে। বারো বছর বয়সে একটা অনাথ আশ্রম থেকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছিল ওকে...'

'বারো বছর। মানে ততদিনে কিশোর বলাই যায়। ওর আগের মা-বাবার কথা আপনার কাছে বলেনি কোনওদিন?'

'না, ওর নাকি ওসব কথা কিছু মনে ছিল না...'

স্টিয়ারিং-এর উপর একটা চাপড় মারে ইন্দ্রনীল। বকুল ব্যস্ত হয়ে ওঠে,

'কিন্তু আপনি বলতে কী চাইছেন? ওর মা-বাবার সঙ্গে আমার ছেলের কী সম্পর্ক!'

কথাটায় কান দেয় না ইন্দ্রনীল, 'মিস্টার ঘোষের বায়োলজিক্যাল ফাদার নির্মল মুখার্জি। ভদ্রলোক আপাতত নিজের ছেলেকে মাথা ফাটিয়ে খুন করার দায়ে জেলে আছেন...'

'নিজের ছেলেকে খুন করার দায়ে... মানে ওরা দুই ভাই?'

'একজনের ডাক নাম পার্থ, অন্যজনের বাবান...' সামনে লম্বা রাস্তা পড়ে আছে, গাড়ির স্পিড আরও এক ধাপ বাড়িয়ে ধীর গলায় বলতে শুরু করে ইন্দ্রনীল, 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কথা। পার্থ আর বাবান দুই ভাই। বয়সের পার্থক্য বছর খানেকের। ছোটবেলায় বড় ভাই বাবান একবার ছাদ থেকে পড়ে গেছিল। সেখান থেকে মাথায় চোট। কোনওরকমে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে সে ফিরে আসে। ডাক্তার বলেছিল অন্য কোনও সমস্যা না থাকলেও থেকে থেকে কিছু পাগলামি জেগে উঠতে পারে তার। বাবা-মা অবশ্য কোনওদিন তেমন কিছু লক্ষ করেননি। অন্তত যে রাতের কথা বলতে চলেছি তার আগে অবধি।

এই মাথায় চোটের জন্যই কি না জানি না ছোট থেকে বাবান একটু বোকাসোকা গোছের। কোনও জিনিসই সহজে তার মাথায় ঢোকে না। বাড়ি ফেরার রাস্তা ভুলে যায়, নামতা ভুলে যায়, কখনও টাকার বান্ডিল রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে আসে। ফলে বাবা-মা এমনকী পাড়ার লোকজনের কাছে পদে-পদে অপমানিত অপদস্থ হয় সে। দিনের পর দিন সেই অপমানের যন্ত্রণা তার অসুস্থ মাথার মধ্যে জমা হতে থাকে।

অপরদিকে তারই ভাই পার্থ শান্তশিষ্ট। পড়াশোনায় তার জুড়ি নেই। বছর বছর আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট। মা-বাবার আদরের ছেলে সে। এই সমস্তটা বাবানের মনের ভিতরের অন্ধকারটা আরও বাড়িয়ে তোলে। 'ভাইকে দেখ, কী চমৎকার বুদ্ধি... আর তুই...' কিংবা 'ওর মাথা এত পরিষ্কার, তোর মাথায় কী গোবর পোরা? হ্যাঁ?'

দিনের পর দিন এই জমতে থাকা অপমানের বারুদের স্তূপের উপর আগুন পড়ে। মানসিক বিকারগ্রস্ত ছেলেটার মাথার ভিতরে কেউ বলে দেয় ভাইয়ের

মাথা খুলে দেখতে হবে ওর ভিতরে সত্যি এমন কী আছে যা ওর মাথায় নেই। তারপর একদিন রাতে সুযোগ বুঝে...'

'মানে স্বপ্নময় ওর নিজের ভাইকে...'

'মাথা ঘুরিয়ে, তারপর ব্যাটের বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দেয়। বাবা নির্মল মুখার্জি ঘরের ভিতরে ঢুকে সবই দেখতে পান। প্রথমে সমস্ত সত্যি বলতে শুরু করলেও শেষে ওইটুকু ছেলেকে বাঁচাতে তিনি দোষ নিজের ঘাড়ে নেন। তবে এ ঘটনার মূল দোষী বাবানও নয়। আসল দোষ ফুটোস্কোপের...'

'সেটা কী? কোনও যন্ত্র?'

'এই সমস্ত ঘটনার পরে একটা অরফ্যানেজে পাঠানো হয় বাবানকে। এত মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে বলে দীর্ঘদিন তার মাথার চিকিৎসা চলে। সেখানকার সাইকায়াট্রিস্ট কিছুদিন পরেই বুঝতে পারেন সত্যিটা। ছোটবেলার আঘাত, ক্রমাগত অপমান, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা বাবানের মাথার ভিতর একটা নতুন আইডেন্টিটির জন্ম দিয়েছে। ছোটবেলায় পড়া একটা ছোটদের কবিতা থেকে নেওয়া একটা শব্দ — ফুটোস্কোপ!'

'সেটা কী?'

'কবিতা অনুযায়ী একটা যন্ত্র। যেটা দিয়ে মানুষের মাথাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে সেটা যন্ত্র নয়, মানুষ। আপনার এক্স হাসব্যান্ডের দুটো পারসোনালিটির একটা। কাজ সেই যন্ত্রটার মতোই। সে সময়ে সময় জেগে ওঠে, তার একমাত্র কাজ মানুষের মাথা ফাটিয়ে তার ভিতরটা বিশ্লেষণ করা। ডিসঅ্যাসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসর্ডারের ফলে এই সমস্ত ঘটনা আপনার স্বামী ভুলে যায়। কিন্তু ফুটোস্কোপ মনে রাখে। এত বছর ধরে...'

'কিন্তু আপনি হঠাৎ এসব কথা আমায় বলছেন কেন?'

'কারণ সে আবার জেগে উঠেছে। তার এবারের ভিক্টিম আপনার ছেলে রনি, মিস বিশ্বাস...'

'কিন্তু স্বপ্নময় নিজের ছেলেকে হিংসা করবে কেন? ও তো অসুস্থ...'

'হিংসা নয়। ভেবে দেখুন মিস বিশ্বাস, রনির আসন্ন মৃত্যুটা স্বপ্নময়কে দিনরাত যন্ত্রণা দেয়। কিছুতেই সত্যিটা মানিয়ে নিতে পারে না সে। এই ইমোশনালি ভালনারেবল স্টেট তার ভিতরে অস্থিরতা জন্ম দেয়। পারকিনসন

মূলত সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, আই মিন মাথার রোগ। কী এমন আছে রনির মাথার ভিতরে যা এতটা কষ্ট দিচ্ছে ওকে? মিস্টার ঘোষের অবচেতনে ফুটোস্কোপ আবার জেগে ওঠে, মাথা ফাটিয়ে দেখতেই হবে কিসের এত সমস্যা?

এবার সে জেগে উঠেছে হিংসা থেকে নয়, বরঞ্চ সন্তান স্নেহ থেকে, ভালোবাসা থেকে। আর সেই ভালোবাসার উপর চরম আঘাতটা এসেছে আজ। ফলে ফুটোস্কোপ আজই আঘাত হানবে...'

'মানে?'

'আজ সন্ধায় আপনার ছেলের ডিজিটির রিপোর্ট এসেছে। অ্যান্ড হি হ্যাজ ফিউ ডেজ লেফট...'

(১০)

'ভয়ের কিছু নেই রনি, আমি শুধু তোর মাথার ভিতরটা দেখব, কীসের এত রোগ, আয় আমার কাছে...'

ছেলেটা এখনও চুপ করে চেয়ে আছে ওর দিকে। মুখে তেমন কোনও অভিব্যক্তি নেই। বাবাকে অনেকক্ষণ থেকেই অচেনা লাগছে ওর। ইচ্ছা করে হুইলচেয়ার থেকে নেমে কোথাও একটা ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু সে উপায় নেই। নিজের অক্ষম পা দুটোকে নিয়ে ভীষণ অসহায় লাগে ওর।

বাবার পাশে পুরনো খিলটা পড়ে আছে এখনও। ধীরে ধীরে ওর ঘাড়ের পেছন দিকটায় হাত বুলাচ্ছে বাবা।

'আয় দেখি কোন্ ফাঁক দিয়ে, মগজেতে ফুটো তোর কোথা।' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে চলেছে। এমন অদ্ভুত হিলহিলে স্বর বাবার মুখ থেকে বেরতে পারে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না রনি। তার করুণ গলা শোনা যায়, 'আমার খুব ভয় করছে বাবা... তুমি এরকম করে...'

'আমারও করে, খুব ভয় করে। তোকে নিয়ে, তুই ছাড়া আর কে আছে আমার বল? তুইও যদি মরে যাস...'

কী অদ্ভুত গলায় কথা বলছে বাবা! বয়স্ক মহিলাদের মতো স্বর। শুনলেই বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়।

কোলে করে রনিকে তুলে নিয়ে বিছানার উপরে বসিয়ে দেয় স্বপ্নময়। মুচকি হাসি হাসে। তারপর কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ভাঙা খিলটা হাতে তুলে নেয়।

'তুমি আমাকে মারবে বাবা?' এতক্ষণে কী হতে চলেছে খানিকটা বুঝতে পেরেছে রনি।

'উঁহু, আমি না। রোগ। তোর মাথার ভিতরের রোগটা। আমি শুধু ওটাকে...' খিলটা মাথার উপর তুলে ধরে স্বপ্নময়। ওর চোখে একটা শয়তানি হাসি উপচে পড়ছে, 'চোখ বন্ধ কর। তোর সব ব্যথা কমে যাবে রনি...'

এক্ষুনি খিলটা এসে পড়বে ওর মাথার উপরে। কিংবা মাথাটা ঘুরে যাবে পেছনের দিকে।

রনি চোখ বন্ধ করে না। হাওয়ায় উত্থিত খিলের দিক থেকে তার দৃষ্টি ঘুরে যায় দরজার দিকে। বিড়বিড় করে মৃদু স্বরে বলে, 'ওখানে কে দাঁড়িয়ে আছে বাবা... দরজার পেছনের অন্ধকারে...'

বিরক্ত হয় স্বপ্নময়, উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে, 'কেউ দাঁড়িয়ে নেই। তুই চোখ বন্ধ কর...'

'ওই তো দাঁড়িয়ে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তো..'

রাগ ওঠে স্বপ্নময়ের, চিৎকার করে ওঠে, 'কে দাঁড়িয়ে আছে?'

'আমার বাবা...' তেমনই ফিসফিসে স্বরে বলে রনি। মুখে হাসির রেখা খেলে যায় তার, 'ভয় দেখাচ্ছে না। খেয়াল রাখছে আমার। বাবা...'

দুটো হাত সেই অন্ধকারের দিকে বাড়িয়ে দেয় রনি। যেন কোলে উঠতে চায়। অবাক হয়ে সেই জমাট অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে স্বপ্নময়।

রনি হাতের উপর ভর দিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে। তারপর শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় সেই অন্ধকারের দিকে। চোখে ভয় নেই ওর। ও জানে ওর বাবা কোনও ক্ষতি হতে দেবে না। রক্ষা করবে ওকে, সেই বাবা যে এতদিন প্রাণ দিয়ে সাহস দিয়েছে ওকে। মায়ের অভাব অনুভব করতে দেয়নি। শত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও ছোট পাখির মতো আগলে রেখেছে।

অক্ষম পা দুটো ডানাছেঁড়া দেবদূতের মতো মাটির উপরে টানতে টানতে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে যায় রনি। স্বপ্নময় খিল হাতে চেয়ে থাকে হামাগুড়ি

দিতে থাকা ছেলেটার দিকে।

অন্ধকারের সামনে গিয়ে মুখ তোলে রনি। কাতর চোখে তাকায় সেদিকে। কাকে যেন খুঁজছে। বিড়বিড় করে ডাকে, 'বাবা, আমি জানি তুমি আছ। আমাকে বাঁচিয়ে নাও বাবা... বাবা...'

রনির ডাক কান্নায় পরিণত হয়। অন্ধকারটাও যেন কেঁপে ওঠে সেই কান্নায়।

সে জানে বাবা ওই অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। লক্ষ রাখছে ওর দিকে। ঠিক বাঁচিয়ে নেবে ওকে...

'বাবা, ও বাবা, শুনছ...' অসম্ভব বিশ্বাসে ডেকে চলেছে রনি।

কিছুক্ষণ সেদিকে অপলক চোখে চেয়ে থাকে স্বপ্নময়। খিলের উপরে ওর হাতের জোর আরও শক্ত হয়। মুহূর্তে সেটা নেমে আসে নিজের মাথার উপরে। গায়ের সমস্ত জোর একত্রে করে নিজের মাথায় খিলটা দিয়ে আঘাত করেছে স্বপ্নময়।

পেছন ফিরে সেদিকে চেয়ে চিৎকার করে ওঠে রনি। স্বপ্নময়ের শরীরটা লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। মাথার পেছন থেকে বেরিয়ে আসা সরু রক্তের ধারা গাঢ় হতে থাকে।

দরজায় ধাক্কা পড়ে পরপর। বাইরে থেকে মায়ের গলার চিৎকার শুনতে পায় রনি। সঙ্গে পুলিশের হাঁকডাক। ক্রমশ সে ডাক ওর কানের ভিতরে হারিয়ে যায়। মাথাটা নুয়ে পড়ে ওর বুকের ভিতরে...

(১১)

হাতের ধাক্কায় দরজাটা ভেঙে ফেলার উপক্রম হতে একটা মিহি শব্দ করে ভিতর থেকে খুলে যায় সেটা। রক্তের গন্ধ আসে ওদের নাকে। একটা দমবন্ধ করা হাওয়া যেন ভয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে আসেন নির্মল আর তন্দ্রিমা মুখার্জি। ঢুকেই আর্ত চিৎকার করে মেঝের উপরে বসে পড়েন।

একদিকে মেঝের উপরে পড়ে আছে ছোট ছেলে পার্থর দেহটা। মাথাটা উল্টোদিকে ঘোরানো। মাথার পেছনদিকটা থেঁতলানো। রক্ত আর ঘিলু বেরিয়ে মাটিতে মিশছে...

দরজার ঠিক পাশেই বসে আছে বাবান। হাতে ওর নিজেরই ব্যাটটা। তাতেও রক্ত আর গলন্ত ঘিলুর দাগ। ধীরে ধীরে ব্যাটটা মাটির উপরে নামিয়ে রাখে সে। বাপ-মায়ের দিকে চেয়ে ধীর গলায় বলে, 'দেখো বাবা, ওর মাথায় ওসব কিচ্ছু নেই, শুধু রক্ত আর... রক্ত...'

আকাশ কাঁপিয়ে চিৎকার করে কাঁদছেন দম্পতি। বমি করে ফেললেন হড়হড়িয়ে। দেওয়ালগুলো যেন এখুনি ফেটে যাবে।

বাবার দিকে এগিয়ে আসে বাবান, 'কে করল বলো তো এরকম? ওর মাথাটা এমন করে...'

'তোকে জন্মের সময়েই মেরে ফেললাম না কেন আমরা?' সজোরে লাথি খেয়ে ঘরের একদিকে ছিটকে পড়ে বাবান। মাথাটা সশব্দে ঠুকে যায় দেওয়ালে। গুলিয়ে ওঠে ভিতরটা...

অসহায় চোখে ঘরের ভিতরটা দেখে বাবান। কোথাও কেউ নেই যে ওকে উত্তর দেবে। যে ওকে বোঝাবে। এই লোকগুলো শুধু মারে আর ঠাট্টা করে, অপমান করে, কোথা থেকে কী হয়ে গেল ও নিজেই বুঝতে পারছে না। ভাইটাও অমন করে পড়ে আছে...

কোথাও কি কেউ নেই?

অসহায়ের মতো ঘরের ভিতরে তাকায় বাবান। দরজার পেছনে অন্ধকার জমে আছে। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে কেউ?

অপমান অপদস্থ হয়ে বিছানার উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে খুঁজেছে ওখানে, মাকে, অসহায়ের মতো যাকে পেরেছে খুঁজেছে ওই অন্ধকারে, কাউকে পায়নি...

এখন কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা লোককে দেখতে পেল। একটা নাক অবধি মুখোশে ঢাকা লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার পেছনের অন্ধকারে। চোখদুটো ঘন কালো। হাতে ভারী কী যেন একটা। লোকটা ঠোঁটের সামনে আঙুল এনে ইশারায় চুপ করতে বলল ওকে। বিড়বিড় করে একটা মজার কবিতা বলছে লোকটা...

হাসি মুখে সেই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল ছেলেটা...

মোদের বাড়ি এসো

বেলা একটা নাগাদ পানবিড়ির দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল ইনোভা গাড়িটা। ঘন কাচের জানলাটা নেমে এল ধীরে ধীরে। মুখ বাড়িয়ে শৈলেন জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, পুষ্পরানি লাহিড়ীর বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?'

দোকানের লোকটা কেটলি থেকে চা ঢালছিল। সে কোনও উত্তর দিল না। তার বদলে সামনের বেঞ্চে বসে থাকা একটা বয়স্ক-গোছের একটা লোক মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'ওই তো, এই গলির শেষে ডানহাতের লালবাড়ি। কার কাছে যাবেন? পুষ্পরানি তো...'

'মারা গেছেন, জানি। ওনার ভাড়াটের সঙ্গে একটু দরকার ছিল...' শৈলেন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফোনটা দেখতে দেখতে বলে।

লোকটা একটু অবাকই হয়। এত বছর কেটে গেল, পুষ্পরানির ভাড়াটের সঙ্গে দেখা করতে প্রায় কেউই আসেনি। এক ডাক্তার বদ্যি ছাড়া।

'আপনি পুষ্পরানিকে চিনতেন নাকি?'

গাড়ির কাচ নিজে থেকেই উঠে আসে। মানুষটার মুখ ঢেকে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে গাড়ির ভেতর থেকে শোনা যায়, 'আমার মা...'

* * *

ডানদিকে চোখ রেখে আরও কিছুটা গাড়ি এগিয়ে নিয়ে আসে শৈলেন। এ রাস্তাটায় ও আগে কখনও আসেনি। আসার কথাও নয়। দেশ ছেড়েছে বছরকুড়ি হতে চলল। তার আগে পড়াশোনা ব্যাঙ্গালোরে। কলকাতার আশপাশে ঘোরাঘুরি ওর জীবনে তেমন হয়নি।

খানিক এগোতে চোখে পড়ে বাড়িটা। সামনে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়িটা পার্ক করাতেই মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে ওর। ওয়াটসঅ্যাপে কল আসছে। বিদেশ থেকে। সেটা কানে ধরে শৈলেন, 'পৌঁছে গেছিস?'

'দরজার সামনে...'

'তুই পরশু ফিরছিস তো? শিওর?'

'ইচ্ছা তো তাই আছে... নাও ফিরতে পারি...'

'ওয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? দেখ, তোর পাগলামি করার ইচ্ছা হয়েছে, কর। বাট একটা লিমিট রেখে, এসব কী বালখিল্য?'

উত্তর দেয় না শৈলেন। চুপ করে থাকে। ওপাশ থেকে আবার প্রশ্ন ভেসে আসে, 'ওখানে লোকাল কাউকে চিনিস?'

'অলমোস্ট চিনি না। পঁচিশ বছর হয়ে গেল এদের সঙ্গে কোনও কন্ট্যাক্ট নেই। ওয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট?'

'অ্যাড্রেসটা ঠিকঠিক আছে তো?'

'আই হোপ সো। বছরখানেক আগে একটা মেইল এসেছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করেছি। সেখানে যদি আর কেউ না থেকেও থাকে, অন্তত কিছু তো ট্রেস করা যাবে...'

'আর বুড়িরা যদি এতদিনে মরে গিয়ে থাকে?'

এতক্ষণে বিরক্ত হয় শৈলেন, 'তুই চাসটা কী শুভ?'

'নাথিং, ইটস ইয়োর মানি টু লুজ। শুধু যা পাগলামো করার করে তুই পরশু ফিরে আয়। ফারদার মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার তোর শৈলেন...'

ফোনটা রাখতেই সামনের আয়নায় নিজের মুখের দিকে চোখ পড়ে যায় শৈলেনের। চোখের তলায় পুরু কালির ছাপ। কোটরে ঢুকে গেছে। গাড়ি চালাতে চালাতে বেশ কয়েকবার ঝিমিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেছে ঘুমটা। এরকমটা হবে তা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিল শুভময়। সেইজন্যই প্রতি দশমিনিট অন্তর ফোন করেছে ওয়াটসঅ্যাপে। এখানে এসে ড্রাইভারও নিতে বলেছিল। কিন্তু শৈলেন রাজি হয়নি। ওর এখানের এক বন্ধুর গাড়ি এয়ারপোর্টে ছিল। নিজেই সেখান থেকে ড্রাইভ করে এসেছে এতদুর।

দোতলা লালচে রঙের বাড়ি। পুরনো কলকাতার রাস্তাঘাটে এমন জরাজীর্ণ বাড়ি হামেশাই দেখা যায়। দোতলায় ভাড়াটে রাখা হয়েছে। সে টাকাতেই একতলার মালিকদের সংসার চলে। বাড়িটার দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় অন্তত বছর কুড়ি এ বাড়ির কোনও সংস্কার হয়নি। উপরের বারান্দা ঘেঁষে কয়েকটা পুরনো শাড়ি ঝুলছে। একদিকে দেয়াল খেয়ে ফেলেছে গাছের এগিয়ে আসা গুঁড়ি। ভাঙা জানলার গ্রিলে মরচে ধরেছে। রাস্তা থেকে কয়েকধাপ সিঁড়ি উঠলে একটা ঘুণে খাওয়া সবুজ কাঠের দরজা। তাতে একটা আংটা ঝুলছে।

উপরে উঠে তাতেই কড়া নাড়ে শৈলেন। সজোরে বারদুয়েক কড়া ঝাঁকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে।

প্রায় আধমিনিট পরে ঝনাৎ শব্দ করে খুলে যায় দরজাটা। বছর পঁয়ত্রিশের এক মহিলা বেরিয়ে এসে ওর দিকে মুখ তুলে তাকায়। তারপর বাইরে পার্ক করা ইনোভা গাড়িটার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। জিজ্ঞাসু গলায় বলে, ‘কী ব্যাপার?’

‘এটা পুষ্পরানি লাহিড়ীর বাড়ি তো?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু আপনি...’

‘আমি ওনার ছেলে হই। আমার নাম শৈলেন লাহিড়ী...’

মহিলার মুখে আচমকাই একটা আশঙ্কার ছায়া নামল, যেন এরকম একটা সকাল আসবে সে আগে থেকেই জানত। সরু গলার মাঝখানে গলকণ্ঠটা একবার ওঠানামা করল, ‘আপনি বিদেশে থাকেন?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই এসে পৌঁছেছি। পরশু আবার রিটার্ন ফ্লাইট...’ মানিব্যাগ থেকে পাসপোর্ট বের করে মহিলার সামনে মেলে ধরে শৈলেন, ‘এই যে, নাম... মায়ের নাম... আর...’

‘লাগবে না...’ হাত নাড়ে মহিলা, ‘আপনার ছেলেবেলার ছবি দেখেছি আমি। কিন্তু আইনের ব্যাপার-স্যাপার হলে... আপনার মা তো...’

‘জানি, আমি একটা কাজে এসেছি। একটা দরকারে...’

‘কী দরকার?’ মহিলার গলার স্বরে সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

এবার ঘাড় সোজা করে হাসে শৈলেন, 'সব বলছি, একটু ভেতরে আসতে দেবেন?'

এতক্ষণে যেন মহিলার সৌজন্যবোধ ফিরে আসে, লজ্জিত মুখে দরজা থেকে সরতে সরতে বলে, 'হ্যাঁ, আসুন না। আপনারই তো বাড়ি...'

ভেতরে ঢুকে আসেন শৈলেন। বাড়ির ভেতরটা বাইরের থেকে আরও বেশি রংচটা। আলো ভীষণ রকম কম। সেটা সম্ভবত ইলেকট্রিসিটি বিল কমানোর জন্য। রাস্তার দিকের একটা খোলা জানলা দিয়ে পাতলা সূর্যের আলো আসছে।

তবে একতলার ডাইনিংটা বেশ বড়। তার বেশিটাই হাবিজাবি আবর্জনা আর ভাঙা আসবাবে ঢাকা পড়ে গেছে। সিমেন্টের মেঝে। দড়ি থেকে গামছা আর নাইটি ঝুলছে। একদিকে কিছু বাসনকোসন জমা করে রাখা। বাসন মাজা সাবানের ঘ্যানঘ্যানে গন্ধ আসছে সেখান থেকে। সম্ভবত এতক্ষণ দুপুরের বাসন মাজছিলেন মহিলা। তার দিকে একবার আড়চোখে দেখে নেয় শৈলেন। ছিপছিপে চেহারা। পরনে একটা রংচটা নাইটি। মাথার চুল উসকোখুসকো। গলার কাছে কণ্ঠার হাড় দৃশ্যমান।

তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের ভিতরে তাকায় শৈলেন। একদিকে দুটো পাশাপাশি ঘরের দরজা। তার মধ্যে একটা বন্ধ, অন্যটা খোলা। খোলা ঘরের মধ্যে একটা মশারি টাঙানো বিছানা দেখা যাচ্ছে। তার ভেতর কে শুয়ে আছে বোঝার উপায় নেই।

বাইরে একটা কাঠের চেয়ারের উপর জামাকাপড় ডাঁই করে রাখা ছিল। সেগুলো সরাতে সরাতে চেয়ারটা দেখিয়ে মহিলা বলল, 'আপনি চা খাবেন?'

দু-দিকে মাথা নাড়ে শৈলেন। চেয়ারের উপরে বসতে বসতে বলে, 'বুঝতে পারছি আপনি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছেন। চিন্তা করবেন না। আমি এ বাড়ির দখল নিতে আসিনি। আমার দরকারটা আসলে...'

মহিলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এই প্রথম মুখে হাসি ফোটে তার, উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলে, 'হ্যাঁ, বলুন কী দরকার?'

ইতস্তত করে শৈলেন, 'দরকারটা এতটাই পিকিউলিয়ার যে ঠিক কীভাবে

বলব...' উত্তরটা দেওয়ার হাত থেকে যেন আপাতত পালাতে চায় শৈলেন, খোলা দরজাটার দিকে আঙুল তুলে দেখায়, তারপর বলে, 'রুনিমাসি আর টুনিমাসি কি ওই ঘরে?'

নামগুলো শুনে একটু চমকায় মহিলা। ভুরুটা ভাঁজ খায় তার। জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ। আমি ওদের দেখাশোনা করি...'

'ওদের শরীর কেমন আছে?'

'ছোট মাসি, মানে রুনিমাসির শরীর একেবারেই ভালো নয়। ক্যানসার হয়েছে। ফাইনাল স্টেজ। টুনিমাসিরও অবস্থা ভালো নয়। স্মৃতিটা পুরোই নষ্ট হয়ে গেছে। আমাকেই মাঝে মাঝে চিনতে পারে না। মাসখানেক হল উঠতে পারে না বিছানা থেকে। আর রাতের দিকটায়...'

ঘরের দিকে আরেকবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় শৈলেন। মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। মহিলা বলে, 'বিছানা থেকে উঠতে পারে না দু-জনেই। আমি কোলে করে বাথরুম অবধি নিয়ে যাই। না নিয়ে যেতে পারলে...'

'আপনি বয়ে নিয়ে যেতে পারেন? মানে একটা আস্ত মানুষকে কোলে করে...'

মহিলা বাঁকা হাসি হাসে, ঝকঝকে দাঁতের শাড়ি দেখা যায় তার, 'চেহারা দেখে মনে হয় না, তাইতো? আপনি ওদের যখন দেখেছিলেন সেরকম চেহারা তো নেই, অসুবিধা হয় না। ভালো কথা, আপনার দরকারটা...'

শৈলেন বুঝতে পারে মহিলার কথাবার্তায় শিক্ষার ছাপ আছে। মা সম্ভবত লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন তাকে। তবে পেটে শিক্ষা আছে বলেই বোধহয় কথাবার্তা কেমন ঝাঁঝালো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শৈলেনকে বিদায় করে দিতে পারলেই সে খুশি।

একবার গলা খাঁকারি দেয় শৈলেন। তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বলে, 'আসলে কিছুদিন আগে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। একটা বছর চারেকের ছেলে ছিল, তারও কাস্টডি পাইনি। মাসখানেক আগে ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে গেছিলাম। আমার হাতটা ধরেই ছিল। এমন সময়...'

শৈলেনের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে মহিলা আর প্রশ্ন করতে

ভরসা পায় না, মুখ নামিয়ে নেয়। শৈলেন নিজেই বলে, 'গাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছিল ও। উল্টোদিক থেকে একটা ট্রাক এসে... স্পট ডেথ। আমার চোখের সামনেই।'

ঘরের বাতাস ভারীই ছিল। এখন একটা বিষণ্ণতার গন্ধ এসে মেশে তাতে। সেটা লঘু করতেই একটা নরম হাসি হাসে শৈলেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন এসব কথা আপনাকে কেন বলছি আমি, আসলে... আমার প্রয়োজনটা না বুঝলে...'

'বলুন...' এককথায় উত্তর দেয় মহিলা।

একটা হাতের উপর অন্য হাত দিয়ে আঁচড় কাটে শৈলেন, 'আসলে নিজের চোখে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছি তো, চোখ বন্ধ করলেই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ফলে মাসখানেক হল একটা রোগ হয়েছে— ইন্সোমনিয়া...'

'সেটা কী?' মহিলা উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে।

'না ঘুমানোর রোগ। আজ এক মাস হয়ে গেল আমি ঘুমাইনি। মেন্টাল ট্রমা তো আছেই, সেই সঙ্গে দীর্ঘদিনের ডিপ্রেশন, একাকীত্ব। এ বাড়িতে ঢোকার আগেই আমার সাইকায়াট্রিস্ট ফোন করেছিল, সে বলছে...'

মহিলা এতক্ষণে সমস্যাটা বুঝতে পারে। এ ঘরে আলো কম বলে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বাইরে লোকটাকে দেখেই ঝটকা লেগেছিল ওর। যেন চামচ দিয়ে চোখের কাছটা আইসক্রিমের মতো তুলে নিয়ে সেখানে কয়লার গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়েছে কেউ। দেখেই বোঝা যায় অনেকদিন ঘুমায়নি। এই তাহলে রোগ?

'রোগ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে যান..' কথাগুলো একটু বেশিই ঝাঁজের সঙ্গে বলে ফেলেছে মহিলা। বলেই বুঝতে পারে উত্তেজনার বশে দুর্ব্যবহার করে ফেলেছে। গলাটা খাদে নামিয়ে বলে, 'বুঝতে পারছি খারাপ সময় চলছে আপনার। কিন্তু তার জন্য এ বাড়িতে এসে...'

চেয়ার থেকে উঠে পড়ে শৈলেন। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় খোলা দরজাটার দিকে। দরজার উপর হাত দিয়ে ভিতরে তাকায়। অল্প আলোয় মশারির ভেতর দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে দুটো শীর্ণ শরীর।

গোটা ঘরময় একটা অসুস্থতার গন্ধ। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে গন্ধটা কেমন মন খারাপ করিয়ে দেয়। তাও সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে মশারির ভিতরে আবছা রহস্যময় প্রাণীদুটোর অবয়ব বোঝার চেষ্টা করে শৈলেন।

হঠাৎ পেছন ফিরে বুঝতে পারে মেয়েটা এসে দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। শৈলেন আর একপা এগিয়ে যায় মশারির দিকে। নিচু গলাতেই বলে, 'আপনার শুনতে হয়তো অবাক লাগবে, কিন্তু... রোগটা সারাতে ওদের দু-জনকেই দরকার আমার।'

'মাসিদের? কেন?' হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে মেয়েটা।

শৈলেন সেদিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলে, 'ছোটবেলায় দু-জনকে আমি একটা নামে ডাকতাম, জানেন? মা শিখিয়েছিল...'

'কী নাম?'

'ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি...' কথাটা বলতে বলতে মশারির গা ঘেঁষে দাঁড়ায় শৈলেন, 'মা আমাকে কিছুতেই ঘুম পাড়াতে পারত না। দস্যি ছিলাম তো। আর মায়ের ধৈর্যটা বরাবরই কম। প্রথম প্রথম নিজে চেষ্টা করত বটে, শেষে বিফল হয়ে ওদের হাতে দিয়ে বলত 'নে, তোরাই ঘুম পারা'। আশ্চর্যের ব্যাপার মায়ের অত দস্যি ছেলে ওদের কাছে চট করে ঘুমিয়ে পড়ত। সে জন্যেই মা ওই নামে ডাকতে শিখিয়েছিল...'

মহিলাও এতক্ষণে মশারির দিকে চেয়েছে। ঠোঁটের কোণে বিড়বিড় করে বলল, 'ওদের মুখেই শুনেছি, বড় জেঠিমা রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল ওদের দু-বোনকে। বাপ বেচে দিয়েছিল মাড়োয়ারি শেঠের হাতে। মাসখানেক ছিলও সেখানে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দু-জনে পালিয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল, এমন সময় জেঠিমা দেখতে পেয়ে নিয়ে আসে ওদের... ভেবেছিল পুলিশের কাছে দিয়ে আসবে, কিন্তু ওরা আর বড় জেঠিমার আঁচল ছাড়েনি। কিন্তু...' মহিলা এবার মুখ তুলে তাকায় শৈলেনের দিকে, 'আপনি কী চাইছেন বলুন তো?'

'আমাকে একটা রাত ওদের মাঝখানে ঘুমাতে দেবেন?' শৈলেনের গলাটা শিশুর মতো শোনায়।

এ কথাটার জন্য প্রস্তুত ছিল না মহিলা। কয়েক সেকেন্ডের জন্যও সে থমকে যায়, হুট করেই একটা বিশ্রী হাসির তোড় শরীর কাঁপিয়ে দিতে চায় তার। সেটা সামলে নিয়ে কোনওরকমে ঠোঁট চেপে বলে, 'আপনি বিদেশ থেকে এতদূর এই কারণে এসেছেন! দুটো অসুস্থ মানুষের মাঝে ঘুমাবেন বলে? আপনি পাগল, তাই না?'

'কেন পাগলের কী দেখছেন এতে?'

'মিস্টার লাহিড়ী, ওরা দু-জনেই মৃত্যুশয্যায়। দু-জনের কেউ চিনতেই পারবে না আপনাকে। ঘুমপাড়ানো দূরের কথা, একটা হাত ভালো করে উপরে তুলতে পারে না ওরা...'

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মোছে মহিলা, 'পয়সা থাকলে মানুষের মাথায় কত না শখ চাপে, বাপ রে বাপ...'

শৈলেন কিছু বলে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মশারির দিকে চেয়ে। মহিলা তেমন হাসি চাপতে চাপতেই বলে, 'দেখুন, আইন অনুযায়ী এটা আপনারই বাড়ি। আপনি চাইলে একদিন কেন, যতদিন খুশি থাকতে পারেন। যেখানে ইচ্ছা শুতে পারেন... খাবার-দাবার যা লাগবে বলবেন, আমি করে দেব...'

কথাটা বলে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। বিড়বিড় করে একবার যেন, 'কোথাকার পাগল যতসব...' কথাটাও বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

কয়েক সেকেন্ড সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শৈলেন। ঘরের ভিতর সিলিং থেকে পুরনো পাখাটা ক্যাচকোচ করে ঘুরছে। বাইরে থেকে বিকেলের কাকের চিৎকার ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। সেই সঙ্গে অল্প সুরে মিশে যাচ্ছে দুটো অসুস্থ মানুষের ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ, যন্ত্রণাময় নিঃশ্বাস...

মশারিটা তুলে ধরে শৈলেন। সামনেই একটা মানুষ পাশ ফিরে শুয়ে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। হাড় বের করা হাতের কুঁচকানো চামড়ার উপর আঙুল স্পর্শ করে শৈলেন, 'মাসি, মাসি শুনতে পাচ্ছ...'

***

'বেশ তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি, আবার উঠে পড়লি কেন?' অতু চোখ মেলে তাকাতেই হালকা ধমকের সঙ্গে বলল রুনিমাসি।

'ঘুম আসছে না। সেই গল্পটা বলো না মাসি..'

'কোনটা?' টুনিমাসি ওর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করে।

'সেই যে ভুলো ভূতের গল্প। যে সব কিছু ভুলে যেত..'

'উঁহু, আজ নয়। অনেক রাত হয়েছে। ওই গল্পটা অনেক বড়।'

অতু অনুযোগের সুরে বলে, 'আমি কি গোটা গল্প শুনি? একটু বলতে বলতেই তো ঘুমিয়ে পড়ি...'

অতুর দুই মাসিই হেসে ওঠে। বাচ্চা ছেলেটার পেটের উপর ওদের দু-জনের হাত হালকা ভাবে পড়ে আছে। সেই হাতটাও যেন কেঁপে যায় একবার।

'ওই গল্পটাই এত ভালো লাগে কেন তোর?'

'ভালো লাগে না, ভয় লাগে...' অতু টুনিমাসির মুখের দিকে চেয়ে বলে।

'ভয় লাগে কেন?'

অতুর গলা উদাস হয়ে যায়, 'আচ্ছা, কখনও তোমরা যদি আমাকে ভুলে যাও?'

'সে তো যাবই। বুড়ো হলে কি মানুষ সবকিছু মনে রাখতে পারে?'

'তখন কী হবে তাহলে?'

'কী আবার হবে? ততদিনে তুইও অনেক বড় হয়ে যাবি। নিজে নিজেই ঘুমিয়ে পড়তে পারবি তখন। বরং তখন তোকে তোর ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াতে হবে...' চটুল হাসি হেসে ওঠে ওর দুই মাসি।

'তখন আমিও কাঁদব?'

ওর দুই মাসিই অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে, 'কাঁদবি কেন?'

'তোমরা যে আমাকে ঘুম পাড়ানোর সময়ে কাঁদো?'

ওর দু-পাশে আধশোয়া হয়ে থাকা দুটো মানুষ নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচায়ি করল একবার। মুখে একটা অচেনা ছায়া নামল তাদের। সেটা লক্ষ করেই অতু হাসল, বড়দের মতো ভাব করে বলল, 'আমি দেখেছি, আমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে পাড়াতে তোমরা কাঁদো। কেন কাদো মাসি?'

অতু কয়েক সেকেন্ড কোনও উত্তর পেল না। ওর পেটের উপর দুটো হাত এখনও শক্ত পাথরের মতো পড়ে আছে। ক্রমশ তার মধ্যে একটা হাত ওর গালে উঠে আসে, 'যেদিন কাঁদবি সেদিন বুঝতে পারবি...'

একদিকে পাশ ফিরে শোয় অতু, 'তোমরা আমাকে ভুলে গেলেও আমি কাঁদব। সে আমার যতই বয়স হোক না কেন...'

রুনিমাসি ওর গালে হাত রাখে, 'ওমা! কাঁদবি কেন? মনে করিয়ে দিবি আমাদের...'

'কেমন করে?'

কথা বলতে বলতে এতক্ষণে ঘুম পেয়ে যায় অতুর। মাসিদের মুখের বাকি উত্তরটা আর শোনা হয় না তার।

* * *

দুপুর নাগাদ পাশের ঘরটা খুলে দিয়েছে মহিলা। নিজের হাতের ছোট সুটকেসটা সেখানেই রেখেছে শৈলেন। দুপুরে সামান্য কিছু খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছে। মহিলার হাতের রান্না মন্দ নয়। ওকে খুব একটা পছন্দ না করলেও খুব একটা অশ্রদ্ধা নিয়ে রান্নাবান্না করেনি। সেসব খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতেই দিনটা বিকেলের দিকে গড়িয়েছে।

এর মাঝে কয়েকবার পাশের ঘরে গিয়ে মাসিদের দেখে এসেছে শৈলেন। কখনও পাশের চেয়ারে চুপ করে বসে থেকেছে। মড়ার মতো বিছানার দু-ধারে পড়ে আছে দুটো মানুষ। নড়াচড়া নেই। নিরবচ্ছিন্ন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ আর মাঝে মাঝে কাশির আওয়াজ। সে আওয়াজ একটু বেশিক্ষণ ধরে চললেই পাশের ঘর থেকে এসে কী একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেছে মহিলা। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে শৈলেন দুই মাসিকেই ঠেলা দিয়েছে, 'মাসি, শুনছ? চিনতে পারছ আমাকে? আমি অতু...'

কোনও সাড়া আসেনি। সম্ভবত আসবেও না।

গোটা দিনের জেট ল্যাগে শরীরটা একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল শৈলেনের। দুপুরবেলা সে ঘর ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসেছিল।

ঘুম আসে না... ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করেই একরাশ স্মৃতি ভিড় করে মাথার ভিতর। একটা জনশূন্য পৃথিবী। ওর সমস্ত শরীর ঘা আর ক্ষততে ভরে উঠেছে, ও প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে একটা ডাক্তারের চেম্বার থেকে অন্য ডাক্তারের কাছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড — ওষুধপত্র, ইঞ্জেকশন, স্টেথোস্কোপ, সব আছে —কেবল কোথাও কোনও ডাক্তার নেই।

চেয়ারে চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতেই বিকেল হয়ে গেছিল। চোখটা খুলল মহিলার ডাকে। চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে সে বলল, 'আপনার ফেরার টিকিট আছে তো?'

শৈলেন হাসল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। যাই হয়ে যাক, আমি পরশুর পর মোটেই এখানে থাকব না...'

মহিলা বিছানার ধারে বসতে বসতে বলল, 'বললাম তো, আপনার বাড়ি। যতদিন খুশি থাকুন। কিন্তু আমার খালি নিজের মতোই বাজার করা আছে। যদি তার বেশি থাকেন তাহলে...'

'পরশু সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইট। একেবারে ভোর ভোর বেরিয়ে যেতে হবে। তার মধ্যে আমার জন্য যা অতিরিক্ত খরচ হয় সেটা আমি কম্পেন্সেট করে যাব...'

মহিলা আর কিছু বলল না। নিজের চায়ে একটা বড়সড় চুমুক দিয়ে বিছানার উপর বাবু হয়ে বসল। শৈলেন এতক্ষণে খেয়াল করেছে আজ দুপুর থেকে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে একটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত কৌতূহল বারবার মহিলার মনের মধ্যে আসছে, কিন্তু কিছুতেই সেটা প্রকাশ হতে দিতে চাইছে না সে।

চায়ের কাপে চামচ ঘোরাতে ঘোরাতে শৈলেন জিজ্ঞেস করল, 'ভালো কথা, আপনার নামটাই জানা হয়নি...'

'সুকন্যা পাল, বড় জেঠিমা সুকু বলে ডাকত...'

'কতদিন হল আছেন এখানে?'

'ওই বছরতিনেক। বড় জেঠিমাই নিয়ে এসেছিলেন আমাকে। আপনার কথা ওঁর মুখে মাঝে মাঝে শুনেছি। তবে এতদিন পড়ে হুট করে এসে পড়বেন সেটা ভাবতে পারিনি, তাই...'

চায়ের কাপে একটা চুমুক দেয় শৈলেন। নাঃ, খুব একটা বেশি মিষ্টি দেয়নি। চা'টা পাশের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বলে, 'কী বলতেন আমার ব্যাপারে? আমি স্বার্থপর, দেশে ফিরতে চাই না, এইসব?'

'না, ছোটবেলার কথা বেশি বলতেন। সত্যি কথা বলতে আপনার ছেলেবেলার কথা আমি এত শুনেছি যে মনে মনে একটা ছবি ফুটেছিল আপনার। তার সঙ্গে একেবারেই মিল নেই এখন...'

'আর মাসিরা? ওঁরা কিছু বলতেন না?'

সুকন্যা পাল ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবে, তারপর কেটে কেটে বলে, 'আমি যখন এখানে আসি তখনও ওরা এতটা অসুস্থ হয়নি। তবে আপনার কথা বলতে শুনিনি কখনও।'

'অথচ মায়ের থেকে বেশি ওদের কাছেই মানুষ হয়েছি আমি। কোলেপিঠে করে মানুষ করা যাকে বলে। ছোট থেকেই দেখছি মা এনজিও করে। আরও হাবিজাবি কত কিছু। আমাকে দেওয়ার মতো সময় একদম থাকত না...'

'ছোট থেকেই দেখেছেন ওদের?'

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরাল শৈলেন। ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, 'একেবারে জন্ম থেকে নয়। আমার যখন বছরপাঁচেক বয়স তখন মা ওদের একরকম রাস্তা থেকেই বাড়ি নিয়ে আসে। পাড়ার লোকে ওদের আড়ালে 'মাসি-মাসি' বলে টোন টিটকিরি করত। একদিন আমার সামনেই করে ফেলেছিল। আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম — মা, মাসি মানে কী? মা বলেছিল ওরা আমাকে ঘুম পাড়ায় তো, তাই ওরা ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি...' কথাগুলো একদমে বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় শৈলেন, 'মা বলল আমার কথা, অথচ ওরা বলল না... অদ্ভুত, না?'

'অভিমান হয়েছিল হয়তো...'

হেসে মাথা নাড়ায় শৈলেন, সিগারেটের মুখে ছাইয়ের পরত জমেছিল, সেটা অ্যাশট্রেতে ফেলে বলল, 'আমার উপর অভিমান কেন বলুন তো? সে তো মায়ের উপর হওয়ার কথা। মা-ই আমাকে কখনও কাছে রাখতে চায়নি। একরকম জোর করেই অত কম বয়সে ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করতে

পাঠাল। আমার না তো ওসব কালচার ভালো লাগত, না ওই পড়াশোনা।'

'তারপর কী করলেন?'

'আর পাঁচটা লোক যা করে। মানিয়ে নিলাম। ভেবেছিলাম ক-টা বছরের তো ব্যাপার। পড়াশোনা শেষ করে কলকাতার কাছে চাকরিও পেয়েছিলাম। মা নিতে দিল না। বলল এদেশে পড়াশোনা করে কোনও লাভ নেই। বিদেশে চলে যা...' করুণ হাসি হাসল শৈলেন, 'আমার মা আর পাঁচটা বাঙালি মায়ের থেকে একটু আলাদা ছিল...'

'সেই অভিমান থেকেই আর দেশে ফিরলেন না?'

সিগারেট আঙুলের ফাঁকে ধরে চায়ের কাপে আর একটা চুমক দিয়ে ওর দিকে মুখ তুলে তাকায় শৈলেন, 'আপনাকে কে বলল আমার মায়ের উপর অভিমান আছে?'

'তাহলে এতদিন ফিরলেন না কেন?'

শৈলেনের গলার স্বর দূর থেকে ভেসে আসে, 'সুকন্যাদেবী, রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা, অভিমান — এসব থাকলে মানুষ ফিরে আসে। যে আর কখনও ফেরেনি, জানবেন তার আর ওসব কিছুই ছিল না। তাই ফেরেনি...' নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে শৈলেন, 'আমি একটা সময় বুঝে গিয়েছিলাম আমার এখানে আর কিছুই নেই। মা, বাবা, মাসি-পিসি, চেনা মুখ, চেনা ঘর, চেনা আঁচল, কী করব ফিরে?'

'যদি কিছু না থাকে তাহলে আজ তাহলে ফিরলেন কেন?'

খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় শৈলেন। বিকেলের রোদ নামছে বাইরে। দু-একটা পাড়ার বাচ্চা ছেলে ব্যাট হাতে চলে গেল দূরের দিকে। কিছুক্ষণ স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে শৈলেন বলল, 'কারণ আজ আর আমার ওখানেও কিছু নেই। আমার বউ, ছেলে, বন্ধুবান্ধব, টাকাপয়সা সব কিছু মিনিংলেস হয়ে গেল। এখন শুধু একটু ঘুম দরকার...' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে, 'নইলে ভাবার ক্ষমতাটাও চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।'

সুকন্যা চায়ের বাকিটুকু এক ঢোঁকে শেষ করে ফেলে। তারপর সেটা খাটের একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বলে, 'তবে আমার মনে হয় না এখানে

এসে আপনার কিছু লাভ হবে বলে। ওরা আজ মাসখানেক হল কিছুই করতে পারে না। আগের কিছুই আর নেই...'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শৈলেন, 'আচ্ছা আমার কাছে তো ছবি-টবিও নেই। ওদের আগের কোনও ছবি আছে আপনার কাছে?'

সুকন্যা একটুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর ভুরু কুঁচকে বলে, 'থাকার কথা তো ছিল। কিন্তু বাড়ি বদলের সময় সেসব... বেশ, খুঁজে দেখব নাহয়...'

কথাটা বলতে বলতেই উঠে পড়ে সে। ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, 'দশটা নাগাদ ওদের খাওয়াতে হয়। তারপর থেকে ওরকম পড়েই থাকে ওরা। একটা বালিশ রেখে দেব। যখন খুশি গিয়ে শুয়ে পড়বেন, কেমন?'

সুকন্যা চলে যেতে শৈলেন উঠে দাঁড়িয়ে জানলার কাছে সরে আসে। একটু আগে ব্যাট হাতে যে ছেলেপুলের দল হেঁটে গেছে তাদের ছোট হয়ে আসা শরীর এখনও দেখা যায়। মাঠের দিকে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। শৈলেনের মনে হয় ওদের মুখগুলো ও চেনে। কিছুক্ষণ আগেই জানলার বাইরে থেকে ওকে ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছে ওরা। ওকে ছাড়াই খেলতে চলে যাচ্ছে।

শৈলেন ক্ষীণ স্বরে খুব মৃদু গলায় ডাকে ওদের, 'আমি আসছি, তোরা দাঁড়া একটু, গুলে, শ্যামল, অনু... শুনতে পাচ্ছিস তোরা? আমি বেরোচ্ছি এক্ষুনি...'

ওরা শুনতে পায় না। অনেক দেরি হয়ে গেছে। বিকেলের আলোয় হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে যায় ওরা।

* * *

'আমার একদম ভালো লাগছে না মাসি...'

'কেন?'

'মা বলেছে আমি বড় হলে আমাকে পড়াশোনা করতে বাইরে পাঠিয়ে দেবে...'

'না দিয়ে উপায় আছে? তোর মায়ের কত কাজ বল তো?'

'আমাকে তোমাদের কাছে রাখতে পারবে না?'

'আমরা কি পড়াশোনা জানি? সেই কবে ইস্কুল পাঠশালের পাট চুকিয়ে দিয়েছি...'

বড় বড় চোখ তুলে দুই মাসির দিকে তাকায় অতু, 'আচ্ছা মাসি, তোমাদের খুউব কষ্ট, তাই না?'

'সে এককালে ছিল। এখন তোরা আছিস, কষ্ট থাকবে কেন?'

'আমরা থাকলে তোমাদের কোনওদিন কষ্ট হবে না? আর যদি না থাকি? যদি অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয় মা? তোমাদের কষ্ট হবে?'

রুনিমাসি ওর থুতনিতে একটা হাত রাখে, 'তুই মাঝে মাঝে আমাদের দেখতে আসবি না?'

'আমি তোমাদের না দেখে থাকতেই পারব না।'

'ব্যস, তাহলেই আর কষ্ট হবে না...'

অতু ওর পাশের ফাঁকা বালিশটার দিকে চায়। ও কি ভুলে যাবে মাসিদের? সেদিন মাসিরা কি খুব রেগে যাবে? রেগে গিয়ে আর ওকে দেখতে চাইবে না? আর ঘুম পাড়াতে চাইবে না?

* * *

এ ঘরের বিছানাটা বেশ বড়সড়। দুটো মানুষের শরীর এতটাই শীর্ণ হয়েছে গেছে যে তাদের মাঝে একটা মানুষ আরামসে শুয়ে পড়তে পারে। সেখানেই একটা নতুন ওয়ার পরানো বালিশ রাখতে রাখতে সুকন্যা বলে, 'মাঝরাতে ওদের ব্যথা বাড়ে বেশিরভাগ দিন। তখন গোঙাবে। তেমন হলে আমাকে ডাকবেন, কেমন? আমি পাশের ঘরেই আছি...'

'রোজই ব্যথা হয়?'

'প্রায়দিনই। যেদিন যেদিন গোঙানির আওয়াজ আসে না ভাবি কেউ একটা মরল...' সুকন্যা পাল হালকা হেসে বলে।

শৈলেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে, 'ভালো করে চিকিৎসা করা দরকার ছিল। এরকম টার্মিনাল স্টেজে এসে...'

'দরজাটা ভিতর থেকে দেবেন না। রাতে ব্যথা উঠলে...'

'আজকাল তো বিদেশে নানারকমের থেরাপি হচ্ছে, এখানে সেসবের একটা ব্যবস্থা করে...'

'মাঝরাতে আপনার গরম লাগলে...'

বিরক্ত হয় শৈলেন, বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, 'এতক্ষণ ধরে আপনাকে বলছি ওদের চিকিৎসার কথা আর... অদ্ভুত মানুষ তো আপনি...'

সুকন্যা হাতের বালিশটার উপরে সজোরে একটা চাপড় মারে, তারও কানের পাশ গরম হয়ে ওঠে, 'হঠাৎ আজ চিকিৎসার কথা বলছেন যে? এতদিন কোথায় ছিলেন আপনি? আপনার মায়ের কী রোগ হয়েছিল জানেন? ওদের শরীর কবে থেকে খারাপ হতে শুরু করেছে জানেন? কতবার এসেছেন দেশে? ক-টা টাকা পাঠিয়েছেন?'

'আমাকে কেউ কিছু জানায়নি। জানালে অন্তত টাকাটুকুনি পাঠাতে পারতাম...'

'এসব ছেঁদো কথা রাখুন মিস্টার লাহিড়ী...' ওর দিকে দু'পা এগিয়ে আসে সুকন্যা পাল, 'সত্যিটা স্বীকার করতে শিখুন, আপনি খবর নেননি কারণ এতদিন আপনার কিছু যায়-আসেনি। কোথায় আপনার মা-মাসিরা ধুঁকে ধুঁকে মরছে, তারা কোথায় থাকে, কীভাবে থাকে, কোন শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খায় তার খোঁজ রাখেননি, কারণ আপনার যায়-আসেনি। আজ আর কোথাও কিছু নেই বলে এখানে এসেছেন স্রেফ নিজের দরকারে। আপনি নিজের দরকার ছাড়া আর কিচ্ছু বোঝেন না...'

'বাঃ! একদিনে এত চিনে ফেলেছেন আপনি আমাকে?'

'বললাম না, আপনার গল্প ছোট থেকে শুনে আসছি আমি, আমার কী মনে হয় জানেন? আপনি একটা স্বার্থপর...'

'তাই নাকি?'

'তাই না? আপনি নিজের দরকার মতো মনে রাখেন, তারপর ভুলে যান। যতটুকু ভুলে গেলে সব ঠিক থাকবে, মন ভালো থাকবে ততটুকু ভুলে যান আপনি। যাদের ভুলে গেলেন তাদের কেমন করে কাটে সেটা নিয়ে আপনি

দু-সেকেন্ডও ভাবেন না...’

ভুরু কুঁচকে যায় শৈলেনের, একটু চুপ করে থেকে সে বলে, ‘এগুলো মা বলেছে আপনাকে, নাকি মাসিরা?’

সুকন্যা পালের চোখের আগুন হুট করেই নিভে যায়। এতক্ষণের উত্তেজনায় বলা কথাগুলো একরকম ঝোঁকের বশেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তার।

‘কোনও দরকার পড়লে ডাকবেন... কিছু মনে করবেন না...’ একরকম মুখ লুকিয়েই দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

পকেট থেকে ফোনটা বের করে শৈলেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বেজেছে ফোনটা। শুভময়ের কল। ছেলেটা ওকে নিয়ে একটু বেশিই দুশ্চিন্তা করছে। রিং ব্যাক করে ফোনটা কানে চেপে ধরে শৈলেন, ‘বল...’

‘ইউ আর অলরাইট?’

‘জানি না। তবে মা আমাকে নিয়ে এত কথা ভেবে রেখেছে আমি জানতাম না...’

‘কী কথা?’

‘তোর মনে আছে একবার বলেছিলি ছোটবেলায় কোনও মেন্টাল ট্রমা আমি সহজে ভুলে যেতে পারতাম?’

‘হ্যাঁ, তবে সেটা আমি বলিনি। তোর জীবনে এমন কিছু একটা ঘটেছিল যেটা তুই মেনে নিতে পারিসনি। আই ডোন্ট নো সেটা কী। তখন তোর একটা ট্রিটমেন্ট চলে, সেই ট্রিটমেন্টের ফলেই ছেলেবেলার কিছু কিছু স্মৃতি তোর কাছে ঝাপসা হয়ে যায়। এসব তোর তখনকার রিপোর্টেই লেখা আছে...’

‘কী ঘটে থাকতে পারে বল তো?’

‘প্রিয়জনের মৃত্যু, চোখের সামনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা। এনিথিং, আমি ঠিক বলতে পারব না...’

‘আমার তো মনে পড়ে না এমন কিছু...’

‘বললাম যে ভুলে গেছিস...’

'ওয়েল, আমার মা জানত। যাই হোক, বাদ দে। এখানে এখন রাত হয়েছে। শুতে যাচ্ছি...'

ফোনটা কেটে দেয় শৈলেন। সুকন্যা পাল যাওয়ার আগে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেছে। সবজে টুনি বাল্বের আলোয় ঘরটা হালকা আলোকিত হয়ে আছে। খাট, একটা ছোট আলমারি, দেওয়ালে দুলন্ত আয়না, ক্যালেন্ডার আর একদিকের দেওয়াল লাগোয়া একটা বড় আলনার আউটলাইন দেখা যাচ্ছে কেবল। কেমন যেন মৃত্যুর গন্ধ লেগে আছে ঘরটায়। বেশিক্ষণ থাকলে গা ছমছম করে।

মশারিটা আপাতত খোলা। বিছানার উপরে ঘুমন্ত মানুষদুটোর দিকে এগিয়ে যায় শৈলেন। হাঁটু ভাঁজ করে বিছানার উপরে উঠে ওদের ঠিক মাঝখানে শুয়ে পড়ে।

ওর মাথার উপরে সবজে সিলিং। ঘুরন্ত আদ্যিকালের পাখা। দু-পাশে দুটো ক্ষীণ হয়ে আসা মানুষের অস্তিত্ব।

বহুদিনের ঘুম না আসা চোখে ও চেয়ে থাকে সিলিংয়ের দিকে। নিজের শরীরের ভিতর রক্তের আনাগোনা শুনতে পায়। অনুভূতিগুলো জট ছাড়িয়ে এক-এক করে ফুটে ওঠে চোখের সামনে। আবার মিলিয়ে যায়। আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। নিঃসঙ্গ পৃথিবী, পরিচিত কেউ নেই, কোথাও কোন চেনা মুখ নেই, চেনা গলার স্বর নেই, স্পর্শ নেই...

পাশ ফিরে হাত দিয়ে একটা মানুষের শরীর স্পর্শ করে। খুব মৃদু স্বরে ডাকে, 'মাসি, অনেক দেরি হয়ে গেছে না?'

অন্যদিকে ফেরে শৈলেন, 'বলো না, অনেক দেরি হয়ে গেছে?'

শব্দ আসে না। কেবল যান্ত্রিক নিঃশ্বাস শোনা যায়। নিঃশ্বাসে যন্ত্রণা এসে মেশে। মানুষগুলোর মাথার চুল নেই প্রায়। চামড়ায় সময় কাটাকুটি খেলে। তিরিশবছর আগের হাসিখুশি মানুষকে চামড়া জড়ানো পাথর করে দিয়ে চলে গেছে সময়...

'আমার খুব দরকার তোমাদের... তোমরা চিনবে না আমাকে?' শৈলেনের গলা কাতর শোনায়, 'আমার ঘুম আসে না মাসি, ভয় করে আমার, সারাক্ষণ

খুব ভয় করে... চোখ বুজলে ভয় করে... এরকম করে আমি বাঁচব কী করে বল? তোমরা তাও রাগ করে থাকবে?'

এবার দু-হাতে ঠেলা দেয় ও। মাথার ভিতরে একটা শিরা ছিঁড়ে যায় যেন। শেষ আশা ছিল ওর। জানত কোনও লাভ হবে না, তাও ছেলেবেলার টান। অন্তত একটা হারানো শিকড়, হারানো মানুষ, যতই অবহেলা করে থাকুক, এতকিছুর পরেও মুখ ফিরিয়ে থাকবে?

অসুস্থ মানুষগুলোর দুটো হাত নিয়ে নিজের পেটের উপরে রাখে শৈলেন, 'আমার ভয় করলে এইভাবে দু-জনে জড়িয়ে ধরতে তোমরা। মনে আছে? আজও খুব ভয় করছে...'

হাতে সেই স্পর্শ নেই আর। ঠান্ডা, শীতল, উদাসীন স্পর্শ ওর বুকের ভিতরের মেঘ এতটুকু কমাতে পারে না। সেই অসুস্থ নিঃশ্বাসের শব্দ। কেউ নেই, কেউ জেগে নেই ওর দু-পাশে...

'পাথর হয়ে গেছ, না?'

শৈলেনের মুখে হাসি ফোটে। বিড়বিড় করে বলে, 'আমি ফিরে যাব না মাসি, আমি এখানেই ঘুমাব, তোমাদের মাঝে... দেখো তোমরা...'

ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর এগিয়ে যায় আলনার দিকে। কিছু পুরনো শতচ্ছিন্ন শাড়ি রাখা আছে সেখানে। তার সবেতেই রক্ত কিংবা সময়ের গন্ধ।

তার মধ্যে থেকে একটা রংচটা শাড়ি তুলে নেয় শৈলেন। আলাদিনের মাদুরের মতো নরম স্পর্শ লাগে ওর হাতে। বহু পুরনো শাড়ির আঁচলের গন্ধ। এমন একটা গন্ধ ছোটবেলা মনে করিয়ে দেয়। কতরাত এমন নরম শাড়ির আরামে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়েছে ও। বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় সে গন্ধটুকুকে। নাক ডুবিয়ে দেয় শাড়ির ভাঁজে।

তবে শাড়িগুলো তেমন মজবুত নয়। একটায় হবে না। আর একটা শাড়ি আলনা থেকে তুলে নিয়ে পাশাপাশি নিয়ে আসে শৈলেন। জড়ো করে দড়ির মতো পাকাতে থাকে। এবার যেন একটু একটু ঘুমের ঘর আসছে ওর। শরীরটা বড্ড ক্লান্ত লাগছে। চোখটা জ্বালা করছে ভীষণ...

হঠাৎ ওর ঘুমের ঘোরে ব্যাঘাত ঘটে। ফোনটা পকেটে ভাইব্রেট করছে। মনেই ছিল না ওটা বন্ধ করার কথা। পকেট থেকে বের করে সরিয়ে রাখতে গিয়েও কী ভেবে সেটা রিসিভ করে শৈলেন। ওপাশ থেকে শুভময়ের গলা শোনা যায়, 'হোয়াট আর ইউ আপ টু শৈলেন?'

'ফোন রাখ, রাত হয়েছে অনেক...'

'আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তুই তোর সমস্ত প্রপার্টি চ্যারিটিতে দিয়েছিস। দেশে ফেরার কোনও টিকিট তুই কাটিসনি... তুই...' ওপাশের গলাটা হুট করেই যেন ঠান্ডায় কেঁপে ওঠে, 'তুই ওখানে ঘুমাতে যাসনি শৈলেন...'

'ঘুমাতেই এসেছি, একটা লম্বা ঘুম। যেমন বহুকাল ঘুমাইনি...'

'তুই পাগল হয়ে গেছিস শৈলেন। কোথায় আছিস তুই? এক্ষুনি ডাক কাউকে...'

'আমার ডাকার মতো কেউ নেই। শুধু ওখানে না, এখানেও। যারা আমায় চিনত, হয় মারা গেছে না হয় ভুলে গেছে আমাকে। আমার কোনও শেকড় নেই শুভ...

'তুই এখানে ফিরে আয় প্লিজ। ইউ আর জাস্ট অ্যানাদার ভিক্টিম অফ সিভিয়ার ডিপ্রেশন...'

বিরক্ত হয়ে শৈলেন, তাও গলা নিচে নামিয়েই বলে, 'কী করব ফিরে? শুভ, আমি বিদেশে কিছু অপরিচিত মুখের মাঝে, অপরিচিত গন্ধ, অপরিচিত শব্দ, অপরিচিত দেওয়ালের মধ্যে কুকুরের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে চাই না। আমি ঠিক সেভাবে ঘুমাতে চাই যেভাবে ছোটবেলায় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতাম। রাজার মতো, রাজপুত্রের মতো। আমার দুই রূপকথার মাঝে...'

'শাট আপ, তুই এক্ষুনি কাউকে ডাকবি। নইলে আমি...'

শৈলেনের গলায় ব্যঙ্গ এসে মেশে, 'নইলে কী? তুই এখানে কাউকে চিনিস না। কারও নাম্বার নেই তোর কাছে...'

'পুলিশের আছে...'

'পুলিশকে কী বলবি? আমি কোথায় এসেছি? তুই ফোন রাখ। আমার ঘুম পাচ্ছে...'

ওপাশের কথা শোনার আগেই ফোনটা কেটে দেয় শৈলেন। তারপর শাড়িদুটোকে দড়ির মতো পাকিয়ে নেয়। শক্ত করে ফাঁস দেয়। ওর মতো একটা বিয়াল্লিশ বছরের মানুষকে অন্তত কয়েক মিনিট ধরে রাখতে পারবে ফাঁসটা।

বিছানার কাছে এগিয়ে এসে দুটো মানুষের পা স্পর্শ করে শৈলেন। ওর ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিদের পা। তারপর উঠে দাঁড়ায় বিছানার উপর। দড়ির একটা দিক বাঁধে পুরনো লোহার সিলিংয়ে। নিচ থেকে দুই বৃদ্ধার ঘুমন্ত নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে। তারা আর জাগবে না। উঠে বসবে না। ওকে বাধা দেবে না। বহুবছর হল ওকে ভুলে গেছে তারা...

বিছনার উপর দাঁড়িয়ে ফাঁসটা গলায় পরে শৈলেন। মনটা ভরে যায় ওর। ওর দু-পাশে শুয়ে দুই ঘুমের জাদুকর। ঠিক এই জায়গাটায় শুয়েই কতবার ঘুমিয়েছে ও। ওই নিঃশ্বাসের শব্দ কী ভীষণ পরিচিত ওর। অসহায় চোখে একবার মানুষদুটোর দিকে তাকায়। না, ওদের আর কিছু দেওয়ার নেই। ওদের হারিয়ে ফেলেছে অনেকদিন আগে।

ভালো করে গলার সঙ্গে শাড়িটা পেঁচিয়ে নেয় শৈলেন। পা দুটো একটু একটু করে তুলে নেয় বিছানা থেকে। নিঃশ্বাসের বেগ দ্রুত হয়। তারপর কমে আসতে থাকে।

ঠক - ঠক - ঠক...

দরজায় টোকা পড়ছে। শৈলেন ছটফট করতে করতেও শুনতে পায় সুকন্যা বাইরে থেকে ডাকছে ওকে, ‘মিস্টার লাহিড়ী, আপনাকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল... মিস্টার লাহিড়ী...’

এখনই কেন এল মেয়েটা? আর কী পাওয়ার আছে ওর? যন্ত্রণার স্রোত বেড়ে উঠতেই শৈলেনের পা নেমে আসে বিছানার উপরে। একটানে সিলিং থেকে দড়িটাকে খুলে বিছানার নিচে লুকিয়ে ফেলে ও। ছোট লাফ দিয়ে নেমে আসে মেঝেতে। ঘরটা একবার দেখে নিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে খুলে ফেলে দরজাটা।

‘হ্যাঁ বলুন...’ কাশতে কাশতেই জিজ্ঞেস করে।

মহিলার গায়ে এখনও সারাদিনের পোশাক। বোঝা যায় এতক্ষণ পরিশ্রমসাধ্য কিছু একটা কাজ করছিল সে। মুখে একই সঙ্গে ক্লান্তি আর উত্তেজনার ছাপ খেলা করছে। ওকে দরজা খুলতে দেখে একটা খাতাজাতীয় কিছু এগিয়ে দেয় সুকন্যা, 'অনেক কষ্ট করে খুঁজে পেলাম। ভেবেছিলাম সকালেই দেব, কিন্তু ভাবলাম আপনি তো এমনিতেই ঘুমান না...'

শৈলেন দেখে ওর দিকে একটা ফটো অ্যালবাম এগিয়ে দিয়েছে মহিলা। আজ থেকে বছরতিরিশেক আগে এমন ফটো অ্যালবামের চল ছিল। অন্তত গোট-পঞ্চাশেক ছবি ধরে রাখা যায় তাতে। ধুলো ঢাকা কভারের উপরে একটা পাখির ছবি। এই ছবিটা চেনা লাগে শৈলেনের। অ্যালবামটা ও আগেও দেখেছে। সম্ভবত ছোটবেলায়।

'আপনি পুরনো ছবি দেখতে চাইছিলেন না? তবে এটা ওদের কাছে না। আমার কাছে ছিল...'

ধীরে ধীরে অ্যালবামটা হাতে নেয় শৈলেন। একটা একটা করে পাতা উল্টাতে থাকে। ঘরের বাইরের আলোটা জ্বলছে। তেরচা করে এসে পড়া আলোতে রং বোঝা না গেলেও ছবির মানুষগুলোকে চেনা যায়। ওর স্মৃতি হাঁটতে থাকে পেছন দিকে। অসুস্থ মানুষগুলো হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ওকে কোলে নিয়ে। কোথাও...

শৈলেনের হাত কেঁপে যায়। প্রায় সব ছবিতেই ওরা তিনজন আছে। তবে শুধু তিনজন নয়...

স্তম্ভিত হয়ে শৈলেন দেখে ছবিতে ওর দুই মাসি আর ওর সঙ্গে রয়েছে আরও একটা মানুষ। একটা ওরই বয়সের বাচ্চা মেয়ে। তার মুখে হাসি, পরনে কখনও নীলচে রঙের ফ্রক, কখনও ওরই শার্ট। কখনও ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে, কখনও শৈলেনের গলা জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে ওর গালে...

এই মুখটা শৈলেনের অপরিচিত নয়। এই মুহূর্তে এ মুখটাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে দুটো উজ্জ্বল চোখে। ও অবাক হয়ে তাকায় সেদিকে। দুটো মুখের মধ্যে মিল খোঁজার চেষ্টা করে। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে, 'এটা... এটা...'

'আমি...' সুকন্যা ওর দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হাসে।

'আপনাকে ছোটবেলায় দেখেছি আমি? কিন্তু...'

'মনে পড়ছে না, তাইতো? আসলে মানুষ শুধু বয়স হলেই ভুলে যায় না। যন্ত্রণার হাত থেকে পালাতে আমাদের মন অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয় আমাদের... ভুলতে না পারলে ঘুম আসে না...'

'আপনি কী বলছেন আমি কিছুই...'

সুকন্যা ওর দিক থেকে সরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। রাতের ফিকে হাওয়ায় ওর চুল উড়তে থাকে, 'আপনার মা রাস্তা থেকে দুটো মেয়েকে তুলে আনেনি। এনেছিলেন তিনজনকে। যে মারোয়াড়ি শেঠের কাছে ওদের দু-জনকে বিক্রি করা হয়েছিল সেখানে একটা বাচ্চা মেয়েও ছিল। সেও পালিয়ে আসে ওদের সঙ্গে। আপনার বোনের মতো ছিল সে...'

ধীরে ধীরে ঝাপসা কিছু ছবি ভেসে ওঠে শৈলেনের মাথার ভেতরে। ওর দুই মাসির মধ্যে একজনের কোলে ওর মাথা। আর একজনের কোলে একটা বাচ্চা মেয়ে শুয়ে আছে। দু-জনের হাসির আওয়াজে ভরে যাচ্ছে ঘরটা, যন্ত্রণাময় রাতগুলো বদলে যাচ্ছে রূপকথার গল্পে। ঝিমঝিমে হাওয়া দিচ্ছে কোথায় যেন। টুকরো টুকরো ছবিগুলোকে ধুলো করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে। আবার নতুন ছবি তৈরি হচ্ছে। ছাদময় লুকোচুরি খেলছে দুটো ছেলেমেয়ে। ছুটে বেড়াচ্ছে মাঠের নরম ঘাসের উপরে। তাদের খিলখিল হাসির শব্দ এত বছর পরেও শৈলেনের কানে বাজতে থাকে।

সুকন্যা বলেই চলেছে এখনও, 'ওইটুকু বয়সে সেও কম যন্ত্রণা সহ্য করেনি। আপনি একা গল্প শোনেননি মিস্টার লাহিড়ী, একা ঘুমাননি। আপনার পাশে শুয়ে থাকত একটা বাচ্চা মেয়ে। আপনার সব থেকে পুরনো বন্ধু, সব থেকে পুরনো শিকড়!'

'কিন্তু আমি তাহলে আপনাকে...'

'ওই যে বললাম, মানুষ তার জীবনের সবথেকে বড় যন্ত্রণাকে ভুলে যেতে চায়। আপনি আমাকে ভুলে গেছিলেন কারণ মনে থাকলে আপনি ঘুমোতে পারতেন না।'

'কীসের যন্ত্রণা?'

সুকন্যা জানলা থেকে ভিতরের দিকে সরে আসে, বুক ভরে একটা দম নেয়, 'এখানে আসার পর কয়েকবছর আমি এই বাড়িতে ছিলাম। তারপর যে দল আমাদের পাচার করেছিল তারা রাস্তা থেকে আমাকে আবার তুলে নিয়ে যায়। অনেকদিন ধরেই টার্গেট করেছিল ওরা আমাকে। আবার বিক্রি করে দেয় এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছে। তারপর অনেক হাত ঘুরে অনেক ঘাটের জল খেয়ে আমি বড় হই। সে বড় হওয়ার কথা আপনি যত কম জানতে পারেন ততই ভালো...'

সুকন্যার চোখে মুখে কোনও বিশেষ কোনও অভিব্যক্তি নেই। যেন ভারি আরাম করে মনের সুখে কথাগুলো বলছে সে, 'এত বছর পরে সমস্ত কিছু ছেড়ে আবার ফিরে আসি এখানে। বড় জেঠিমাই আমাকে এখানে নিয়ে আসে। তারপর থেকে আমি এখানে। আমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন আপনি মিস্টার লাহিড়ী। কতগুলো নোংরা লোক আমাকে তুলে নিয়ে গেছে, আমাকে আর আপনি দেখতে পাবেন না, কিংবা আমি মরে গেছি, এই যন্ত্রণাটা আপনি মানিয়ে নিতে পারেননি। তাই ধীরে ধীরে মুছে ফেলেছিলেন আমাকে...'

সত্যি কথা বলছে মেয়েটা? ছবিগুলো মিথ্যে না। আজ শুভময়ের বলা কথাগুলোর সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে সমস্তটা। ছেঁড়া ছেড়া ছবিগুলোও মনের ভিতরে ভেসে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। মিথ্যে বলে লাভই বা কী সুকন্যার?

শৈলেনের মাথার ভিতরে ভারী হয়ে আসে। দু'হাতে মাথা চেপে ওর দিক থেকে সরে আসে শৈলেন, 'কিন্তু আ... আমার কিছু মনে নেই। আপনাকে মনে নেই, কাউকে মনে নেই... আমার শুধু ঘুম দরকার, আমাকে আর ঘুম পাড়ানোর কেউ নেই... আমার ঘুম আসে না...'

সুকন্যা এগিয়ে এসে ওর দিকে, 'আসবেও না। আপনি বড় হয়েছেন মিস্টার লাহিড়ী। আপনাকে কেউ আদর করে, গান গেয়ে ঘুম পাড়াবে না...'

শৈলেন ছিটকে সরে যেতে যাচ্ছিল। ওর একটা হাত ধরে টান দেয় মেয়েটা, 'আসুন আমার সঙ্গে...'

'কোথায়?'

উত্তর দেয় না সুকন্যা। বিছানার উপরে ঘুমন্ত মানুষদুটো এখনও মরার মতোই পড়ে আছে। শৈলেন এখানে আসার পর থেকে তারা একবারও চোখ মেলে চায়নি। একবারও উঠে বসেনি। শৈলেন একঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়, 'ছাড়ুন আমাকে। ওরা সব ভুলে গেছে। ওদের কাছে আর ঘুম আসবে না আমার। কিছুতেই আসবে না...'

'জানি...'

ওর হাতটা ধরে রুনিমাসির মাথার কাছে ওকে বসিয়ে দেয় সুকন্যা। দুটো মানুষ একটু নড়ে ওঠে। অর্ধমৃত শরীরে উসখুস শুরু হয়েছে। সুকন্যা একজনের কাঁধের উপরে হাত রেখে বলে, 'রাতের দিকে ওদের ব্যথাটা বাড়ে। গোঁগোঁ আওয়াজ করে সারারাত। মাঝে মাঝে মনে হয় এবার বুড়ি মরে গেলেই ভালো...'

গোটা ঘরময় রক্তের গন্ধটা আরও বেড়ে উঠেছে। শৈলেনের সমস্ত শরীর জুড়ে অস্বস্তি। সত্যি অসুস্থ মানুষগুলোর গলা থেকে থেকে একটা গোঙানির আওয়াজ বের হতে শুরু করেছে। ক্রমশ বাড়ছে সেটা। তীব্র মৃত্যুচিৎকার ধ্বনিত হচ্ছে ঘরময়। শৈলেনের ইচ্ছা করে দু-হাতে নিজের কান চেপে ধরতে...

সুকন্যা যন্ত্রণাক্লিষ্ট দু-জনের মধ্যে একজনের মাথাটা তুলে নেয় কোলের উপর। ঠোঁটে একটা শিসের মতো শব্দ করে। বাচ্চারা যন্ত্রণা পেলে এভাবেই শব্দ করে বোঝাতে হয় তাদের। কপালে হাত রাখে। গোঙানির শব্দের জোর কমে আসে।

মুখ ফিরিয়ে সে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে শৈলেনের দিকে। ধীরে ধীরে বলে, 'আমাদের বয়স হয়েছে মিস্টার লাহিড়ী। রূপকথার কাছে ঘুমিয়ে পড়ার বয়স আর আমাদের নেই। এখন আমাদের রূপকথা তৈরি করতে হবে দাদা। না হলে ঘুম আসবে না...'

শৈলেন কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। তারপর কখন যেন আর একজনের মাথাটা তুলে নেয় নিজের কোলে। বিড়বিড় করে অজান্তেই কী

যেন একটা গল্প বলতে থাকে। ভুলো ভূতের গল্প, যে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল, তেপান্তরের গল্প, বোকা রাজার গল্প...

গুনগুন করে একটা গান গাইতে থাকে মেয়েটা। এতক্ষণে দুটো মানুষের ছটফটানি কমতে শুরু করেছে। চিৎকারের তীব্রতা কমে আসছে। তাদের ব্যথায় যেন মলম লাগে ধীরে ধীরে। ঘুমের রেশ নামে চোখে।

শৈলেনের চোখে জলের ধারা নামে। মেয়েটা সেদিকে তাকিয়ে হাসে, বলে, 'আপনার মনে আছে? ছোটবেলায় আপনি প্রশ্ন করতেন দুই মাসি আপনাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কাঁদে কেন?'

শৈলেন কিছু বলে না। দু-চোখ ছাপিয়ে জল নেমেছে। গলা অবরুদ্ধ।

'আপনার কাছে কিছু নেই, আপনার ছেলে, বউ, বন্ধুবান্ধব, এই পৃথিবীর কেউ আপনাকে চেনে না। কিন্তু এই নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষটাও কাউকে ঘুম পাড়াতে পারে... কারও ব্যথায় মলম লাগাতে পারে... আজ আপনি যে জন্য কাঁদছেন ওরা সেদিন সে জন্যই কাঁদত মিস্টার লাহিড়ী...'

যন্ত্রণা কমে আসতে আবার কখন যেন গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে পাথর হয়ে যাওয়া মানুষদুটো। শৈলেনের কোলে তাদের একজনের মাথা। অন্যজনের মাথা সুকন্যার পায়ের উপর। ঠিক ছোটবেলার মতো। কেবল এই তিরিশ বছরে জায়গাগুলো বদলে গেছে।

সুকন্যার একটু আগে বলা কথাটা ভাঙা রেকর্ডের মতো বেজেই চলেছে ওর কানের কাছে, 'এখন আমাদের রূপকথা তৈরি করতে হবে দাদা। না হলে ঘুম আসবে না... ঘুম আসবে না...'

ঘুমের নেশায় কোলের উপর পড়ে থাকা মাথায় হাত বুলাতে থাকে শৈলেন। চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ে সেই মাথার উপরে।

হাত বুলাতে বুলাতে ক্লান্ত লাগে ওর। ক্লান্তি, এমন ক্লান্তি বহুদিন হল লাগেনি কোথায়। চোখের জলের নোনতা স্বাদ পায় মুখে। হাঁপিয়ে ওঠে...

আর ঠিক সেই সময় এতদিনের ঘুম যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে আসে ওর চোখে। ঘুম পায় শৈলেনের। অনেকদিন পরে সত্যিকারের ঘুম নেমে আসতে থাকে চোখে...

ওর ঠিক পাশে বসে গুনগুন করে একটা গান গাইছে সুকন্যা। ভারি পরিচিত সুর, তাও শৈলেনের মনে হয় সে সুরের মোহেই ঘুমে জড়িয়ে আসছে ওর রাতের পর রাত জেগে থাকা ক্লান্ত চোখদুটো... আরামে ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ও শুনতে পায় মেয়েটা চেনা সুরে গেয়ে চলেছে—

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি, মোদের বাড়ি এসো,
মোদের বাড়ি এসো... মোদের বাড়ি এসো...

শিউলি ফুল

'একমুঠো শিউলি ফুল আমাদের আলাদা হতে দেবে না...'

সাতসকালেও কথাটা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে তন্ময়। কাল রাত থেকে এই কথাগুলো শুনতে শুনতে কানে কু লেগে গেছে ওর। অপরাজিতা কখনও ফুঁপিয়েছে, কখনও তারস্বরে চেঁচিয়েছে, আবার কখনও স্রেফ শান্ত হয়ে বাষ্পমাখা গলায় বলেছে ওই এক কথা, 'একমুঠো শিউলি ফুল...'

ফোঁপানো শুনতে শুনতে ভোররাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল তন্ময়। উঠেই সবার আগে ওকে ফোন করেছে। কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছে, 'কাল যেটা বলেছিলি সেটা মনে আছে তো? তুই কিন্তু প্রমিস করেছিলি আমাকে। এইরকম একটা টক্সিক সম্পর্কে থাকার থেকে...'

'থাকব না।' ওর কথা শেষ হবার আগেই জবাব দিয়েছে অপরাজিতা।

'কখন বেরোবি বাড়ি থেকে?'

'জানি না, এগারোটায় আসতে বলেছি। কিন্তু একটাই ভয় হচ্ছে আমার তন্ময়...'

'কিসের ভয়?'

'রঙ্গিণী পার্কের ওদিকটায় একটা শিউলির গাছ আছে। ও যদি মুঠো ভরে শিউলি নিয়ে আসে...'

'আরে নিকুচি করেছে তোর শিউলি ফুলের। এখানে একটা মানুষের জীবনের কথা হচ্ছে। তার সুখে থাকা শান্তিতে থাকা নিয়ে কথা হচ্ছে। আর ওই লোকটা যতদিন আছে কোনওদিন সেটা হবে না। এই শিউলি ফুল শিউলি ফুল করে ন্যাকামি মারাটা বন্ধ কর...'

কথাটা বলেই অপরাধবোধে ভোগে তন্ময়। ও নিজেও কি দিন দিন সায়ন্তনের মতো টক্সিক হয়ে যাচ্ছে? অপরাজিতার মনের অবস্থা না বুঝে নিজের অনুভূতিটাকে রোড রোলারের মতো চালিয়ে দিতে চাইছে ওর বুকের উপর দিয়ে?

তন্ময়ের গলা খাদে নেমে আসে, 'আমি ওভাবে বলতে চাইনি। দেখ তোর এবার নিজের দিকে তাকানো দরকার। চেহারার কী অবস্থা করেছিস দেখেছিস? তাছাড়া সামনে পড়াশোনা আছে, বাড়ির লোকজনের কথাও তো ভাব অন্তত...'

'আর তুই? তোর কথা কে ভাববে?'

'আমি!' একটু ঘাবড়ে যায় তন্ময়, 'আমার তো কোনও সমস্যা নেই...'

'নেই যখন আমার এত যত্ন নিচ্ছিস কেন? আমার প্রেম টিকল কি টিকল না, ভালো থাকলাম কি না, তাতে তোর এত যায়-আসে কেন বলতো?'

তন্ময় আর কিছু উত্তর দিতে পারে না। ওপাশ থেকে কেবল অখণ্ড নীরবতা ভেসে আসে।

'আচ্ছা আমি বিছানা থেকে উঠি। শুয়ে থাকলে গায়ে মনে কোথাও জোর পাব না...'

'বেশ, মন খারাপ লাগলে আমায় ফোন করিস। আর বেরুনোর আগে জানাস, কেমন?'

ওপাশ থেকে ফোনটা কেটে যেতে সেটা পাশে টেবিলের উপর রেখে দেয় অপরাজিতা। তারপর সোজা হয়ে বসে। বিছানার পায়ের কাছে রাখা আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে পায়। কাল সারারাত ঘুম হয়নি বলে চোখ মুখ ফুলে আছে। চুলও অবিন্যস্ত। এই এক মাসে ওর মুখটা ভয়ঙ্কর রকমের সরু হয়ে গেছে। চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল এত গাঢ় হয়েছে যে দেখে মনে হয় পুরু কালি জমেছে। হাত দিয়ে একবার সেটার উপর রগড়ে নেয় অপরাজিতা। তাতে আরও গাঢ় হয় সেই রং।

বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় অপরাজিতা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নিজের মুখের দিকে। হাত বাড়িয়ে যেন নিজেকে স্পর্শ

করার চেষ্টা করে। আয়নার ঠিক পাশেই ঝুলছে ওর পুরনো একটা ছবি। আজ থেকে তিন বছর আগে তোলা। তন্ময় তুলে দিয়েছিল।

তিন বছর কেটে গেছে মাঝখানে। ওই মুখ আর এই মুখের মাঝে তিন-তিনটে বছর। ঠিক তিনবছর আগেই কোন এক অপরিচিত ভোরে প্রথম আলাপ হয়েছিল সায়ন্তনের সঙ্গে...

(২)

ভেজা ঘাসের উপরে ক্যাম্বিসের জুতোর আওয়াজ হতেই ঝিলের ধার থেকে কয়েকটা বক জলের উপর উড়ে গেল বিরক্ত হয়ে। আজ এই নিয়ে দ্বিতীয় দিন দৌড়াতে এসেছে অপু। কাল পার্কের চারনম্বর বেঞ্চ অবধি দৌড়াতেই জিভ বেরিয়ে গেছিল। আজ বাড়ি থেকে ঠিক করে এসেছে ছ'নম্বরে গিয়েই একেবারে দেহ রাখবে। নিঃশ্বাসের উপর শাসন কায়েমের চেষ্টা করল অপু। উঁহু, অন্য কোনওদিকে মন দিতে হবে।

উড়ন্ত বকের ডানার দিকে একবার চেয়ে কনুইয়ের উল্টো দিক দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। ভোরের রোদ এসে ছিটকে যাচ্ছে ওদের ধবধবে ডানায়, সেটা দেখতে দেখতেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। পাঁচনম্বর বেঞ্চের কাছে প্রায় এসেই পড়েছিল, এমন সময় কিসে একটা হোঁচট খেয়ে পা পিছলে গেল। অপুর বাকি দেহটা সজোরে এসে পড়ল রাস্তার উপরে।

ঘাসের উপরে সশব্দে আছড়ে পড়ল শরীরটা। ভয়ানক জোরে কোমর ঠুকে গেল মাটিতে। চোখে অন্ধকার দেখল সে।

'শুয়োরের বাচ্চা...' ঘাসের উপরে ওলট পালট খেতে খেতেই ককিয়ে উঠল অপু। যে জায়গায় ও পড়েছে তার ঠিক কাছেই পাঁচ নম্বর বেঞ্চের উপর থেকে একটা ছেলে বসেছিল। সে হাঁই-হাঁই করে উঠে এসে চিৎকার করে কী যেন বিলাপ করতে লাগল।

যন্ত্রণার মধ্যে অপু শুনতে পেল ছেলেটা বলছে, 'দিলেন, দিলেন তো আমার সকালবেলার ব্যবসাপাতি নষ্ট করে। এদের মতো আনাড়ি লোকজন রাস্তায় চলাফেরা করে বলেই...'

অদ্ভুত! একটা মানুষ পড়ে গেছে, তাকে সাহায্য করার নাম নেই, উল্টে হম্বিতম্বি করছে!

কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে গা হাত পায়ে ধুলো ঝাড়ে অপু। ব্যবসা! ছেলেটার সঙ্গে ব্যবসা করার মতো কিছুই নেই! কোমরের কাছটা ঘষতে ঘষতে তার দিকে চেয়ে অপু বলে, 'আপনার ব্যবসা কিসের?'

ছেলেটা মাটির দিকে তাকিয়ে কপাল চাপড়াতে থাকে, 'মালা!'

যন্ত্রণার মধ্যেও ছেলেটাকে আপদমস্তক একবার দেখে নেয়। তার হাতে সুতো গোছের এক গোছা কিছু ঝুলছে বটে, কিন্তু মালাটালার তো চিহ্ন নেই!

'আপনি মালা বেচেন! কই আশপাশে কোথাও তো কোনও মালা দেখছি না!'

সে উত্তর দেয় না। আবার ফিরে বেঞ্চের উপর দিয়ে বসতে বসতে বলে, 'আরে যান যান, সকালবেলা ফালতু বকবেন না তো। শালা মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেল আজ... ধুর...'

ছেলেটার কথার মধ্যে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। অপু সেখানে দাঁড়িয়েই একটু ঝাঁজ মেশানো গলায় বলল, 'আমি না হয় কোমরে চোট, আপনার কি মাথায়? আলবাল বকছেন কেন? এই ভোরবেলা পার্কের বেঞ্চে ব্যবসা করেন আপনি?'

'কেন আপনার থেকে ট্রেড লাইসেন্স নিতে হবে নাকি?'

'না তা নিতে হবে না, কিন্তু একটা মানুষকে দু-কথা শোনানোর আগে কী নিয়ে শোনাচ্ছি সেটা একবার বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, আপনার ব্যবসার কাঁচামাল কই যে ব্যবসা করছেন?'

ছেলেটা আবার বিশ্রী ভেংচি কাটে, 'কাঁচামাল ছিল, আপনিই মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছেন...'

'মানে?'

আঙুল তুলে এবার অপুর পায়ের দিকটা দেখায় ছেলেটা, 'দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার ওই হাতির মতো চেহারা নিয়ে সেই কাঁচামালের উপরেই পড়ে সব থেঁতলে দিয়েছেন...'

'থেঁতলে দিয়েছি!'

মাটির দিকে তাকায় অপু। ওদের ঠিক মাথার উপরেই একটা ঝাঁকড়া শিউলি গাছ। সারারাত সেই গাছ থেকে ফুল খসে পড়েছে মাটিতে। সাদা চাদরের মতো বিছিয়ে আছে সেটা। অপু হোঁচট খেয়ে তার উপরে এসে পড়ায় চাদরের একটা বড় অংশের শিউলি ফুল প্রায় চেপ্টে গেছে।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অবাক গলায় অপু বলে, 'কিন্তু এ তো রাস্তায় পড়ে থাকা ফুল! এই নিয়েই আপনি মালা বানান বুঝি?'

অপুর মনটা খারাপই হয়ে যায়। ছেলেটাকে দেখে তেমন একটা গরিবগুর্বো বলে মনে হয় না। অন্তত ফুল বেচে যে তার পেট চলে না তা বোঝা যায়। হয়তো ভোরবেলা শখেই এই সমস্ত করে, কিংবা ভালোমতন গড়বড় আছে মাথায়।

সে তাকিয়ে দেখে চাদরের এককোণে বেশ ক-টা ফুল এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়ে গেছে। সেটা দেখিয়ে গলাটা একটু নরম করে বলে, 'কই, দিন দেখি আমাকে একটা মালা...'

ছেলেটা সজোরে ঘাড় নাড়ে, 'ওরকম হয় না।'

'কেন হয় না?'

'আমি ফুল কুড়াই না, ফুল আপনাকেই বেছে দিতে হবে। আমি শুধু মালাটা গেঁথে দেব, আপনি যেমন বলবেন'

অপু অবাক গলায় বলে, 'মহা মুশকিল তো! একি আলু নাকি যে বেছে বুছে কিনব, ফুল তো সব একই, তার আবার বাছবিচারের কী আছে?'

ছেলেটা এতক্ষণে যেন উৎসাহ পায়, সুতোগুলো পাশে নামিয়ে রেখে বলে, 'হ্যাঁ, ওইখানেই আপনাদের ভুল। যে কারণে লোকে আলু কেনে আর যে কারণে ফুল কেনে, তার মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স আছে।'

'কীরকম ডিফারেন্স?'

'আপনি ভেবে দেখেছেন, মানুষ আলু কেনে খেয়ে ফেলার জন্য। রান্না করার জন্য। কিন্তু ফুল তো খাওয়া যায় না তাহলে কেনে কেন?'

'কেন?'

ছেলেটা বড় বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'তাকে শুকিয়ে মরে যেতে দেখার জন্য!'

'ধুর! কীসব বলেন আপনি!'

'ওমা! আপনি জানেন না? যেকোনও সুন্দর কিছু দেখলে আসলে ওইটাই মনে হয় আমাদের। সুস্বাদু খাবার দেখলে আমাদের ব্রেন সংকেত দেয় সেটা খেয়ে ফেলতে, নরম বিছানা দেখলে সংকেত দেয় ঘুমাতে, ভালো গান শুনলে ভলিউম বাড়িয়ে দেওয়ার সংকেত দেয়, কিন্তু সৌন্দর্য? সৌন্দর্যর সামনে দাঁড়িয়ে ব্রেন কী রেসপন্স করবে ভেবে পায় না। কনফিউজড হয়ে যায়। ফলে সে সৌন্দর্যকে শত্রু মনে করে আর নষ্ট করে ফেলতে চায়...'

'মানে আপনি বলছেন...'

'এই যে ধরুন আপনি বাচ্চা দেখলেই তার গাল টিপে দিচ্ছেন, কেন? ওর সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্য... খানিকটা সেই কারণেই মানুষ প্রেমও করে জানেন, একটা সুন্দর মানুষ দেখলাম। ভাবলাম এত সৌন্দর্য আমার পছন্দ হচ্ছে না! অতএব চলো, এর খারাপ দিকগুলো খুঁজে বার করি। তারপর খারাপ দিক বের করতে করতে এক সময় আলাদা হয়ে যায়...'

ছেলেটার সত্যি মনে হয় গোলমাল আছে মাথায়। পাগলের মতো কীসব বলে চলেছে। অপু প্রতিবাদ করে বলে, 'আপনাকে কে বলেছে যারা প্রেম করে সবাই আলাদা হয়ে যায়?'

ছেলেটা মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকায়, 'সবাই হয় তো বলিনি...' হাতের সুতোটা তুলে ধরে ছেলেটা, 'এই যে, মালা গেঁথে রাখতে হয়... এই মালায় যেসব ফুল গাঁথা হবে তার একসঙ্গে পচে যাবে, একসঙ্গে কালো হয়ে যাবে...'

নিচু হয়ে একমুঠো ফুল এনে ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দেয় অপরাজিতা, ছেলেটা একটা সুতো টেনে নিয়ে একটা একটা করে ফুল সেই সুতোয় ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, 'এই জন্যই বেছে নিতে হয়, বুঝলেন? রোজ রাতে এতগুলো ফুল ঝরে পড়ে, কে কার সঙ্গে মিশতে চায়, কে কার সঙ্গে শুকিয়ে যেতে চায়, সেটা তো বুঝে নিতে হবে নাকি?'

ছেলেটার মুখের দিকে তাকায় অপরাজিতা। ভারি নরম, মিষ্টি একটা মুখ।

মোটামুটি ফর্সা, মোটা ঠোঁট, গালে মিহি একপরত স্নেহপদার্থের প্রলেপ। তবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে কোথায় যেন একটা উদাসীন ভাব চোখে পড়ে। যেন চারপাশের দুনিয়ার দিকে বিশেষ নজর নেই ছেলেটার, একমনে মালা গেঁথে চলেছে সে।

'আপনি রোজ ভোরে আসেন এখানে?' অপু জিগেস করে।

'হুম, রোজ।'

'রোজ মালা গাঁথেন?'

উপরে নিচে মাথা নাড়ায় ছেলেটা, 'আগে একটা বুড়ি বসত এখানে। আমি এখানে হাঁটতে আসতাম, রোজ একটা করে শিউলি ফুলের মালা কিনতাম তার থেকে। সে মরে যেতে ভাবলাম নিজেই করি। নইলে এমন একটা ম্যাজিক...'

'ম্যাজিক?'

ছেলেটা আনমনেই বলে, 'সেয়ানা ছিল বুড়িটা, বলত শিউলি ফুলে নাকি ম্যাজিক থাকে। কেউ কাউকে শিউলি ফুল দিলে সে তাকে আর ছেড়ে যেতে পারে না!' মালাটা ওর দিকে এগিয়ে দেয় ছেলেটা, 'এই নিন...'

হাসি মুখেই সেটা হাতে গলিয়ে পরে নেয় অপরাজিতা, 'আচ্ছা এই মালাটা কতক্ষণ থাকবে?'

'ও থেকে যাবে। কোথাও যাবে না। তবে একটা সময় পরে আপনি হয়তো রাখতে চাইবেন না। ঘণ্টাখানেক রেখে দিন...'

এবার হেসে ফেলে অপরাজিতা, 'আপনি বেশ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারেন, তা করেন কী? মানে ভোরবেলা শিউলি ফুল বেচে তো আর মানুষের পেট চলে না...'

'চাকরি? করি না, করতাম...'

'কীসের?'

'ওই বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে যা করা যায়। সাংবাদিকতা... আপাতত কাঠ বেকার, আপনি?'

'আমার সেলসের চাকরি, ছোটাদৌড়ির কাজ মেইনলি...'

একটা বাঁকা হাসি হাসে ছেলেটা, তারপর বলে, 'আমাদের জীবনটাও এই পার্কের মতোই, বুঝলেন? আপনি ছুটছেন, আমি বসে আছি। নেহাত আপনি ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন নইলে কোনওদিনও আলাপ হত না। যাই হোক, আমি উঠি...'

হঠাৎ করেই কথাটা বলেছে ছেলেটা, অপুর মুখ দিয়ে অজান্তেই প্রশ্ন বেরিয়ে যায়, 'উঠবেন! কেন?'

ছেলেটা ফিরে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'প্রথমত আর মালা গাঁথার মতো ফুল নেই এখানে, দ্বিতীয়ত বেশিক্ষণ বসে থাকলে আমি যে বেকার সেটা আরও প্রকট হয়ে উঠবে... আর...'

'আর?'

'আর আমি না উঠলে আজ সারাদিন আপনাকে এখানেই বসে থাকতে হবে...'

'মানে! কেন?'

আঙুল বাড়িয়ে অপরাজিতার হাতে গলানো মালাটা দেখায় ছেলেটা, 'ওই ফুলগুলোর জন্য, বললাম না ওই শিউলি ফুল কেউ কাউকে দিলে সে আর ছেড়ে যেতে পারে না...'

কথাটা বলতে বলতেই হনহন করে উল্টোদিকে হাঁটা লাগায় ছেলেটা। কয়েক সেকেন্ড সেখানে হতভম্ব হয়ে বসে থাকে অপরাজিতা। কী অদ্ভুত পাগলাটে কিন্তু রহস্যময় একটা মানুষ। এমন জোর দিয়ে কথাটা বলল যেন নিজেও বিশ্বাস করে এইসব আজগুবি গালগল্প।

হাতটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয় অপরাজিতা। অপরিচিত সুবাসে ভরে যায় তার বুকটা... সত্যি কি ম্যাজিক আছে ফুলে?

(৩)

আধঘণ্টার মধ্যে ফ্রেশ হয় নেয় অপরাজিতা। জানলা দিয়ে সকালের রোদ ওর গায়ে এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে ছেঁড়া রোদের ছটা সরে যাচ্ছে মুখের উপরে থেকে। প্রথম যেদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সায়ন্তনের সেদিন মনে

হয়নি মানুষ ভেতরে কোথায় যেন একটি কুটিল স্বার্থপরতা আছে। একটা ভয়ানক শক্ত ইটের দেওয়াল আছে যা পেরিয়ে ও কাউকে ঢুকতে দেয় না।

শেষ কবে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে? না হলেও আজ থেকে ছ'সাতমাস আগে। এমনিতে দেখা হওয়ার একবছর পরে ও চাকরি সূত্রে ব্যাঙ্গালোর চলে আসে। সায়ন্তনও ব্যাঙ্গালোরে পোস্টিং পেয়েছিল, কিন্তু নেয়নি। কলকাতা ছেড়ে সে নড়তে চায় না। অপরাজিতার সঙ্গে নিয়ত দেখা হওয়ার থেকে ওর কাছে ঢের বেশি দরকারি ছিল ওর শহরের মধ্যবিত্ত নিরাপত্তা আর চেনা রিক্সাওয়ালার মুখ।

খানিকটা অভিমানেই কলকাতায় ফিরতে চাইত না অপু। এর মধ্যে ওর খারাপ দিন এসেছে, হতাশা এসেছে। অফিসে গালাগাল খেয়েছে, বাড়ির লোক ফোন করে মুখ ঝামটা দিয়েছে, ওর রুমমেট মেয়েটি দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, এর মধ্যে কোনওটাতেই সায়ন্তনকে কাছে পায়নি অপরাজিতা। সামনে থেকে যন্ত্রণায় হাত বুলিয়ে দেওয়া আর ফোনের ওপাশ থেকে বড় বড় বাণী শোনানোয় আকাশপাতাল ফারাক।

একদিন পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে রাগ আর অভিমান মেশানো চিৎকারে ফেটে পড়েছিল অপরাজিতা, 'এত কিছু ঘটে গেল আর তোমার একবারও মনে হল না একবার আমার সামনে আসা দরকার তোমার? তুমি কি মানুষ না পিশাচ?'

'আসলে ফ্লাইটটা বুক করতে গেলেই...'

'জাস্ট শাট আপ, তোমার এইসব অজুহাত বহুত শুনেছি আমি। তুমি আসলে কুয়োর ব্যাঙ একটা। তোমার পক্ষে শুধু মানুষ কেন, একটা পোষা বিড়ালেরও দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব না...'

'কেন? আমি দায়িত্ব নিইনি তোমার?'

'নিয়েছ? শুধু ক-টা উঁচু উঁচু কথা বলা আর মোটিভেশন দেওয়া ছাড়া আমার জন্য আর কী করেছ তুমি?'

'আর কী করতে পারি বলো?'

'আর কিছুই যখন করতে পারতে না তখন আমার জীবনটা যেচে পড়ে

নষ্ট করলে কেন... বলো কেন করলে জানোয়ার? আজ একটা অচেনা শহরে রোজ রাতে আমাকে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমোতে যেতে হয়। তুমি ঘুরেও তাকাও না, খোঁজও নাও না... তোমার কাছে তোমার কাজ ছাড়া, আর্টিক্যাল লেখা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও জিনিসের কোনও মুল্য আছে?'

কথাগুলো বলতে বলতে নিজের মাথার চুল খামচে ধরে অপরাজিতা, অশ্রু আর উন্মাদ চিৎকারে কথা হারিয়ে গেছে তার, 'আজ শুধু রিগ্রেট হয় একদিন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বলে...'

সায়ন্তন ঝগড়া করত না কখনও, চিৎকার চেঁচামেচিও না। চুপ করে যেত একসময়। কেবল এপাশ থেকে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেত অপু। বুকে মাথা রেখে যে নিঃশ্বাসের আওয়াজ একসময় শান্ত করে যেত ওকে সেই নিঃশ্বাসের নিস্পন্দতা ভীষণ অসহ্য মনে হত।

ব্যাঙ্গালোরে এসে নতুন বন্ধু-বান্ধব হয়েছিল অপুর। ওদের বয়ফ্রেন্ডরা ওরা রাগ করলে দরজায় গোলাপ ফুল কিংবা টেডি বিয়ার রেখে যায়। কেউ কেউ নিজে হাতে বিরিয়ানি বানিয়ে সটান বাড়ি চলে আসে। অপরাজিতার অবশ্য এসব একটু আদিখ্যেতাই লাগে। ওর কেবল ভীষণ একা লাগে। ওর জীবনের কোথাও কোনও ভালোবাসার স্পর্শ নেই। ছায়া নেই, সায়ন্তন যেন থেকেও থাকে না, যেন উপন্যাসে পড়া কোন ভবঘুরে চরিত্রের প্রেমে পড়েছিল ও।

বছরখানেক আগে থেকেই সায়ন্তনের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। প্রিয় খেলা নিয়ে খেলতে খেলতে বিরক্ত হয়ে যাওয়া শিশু যেমন করে খেলনা দূরে সরিয়ে রাখে, ঠিক তেমন করেই।

এই এক বছরেই উষ্ণতা বেড়েছে তন্ময়ের সঙ্গে বন্ধুত্বে। তন্ময় অপরাজিতার স্কুল জীবনের বন্ধু। ছেলেটা ভালো গিটার বাজায়, ফটোগ্রাফি করে, খুব ভালো ছবিও আঁকতে পারে। অপরাজিতা আর তন্ময় একই মিউজিক স্কুলে গিটারে ভর্তি হয়েছিল। কিছুদিন শিখেওছিল। শেষে অপু ব্যাঙ্গালোর চলে আসতে সেটা কন্টিনিউ করা হয়নি। তবে মিউজিক নিয়ে আগ্রহ আছে দু-জনেরই।

অপু মন খারাপ করলে কীভাবে যেন বুঝতে পেরে যায় তন্ময়। তখন গিটারে গান গেয়ে পাঠায় ওকে। তাতে কিছুক্ষণের জন্য মনটা অন্যদিকে থাকে। অপরাজিতা জানে তন্ময় ওকে পছন্দ করে। হয়তো ভালোওবাসে। কিন্তু সায়ন্তনকে ঠকাতে চায় না অপু। সায়ন্তন ওকে কখনও ঠকায়নি।

মাঝে মাঝে এটা ভাবলেই বড় বিরক্ত লাগে ওর। অন্তত কিছু মিথ্যে যদি বলত, বন্ধুদের সঙ্গে হুট করে কোথাও ঘুরতে যাওয়া নিয়ে, কোনও বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া নিয়ে, কিংবা কোনও সেলিব্রেটি ক্রাশকে ইনস্টাগ্রামে পিং করা নিয়ে... কিন্তু কোথায় কী? ছেলেটা গড়গড়িয়ে সব বলে দিয়েছে ওকে। আর যাই হোক ঠকাতে পারবে না অপরাজিতা।

তাই কাল রাতে ঠিক করেছে সব কিছু বলে দেবে। বলে দেবে অনেকদিন আগেই এই সম্পর্কটা মরে গেছে। যেটুকু পড়ে আছে তা কেবল কিছু নিয়মকানুনের বেড়াজাল। অমুক সময়ে ফোন করা, অমুক জায়গায় যাওয়ার আগে টুক করে একটা সেলফি তুলে পাঠানো, কিংবা ক-দিনের জন্য কোথাও ঘুরতে গেলে একবার জানিয়ে যাওয়া— আগামী দু-দিন ফোনে অতটা অ্যাভেলেবেল নাও থাকতে পারি।

কবে যেন মানুষটা, মানুষটার সঙ্গে থাকতে চাওয়াটা, একটা নুন হলুদের দাগ লাগা, গামছা হারিয়ে ফেলা, পিঠে সাবান বুলিয়ে দেওয়া দুপুরের স্বপ্ন ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেছে ওর বুকের ভেতরে, কেবল নোনা জলের দাগ রয়ে গেছে। আজ সেই দাগটুকু মুছে ফেলার পালা।

তন্ময় অবশ্য ওকে জোর করেনি। কাল রাতে বার বার বলেছে, 'তুই ভেবে দেখ অপু। যদি সম্পর্কে থাকতে চাস, আরো সময় দিতে চাস নিজেদের, তাহলে আমিও অন্তত তোকে জাজ করব না। তোর দিক থেকে ডেডিকেশন তো কোনওদিন কম ছিল না...'

নিজেকে সামলে নিতে নিতে অপু বলেছে, 'আমার আসলে একটা মায়া পড়ে গেছে ওর উপরে। এতটা সময় একসঙ্গে কাটানো, ছোট থেকে অনেকগুলো মানুষকে হারিয়ে ফেলেছে তো। ওর মায়ের মৃত্যু, দাদুর ওরকম একটা অ্যাক্সিডেন্টে বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া, পোষা কুকুরটাকে খুব ভালোবাসত,

সেও চোখের সামনে গাড়ি চাপা পড়ে... এতকিছুর মধ্যে আমি একটা আলো হয়ে ছিলাম ওর কাছে, এখন আমি চলে গেলে সেটাকে...'

'আর তুই? তুই কিছু পাসনি?'

'পেয়েছি...' কবজির উল্টোদিক দিয়ে নাক মুছে উত্তর দিয়েছে অপু, 'পেয়েছি। অবহেলা, অবজ্ঞা, আমার চোখের জল দেখেও মুখ ফিরিয়ে থাকা। ও মানুষটাই ওরকম তন্ময়, জীবনের যে দিনগুলোতে আমার পাশে দরকার ছিল ওকে, ও ছিল না। ওর কাছে ওর নিজের অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনও কিছুর দাম নেই...'

বাথরুমে ঢুকে আসে অপু। ওর কানে এখনও বেজে চলেছে নিজের গলাটা, 'অবজ্ঞা আর অবহেলা ছাড়া আর কী দিয়েছ তুমি আমাকে? কী দিয়েছ আমাকে এতদিন? বল?'

তন্ময়কে একটা ফোন করতে ইচ্ছা করে অপরাজিতার। কিছু একটা আছে ছেলেটার গলার আওয়াজের মধ্যে। শুনলে মন শান্ত হয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওর ঘুম না আসার চক্করে তন্ময়ও কাল সারারাত ঘুমায়নি। এখন হয়তো ঘুমোচ্ছে। এখন জাগানো ঠিক হবে না।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের তলায় দাঁড়ায় অপু। একটু দূরে ব্লুটুথ স্পিকারে একটা গান বাজছে। কাল সন্ধ্যেয় গিটার বাজিয়ে সেটা রেকর্ড করে পাঠিয়েছে তন্ময়। গানের কথাগুলো ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,

মেরি প্রীত কা কাজল তুম আপনে নায়নো মে মালে আনা...
যাব শাম ঢালে আনা, যাব দীপ জ্বালে আনা...

(৪)

'উঃ শালা পুড়ে গেল হাতটা!' অপু চেঁচিয়ে উঠতেই খপ করে ওর হাতটা চেপে ধরে সায়ন্তন। দ্রুত পকেট থেকে একটা বোরোলিনের টিউব বের করে ওর হাতের উপর লাগাতে থাকে।

সেদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অপু, বলে, 'তুই পকেটে বোরোলিন নিয়ে ঘুরিস নাকি?'

'ঘুরি না। আজ নিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

'জানতাম, ফানুসে আগুন লাগাতে গিয়ে তুই ছড়াবি।'

আজ কালীপুজো। আকাশটা আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে গেছে। চারদিক থেকে মুহুর্মুহু ভেসে আসছে বাজির শব্দ, কখনও বা গোটা আকাশের বুকে ফাটা নক্ষত্রের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রকেট। অপুর মুখ ভরে উঠছে সেই আলোর ছটায়। অপরাজিতাদের ছাদেই বাজি পোড়াতে উঠেছে ওরা দু-জনে। বাকি বন্ধুরাও আছে, তবে ওদের দু-জনকে প্রাইভেসি দিতে ছাদের অন্য দিকে ভিড় করেছে তারা। অপুর জন্য আগে থেকেই ক-টা ফানুস কিনে রেখেছিল সায়ন্তন। ওর অন্য বাজি পোড়ানোয় তেমন আগ্রহ নেই। কেবল ফানুস উড়িয়ে অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগে তার। আজও সেই চেষ্টাই করছিল। সায়ন্তন ধরেছিল ফানুসটাকে। এমন সময় লাইটারের খোঁচায় ছ্যাঁকা লেগেছে হাতে।

সায়ন্তনের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অপু বলে, 'তুই প্রেমে পড়ে কেমন যেন বদলে যাচ্ছিস ভাই...'

'বদলে? কেমন?' সায়ন্তন চোখ না সরিয়েই বলে।

'এই যেমন আগে স্বার্থপর, উদাসীন টাইপের ছিলি। এখন বেশ কেয়ারিং গোছের হয়ে গেছিস!'

'এখনও আছি, ভুল ধারণা তোর...'

'বটে! তাহলে হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিস যে, এতগুলো সাদা ফানুস কিনে আনলি যে...'

'মায়ের শরীরটা ভালো নেই। জ্বর এসেছে। তাও ফেলে রেখে এখানে চলে এলাম। কারও না কারও প্রতি স্বার্থপরতা করলাম তো...'

অপুর মুখের হাসিটা নিভে আসে, চাপা গলায় বলে, 'তুই চাইলে চলে যেতে পারিস এখন। আমি একা একাই ফানুস ওড়াব।'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখে সায়ন্তন, 'চিন্তার কিছু নেই। ওষুধ খাইয়ে এসেছি। আপাতত কম আছে জ্বরটা...' দূরে আকাশের দিকে দেখায় ছেলেটা, 'ওই রকেটটা দেখ অপু...'

অপুর মুখটা আবার আলোয় ভরে ওঠে, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই বলে, 'জানিস সান, আমার তোর মতো ছেলের সঙ্গে প্রেম হবে আমি কোনওদিন ভাবতেই পারিনি...'

'তাহলে কেমন ছেলের সঙ্গে হবে ভেবেছিলি?'

'এই যেমন ধর একটু ছটফটে জ্যাক-অফ-অল ট্রেডস গোছের। ধর ভালো গিটার বাজাতে জানে, গান গাইতে জানে, ছবি আঁকতে পারে আমার মন খারাপ হলে গান শোনাবে, আমার পোর্ট্রেট একে দেবে, নানারকম পোজে ছবি তুলে দেবে। আবার ভীষণ ডেডিকেটেড আর কেয়ারিং একটা মানুষ হবে। সোজা কথায় যার ভালোবাসার মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি থাকবে। মানে সিনেমার হিরোরা যেমন হয় আর কী...'

'আমি এসব কিছুই পারি না...' সায়ন্তনের গলা ভেঙে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, 'একটু-আধটু লিখতে পারি, তাও গান বা কবিতা না। এককালে কিছু গল্প লিখেছিলাম... সেসব...'

'তাও কেন ভালোবেসে ফেললাম বলতো?'

সায়ন্তন একটা অদ্ভুত হাসি হাসে, 'হয়তো আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যার খোঁজ তুই এখনও জানিস না।'

'সেটা কী?'

'হতে পারে আমি কোনও সুপারহিরো। মেরি জেন কি আর জানত পিটার পার্কারই স্পাইডারম্যান...'

'হুঁহ, তুই যদি হোস তাহলে উদাসম্যান হবি। যার কিছুতেই কিছু এসে-যায় না। ওটাই তোর সুপারপাওয়ার!'

ওর দু-কাঁধে দুটো হাত রাখে সায়ন্তন, ছেলেটার চোখের মণিতে এখন হাজার নক্ষত্রের ছটা খেলা করছে। হাতদুটো যেন নরম হাওয়ার মতো স্পর্শ করে রেখেছে অপুকে, 'তোকে কে বলেছে আমার কিছুতে যায়-আসে না?'

'আসে? আচ্ছা, বল আজ আমি এখানে না থাকলে, তোর কাছে না থাকলে কী মনে হত তোর? কতটা কষ্ট হত? চারিদিকে এত আলো, এত আওয়াজ, এত কোলাহল, শুধু আমি নেই... কেমন লাগত তোর?'

‘আমার কুকুরটার কথা মনে পড়ত...’

‘কুকুর! মানে আমি...’

‘ও এই দিনটায় খুব ভয় পেত, জানিস? বাজির আওয়াজ আর বারুদের গন্ধে ভয়ে গুটিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ত। কেউ ডাকলেও আর বেরিয়ে আসত না। আমার মনে হত ও আশপাশেই কোথাও আছে। ভয় পেয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজছে...’

‘কিন্তু আমি...’

‘আর একটা বিশাল ঈগলের মতো দেখতে পাখি, বুঝলি। ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে দেখেছিলাম, চারটে লোক মিলে ওকে ধরে জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছে। এমন করে বিশাল ডানা মেলে আছে যে এক-একটা ডানা দু-জন লোক মিলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাখিটার কী ভাব! যেন ওর যোগ্য সিংহাসনে বসাতে নিয়ে যাচ্ছে ওকে... আমি জবাই করাটা দেখিনি। কিন্তু ওই ডানা মেলা পাখিটার কথা মনে পড়লে খুব কষ্ট হয় আমার...’

‘কিন্তু আমার না থাকার সঙ্গে এসব কথা...’

‘আমার খুব ভয় করত অপু...’ সায়ন্তনের গলা দূরে ভেসে যায়, ‘এই শহরের সব আলো আর আওয়াজের মধ্যেও ভীষণ ভয় করত আমার তুই না থাকলে। আমার মাথার ভিতর সব অন্ধকার আর বিষণ্ণ ভাবনাগুলো দূরে সরিয়ে দেওয়া একটা সুপারহিরো তুই...’

দুটো হাত সায়ন্তনের গালের উপরে রাখে অপু, ‘এই সব আলো থাক না থাক আমি থাকব সবসময়...’ ওর মাথাটা সায়ন্তনের বুকের উপরে নেমে আসে। হঠাৎ করেই ওর মনে হয় বাজির আওয়াজ কমে গেছে। সেই জায়গার কানে আসছে একটা নিরবচ্ছিন্ন হৃদস্পন্দনের শব্দ!

‘চল একটু নিচে যাই, হেঁটে আসি...’

‘চল...’

ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে আসে ওরা। রাস্তাটাও ফাঁকা নেই আজ। দু-পাশে বাচ্চা ছেলেপুলের দল কেউ চরকি ঘোরাচ্ছে তো তুবড়ির সলতেতে আগুন লাগাচ্ছে কেউ। সেই আগুনের আলোয় ভরে আছে রাস্তাটা। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বারুদের গন্ধ!

অপু সায়ন্তনের কনুইয়ের উপরটা চেপে ধরে। নিঃশব্দে হেঁটে আসে কিছুদূর। মাঝে মাঝে দু-জনের মধ্যে থাকা শারীরিক দূরত্বটা শূন্য হয়ে যায়। দু-জনের কারও অস্বস্তি হয় না তাতে।

'তোর আফসোস হয়?' সায়ন্তন উদাস গলাতেই জিজ্ঞেস করে।

'কী নিয়ে?'

'এই যে আমি কিছু পারি না। গিটার, গান, ফটোগ্রাফি?'

'ওগুলো নিয়ে তেমন হয় না। কিন্তু আর একটু কেয়ারিং হলে ভালো হত— এই যেমন বোরোলিন লাগিয়ে দিলি, ওইটাই, আর একটু বেশি...'

'হাতটা যেভাবে শক্ত করে চেপে ধরেছিস তাতে সে বোরোলিন উঠে গেছে এতক্ষণে...'

'হুঁহ্‌, ওষুধটা বড় কথা নয় মিস্টার। যত্নতেই অসুখ সারে...'

সায়ন্তন ওর দিকে একবার চেয়ে মুখ বাঁকায়, 'এইটা খুব ক্রিঞ্জ হচ্ছে ভাই। পনেরো বছরের খোকাখুকিরা এইসব বলে প্রেম করে...'

'আচ্ছা? আমি একটা পঁচিশ বছরের ছেলেকে চিনি যে বিশ্বাস করে ভোরের শিউলি ফুল দিয়ে মানুষকে আটকে রাখা যায়!'

সায়ন্তন প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়ায়, 'এই ওটা নিয়ে ইয়ার্কি না কিন্তু। ওর ফল আমি সত্যি সত্যি পেয়েছি!'

'তাই! কবে?'

'এইরকম একটা ন্যালাখ্যাপা ছেলের সঙ্গে যে এতদিন থেকে গেলি সেটা কিসের জন্য মনে হয় তোর? হুঁ?'

ওদের ঠিক পাশেই একটা তুবড়ি জ্বলে নিভে যায়। দুটো মানুষের শরীর সাদা আলোতে ভরে ওঠে। আবার অন্ধকার ঢেকে ফেলে ওদের।

'সাবধানে দে, তুবড়ি কিন্তু বার্স্ট করে...' পাশ থেকে চেঁচিয়ে ওঠে কেউ।

'বেশ তাহলে আর ক-দিন আটকে রাখতে পারিস দেখি...' অপরাজিতা আবার সামনে পা চালাতে চালাতে বলে।

'মানে? তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

‘ব্যাঙ্গালোর। প্রবাবলি নেক্সট মান্থ! বিশ্বনাথ আঙ্কেলকে বাবা সেই বলেছিল মনে আছে?’

‘সেকী! এতদিন তো বলিসনি আমাকে?’

‘আমি তো জানতে পারলামই আজ দুপুরে। ভেবেছিলাম কালীপুজোটা মিটে গেলে তোকে জানাব।’

সায়ন্তন দাঁড়িয়ে পড়েছে। অপু একটু এগিয়ে গিয়েও ফিরে তাকায় ওর দিকে, ‘কী হল, থেমে গেলি কেন?’

‘তুই সত্যি চলে যাবি?’

‘কেন, ভয় করবে তোর?’ ওর মুখে একটা মিহি হাসি খেলে যায়।

‘তুই থাকতে পারবি আমাকে না দেখে?’

কী যেন মিশে ছিল প্রশ্নটায়। অপুর মাথা বুকের উপর নেমে আসে। আশপাশে আর কোনও বাজি জ্বলছে না। অন্ধকারে ঢাকা মুখটা আর দেখতে পায় না সায়ন্তন। কয়েক সেকেন্ড পরে ফিসফিসে গলায় শোনা যায়, ‘তুই একটা চাকরি নিয়ে চলে আসতে পারবি না ওখানে? আমার কাছে তো উপায় নেই বল?’

‘কিন্তু আমি এই শহরটা ছেড়ে...’

‘এই যে বললি ভয় লাগবে এখানে?’

সায়ন্তনের গলা আবার মিলিয়ে আসে দূরে, ‘কী জানি, আমার সঙ্গে এই শহরটার কোথায় একটা যেন মিল আছে অপু, ঠিক বুঝতে পারি না। কেবল মনে হয় অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না।’

‘বেশ। আসিস না। আমি বাড়ি যাই...’

কথাটা বলেই দ্রুত হাঁটা লাগাতে যাচ্ছিল অপু, কিন্তু তার আগেই ওর ফোনটা বেজে ওঠে। সেটা পকেট থেকে বের করে সায়ন্তনের দিকে তাকায় অপু, ‘তোর বাড়ি থেকে ফোন আসছে, কিন্তু আমার নম্বরে কেন?’

‘আমার ফোনটা সাইলেন্ট মনে হয়। দেখ কী বলছে...’

মাকে পুড়িয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হল সায়ন্তনের। হঠাৎ করেই হার্ট

অ্যাট্যাক। যে কয়েক সেকেন্ড জ্ঞান ছিল ছেলেকেই দেখতে চেয়েছিলেন কয়েকবার। একসময় সব চাওয়াই নিভে আসে।

ফিরতি পথে গাড়িতে অপরাজিতার পাশেই স্থবির হয়ে বসেছিল সায়ন্তন। মুখে সেই উদাস ভাব। রাতের হাওয়া ওর অবিন্যস্ত চুলগুলোকে আরও এলোমেলো করে দিচ্ছে। জলের গন্ধ নেই কোথাও। কেবল পোড়া ধোঁয়া বারবার নিঃশ্বাস ঢেকে দিচ্ছে।

হাতের চাপে ওর মাথাটা নিজের কাঁধের উপর নামিয়ে আনে অপু। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'তোর খুব ভয় করছে, না রে সান?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে দু-দিকে মাথা নাড়ায় সায়ন্তন, 'না, একটা ভয় চিরকালের মতো জিতে নিলাম...'

(৫)

'কী করেছ তুমি আমার জন্য? এই তিনটে বছরে কী দিয়েছ আমাকে?'

প্রশ্নটা হাহাকারের মতো শোনায়। বাজতেই থাকে অপরাজিতার কানে। অবহেলা, অবজ্ঞা, প্রায়োরিটি লিস্টে শেষের দিকে একটা দায়সারা সান্ত্বনা পুরস্কার? কী প্রয়োজন ছিল এই সম্পর্কে জড়ানোর?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরতেই ফোনটা বেজে ওঠে অপুর। তন্ময় ফোন করছে, ও কানে লাগিয়ে একটু বিরক্তি মাখা গলাতেই বলে, 'তুই এক্ষুনি তো ঘুমালি, এর মধ্যেই উঠে পড়তে হল!'

'তোকে একা একা ওখানে যেতে দেব ভেবেছিস?' তন্ময়ের গলায় যেন চাপা বিদ্রুপ, 'যে লেভেলের ইমোশনাল তুই। কী বলতে কী বলে গোটা ব্যাপারটা ছড়িয়ে দিবি...'

'এত বছর পাশে কেউ ছিল না, সব দিব্যি সামলেছি। এখন এত প্যাম্পার করার দরকার নেই আমাকে।'

'সামলেছিস? তাহলে ওই লোকটা এখনও তোর জীবনে থেকে যেত না।'

মাথার উপর থেকে চুল সরিয়ে জানলার কাচ দিয়ে বাইরে তাকায় অপু, 'তোকে অনেকবার বলেছি তন্ময়, ও আমার জীবনে আজ মাসছয়েক হল

নেই। আমার ওকে, ওর আমাকে দরকার হয় না। যেটা রয়ে গেছে সেটা অভ্যেস। সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বলতাম একটা সময়ে। সেটা একেবারে নীল হয়ে গেলে একটু অস্বস্তি হবেই... তাছাড়া ওর ওই ছোট ছোট পাগলামিগুলো মিস করলে...'

'ওই... ওই দিয়েই জাদুটোনা করে রেখেছে তোকে। ক-টা আজগুবি কথা বলে টক্সিক সম্পর্কে ফেলে রেখেছে...'

উপরে নিচে মাথা নাড়ায় অপু, 'জানি, সম্পর্কটা টক্সিক হয়ে গেছে। আমি হুট করে কিছু ডিসিশন নিই না...'

আজ সকালেই ব্যাঙ্গালোর এসে অপুকে জানিয়েছে সায়ন্তন। ফোনে অবশ্য কিছু খুলে বলেনি অপু। বলেছে বিশেষ জরুরি কিছু কথা আছে। তার জন্য একঘণ্টা সময় দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু সামনাসামনি দেখা হওয়া দরকার। তেমন হলে সে বিকেলের ফ্লাইট ধরেই আবার কলকাতা ফিরে যেতে পারে। অপু জানে একটা গোটা দিন কিছুতেই অকারণে এখানে পড়ে থাকবে না সায়ন্তন।

'এটা নভেম্বর মাস, না রে?' ফোনটা এখনও ধরা আছে দেখে ও জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, কেন?'

'শিউলি ফুল তো অক্টোবরে হয়, নভেম্বরেও হয় মনে হয়?'

'উফ!' তন্ময় এবার তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে, 'শিউলি ফুলে কোনও ম্যাজিক নেই অপু। নিকট্যান্থেস আরবর ট্রিস্টিস, ইটস জাস্ট আ ফ্লাওয়ার লাইক এনি আদার। তোকে যেটা আটকে রাখতে পারে সেটা তোর মায়া, আর দু-চারটে ছেঁদো ইমোশনাল কথা। আর এই মায়া কাটিয়ে তোকে বেরিয়ে আসতে হবে। ফর ইয়োর সেক!'

অপুর মুখেও একটা হাসি ফুটে ওঠে এবার, 'আসলে এতটা সময় ধরে বিশ্বাস করতাম তো ব্যাপারটা, বিশ্বাসটাও একটা অভ্যেস হয়ে গেছে!'

বাইরে ব্যস্ত ঝাঁ চকচকে শহর ছুটে চলেছে। গত দু-বছরে এই শহরটার সঙ্গে একটা আপাত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে অপুর। এখানে মানুষ খুব স্ট্রেট

ফরওয়ার্ড। সবকিছুর মধ্যে একটা ওয়ার্কিং অর্ডার আছে। হচ্ছে হবে করে কিছু চলে না।

কলকাতাকে খুব একটা মিস করে না অপু। ওর তেমন কিছু আর নেই ওখানে। ও শহরের মুখগুলোর মধ্যে কোথায় যেন একটা স্লথ জীবন যাপন, একটা ঝিমন্ত ভাব। এরপর ও ঠিক করেছে বাইরের কোনও দেশে গিয়ে সেটল করবে।

ট্যাক্সিটা যখন রঙ্গিণী পার্কের বাইরে থামে তখন কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা বাজছে। ভাড়াটা মিটিয়ে পার্কের ভিতরে ঢুকে আসে অপু। অজান্তেই চোখ চলে যায় ভিতরে কারশেডের ঠিক পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাঁকড়া শিউলি গাছগুলোর দিকে। সায়ন্তন কি এসেছে এতক্ষণে? এর মধ্যেই কি ফুল কুড়িয়ে নিয়েছে? যা খুশি করুক ও। যেভাবে খুশি, যা খুশি নাটক করুক, অপু নিজের মন গলতে দেবে না।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় অপরাজিতা। জ্যাকেটটা ভালো করে টেনে নেয় গায়ে। সায়ন্তনকে দেখা যাচ্ছে না। লেট করছে মনে হয়। লেট কালচারটা কলকাতার সিগনেচার। প্রেমিকার সঙ্গে শেষবার দেখা করতে এলেও ঘড়ির কাঁটা রেসে হারিয়ে দেয় এদের।

ফোনটা বেজে ওঠে। সেটা সাইলেন্ট করে আবার পকেটে ঢুকিয়ে দেয় অপরাজিতা। দূরে কয়েকটা বাচ্চা রঙিন বল নিয়ে খেলা করছে। আজ মনে হয় রবিবার। স্কুল ছুটি। পার্কের ভিতরেই শীতের আমেজ মাখতে মাখতে জগিং করছে কেউ। একজন পরিচিত মনে হয় অপরাজিতার। ওকে দেখে অল্প হাসে পরিচিতা, আবার ছুটতে থাকে দূরের দিকে।

'একটু দেরি হয়ে গেল অপু, রাগ করিসনি তো?' পেছন থেকে গলাটা শুনে অপরাজিতার বুকের মধ্যে একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল, 'আসলে ফ্লাইটটা এমন ঝোলাল...' হাতের ব্যাগটা কালো বেঞ্চের উপরে রেখে পাশে বসতে বসতে বলল সায়ন্তন।

'আমার তোর উপর আর রাগ আসে না।'

'আচ্ছা?' সায়ন্তনের মুখে আলগা হাসি খেলে যায়, 'তাহলে ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছিস কেন বাবা? কতদিন দেখিনি বল তো তোকে?'

'দেখিসনি?'

সায়ন্তন হাত ঝেড়ে যেন সরিয়ে দিতে চায় প্রসঙ্গটা, 'আরে ওসব ভিডিও কল-ফল সব তোদের কর্পোরেট প্রেমের কালচার। আমাদের শহরে বুঝলি, রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে মাটির ভাঁড়ে...'

'আমি আর তোর সঙ্গে থাকতে চাই না।' কাঠকাঠ গলায় কথাটা বলে ওর দিকে চোখে তুলে তাকাল অপরাজিতা। কাঠিন্য ঝরে পড়ল সেই চোখে।

'তো তুই আমার সঙ্গে আছিস কই? আই মিন দু-বছর ধরে তো...'

'তুই নিজেকে যতটা বোকা প্রিটেন্ড করিস ততটা তুই নোস সায়ন্তন। তুই জানিস আমি কী বলতে চাইছি। অ্যান্ড দ্যাটস ফাইনাল। ইউ হ্যাভ লস্ট মি...'

কয়েকটা অদ্ভুত মুহূর্ত কেটে যায়। সায়ন্তন কোনও কথা বলে না। বাচ্চাগুলো মনে হয় এতক্ষণে খেলা থামিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে। সেই চেনা মুখটাও কোনও গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওদেরই দেখে চলেছে।

'আমাকে ভালোবাসিস না আর, এই তো?' সায়ন্তনের গলা কাঁপে না। ভারি স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন করেছে যেন।

'বাসি, কিন্তু তোর সঙ্গে আর থাকতে পারব না।'

'কেন?'

'কারণ আই ফাকিং সাফার। তোর সঙ্গে এক-একটা দিন কাটে আর আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। ডোন্ট ইউ ফাকিং গেট ইট? আমার জীবনের সব থেকে বড় রিগ্রেট তোকে ভালোবাসা...' একদমে কথাগুলো বলে হাঁপাতে থাকে অপু। নিজের মাথার রগটা চেপে ধরে ও।

'জল খাবি?'

'প্লিজ ডোন্ট ডু দিস।'

ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে ওর দিকে এগিয়ে দেয় সায়ন্তন, 'বাড়ি থেকে জলের বোতল নিয়ে বেরবি সবসময়। শীতকালে তেষ্টা কম

পায় বলে মনে থাকে না...' কথাটা বলে বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ে সায়ন্তন। আর না দাঁড়িয়ে পা বাড়ায় দূরের দিকে।

অপু ডেকে ওঠে ওকে, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

সায়ন্তন অবাক হয়ে ফিরে তাকায় ওর দিকে, 'কোথায় আবার, বাড়ি... ফ্লাইট দেরি আছে। ততক্ষণ লাউঞ্জে বসে...'

কী যেন ভেবে একটু থতমত খায় অপরাজিতা। ঠোঁট দুটো কয়েকবার কেঁপে ওঠে, 'তোর কিছু দেওয়ার নেই আমাকে?'

'আমি ধার নিয়েছিলাম নাকি তোর থেকে?'

আর কিছু বলে না অপু। একটা অদ্ভুত অনুভূতি ক্রমশ ঘিরে ধরছে ওকে। দূরে কারশেডের পাশে গাছগুলোর নিচে ফুল পড়ে আছে। তার গন্ধ, সেই ম্যাজিকের মতো গন্ধ এখান অবধি ভেসে আসছে।

'ঠিক আছে, ভালো থাকিস সান...'

কথাটা বলে দ্রুত পা চালায় অপরাজিতা। পার্কের ভিতরেই বেশ কিছুদূর হেঁটে আসে ও। না, ওর পেছনে কোনও পায়ের শব্দ নেই। ও বুঝতে পারে যেতে যেতে ওর দিকে শেষবারের মতো ফিরে তাকায়নি কেউ।

ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে সেটা বেজে চলেছে এখনও, তন্ময়। রিসিভ করে কানে ধরে অপু। ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলা শোনা যায়, 'ডান?'

'হ্যাঁ বলে দিয়েছি সব...'

'দেন? ও কী বলল?'

'নাথিং, ওর কিছু যায়-আসে না। জাস্ট শুনল, চলে গেল...'

কয়েক সেকেন্ড কিছু উত্তর দেয় না তন্ময়। অপরাজিতা রেখে দিতে যাচ্ছিল ফোনটা। ওপাশ থেকে নৈঃশব্দ্য ভেঙে প্রশ্ন আসে, 'তোর কষ্ট হচ্ছে, নারে অপু?'

এই প্রশ্নটাতেই থমকে যায়— সে। দু-দিকে মাথা নেড়ে বলে, 'সেটাই আশ্চর্য রে ভাই। এতদিন এত পাগলের মতো ভালোবাসলাম ওকে, আমি জানি আজও ভালোবাসি, কিন্তু ওকে ছেড়ে আসতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না কেন আমার...'

ওপাশ থেকে আবার কিছু বলছে তন্ময়। সেসব কানে ঢোকে না অপুর। ওই একটা প্রশ্ন ভাঙা রেকর্ডের মতো কানে বাজতে থাকে ওর, কষ্ট হল না কেন? সায়ন্তনকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হল না কেন?

ঠিক এই সময়ে কোনও অচিন ইশারায় কে যেন ওর কানের কাছে শুনিয়ে গেল একটু আগের প্রশ্নটা, 'কী করেছ তুমি আমার জন্য? এই তিনটে বছরে কী দিয়েছ আমাকে?'

ওর মনে হল আবার একটা রাত নেমে এসেছে। আবার ওদের চারপাশ জুড়ে বাজি ফাটতে শুরু করেছে। আলোয় আলোয় ভরে যাচ্ছে আকাশ। ওর ঠিক সামনে ওর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে সায়ন্তন। মুখে সেই পুরনো নরম হাসিটা খেলা করছে ওর, ওর চোখের দিকে চেয়ে বলছে, 'এই যে ছেড়ে যাওয়াটা, যে যাওয়াটায় তোমার কষ্ট হল না। এমন করে তোমাকে ভালোবাসলাম যে অনায়াসে ভুলে যেতে পারলে। তোমার বুকে কোনও চিরকালীন ছাপ রেখে গেলাম না। সেই ভাঙাচোরা শহরটার মতো, যেখানে আর তুমি ফিরে যেতে চাও না। ওটাই আমার আর্ট অপু, ওটাই আমি পারি... আমার মাকে, আমার মরে যাওয়া কুকুর, বিড়াল, দাদু সবাইকে ওটাই দিয়ে এসেছি আমি... এই যে তোমার আজীবনের ভালো থাকায় কোনও অভ্যাসের শিউলি ফুল রেখে গেলাম না। বলো, আমি কিছু দিইনি তোমাকে অপু?'

রাতটা নিভে আসে হুট করে। বাজির আওয়াজ মিলিয়ে যায় দূরে। কী মনে হতে একবার শেষবারের মতো পেছন ফিরে তাকায় অপু।

নাঃ, কেউ নেই সেখানে। কেবল মৃত্যুপথযাত্রী কিছু শিউলি ফুলের গন্ধ নাকে আসে...



সায়ক আমানের জন্ম ১৯৯২ সালে, কলকাতায়। কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শেষ করলেও, সাহিত্যচর্চাকেই তিনি নিজের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে 'ভাসানবাড়ি' ছাড়াও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও পাঁচটি উপন্যাস ও একাধিক ছোটগল্প সংকলন।

লেখালেখি এবং অডিও জগতে সমলয়ে বিচরণ তাঁর। বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় অডিও স্টোরি সিরিজ, মিডনাইট হরর স্টেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং 'Midnight Horror Station' Spotify podcast-এর সঞ্চালক। বর্তমানে নিজের ইউটিউব চ্যানেল ছাড়াও কাজ করছেন জনপ্রিয় রেডিও শো সানডে সাসপেন্স-এর সঙ্গে।


ISBN 978-81-19068-96-8